পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ

সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ

প্রবীর ঘোষ

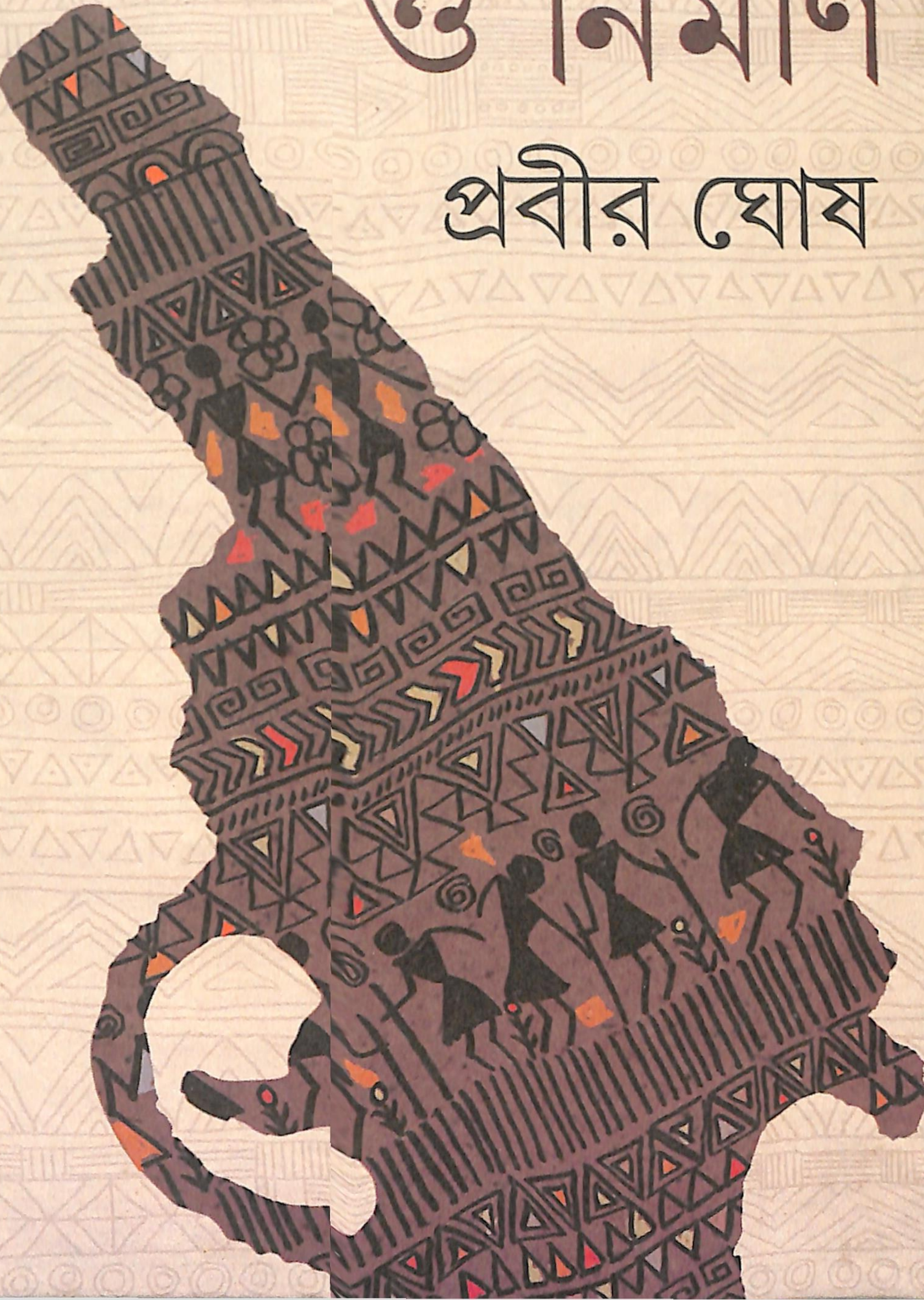

সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ

সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SANSKRITI : SANGHARSHA O NIRMAN
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹300.00

ISBN 978-81-295-3095-0

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ :
জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

৩০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রী শঙ্খ ঘোষ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমার প্রেরণা
ড. পবিত্র সরকার

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

যুক্তিবাদীর চোখে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি
পিনাকী ও অলৌকিকবাবা রহস্য সমগ্র
যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ
প্রেম, বিবাহ ও অন্যান্য
বারেবারে ঘুরে ফিরে তুমি
আমার ছেলেবেলা
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা
গোলটেবিলে সাফ জবাব
সম্মোহনের A to Z
কাশ্মীরে আজাদির লড়াই একটি ঐতিহাসিক দলিল
রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু
মেমারিম্যান থেকে মোবাইল বাবা
মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন
জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার (১ম, ২য়)
পিংকি ও অলৌকিক বাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা
সেরা যুক্তিবাদী সংকলন
গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

সুমিত্রা পদ্মনাভন সম্পাদিত
প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

প্রবীর ঘোষ ও বিপ্লব দাস
বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস

© PRABIR GHOSH, DEBI COMPLEX, FLAT No.-104, BLOCK-C, KOLKATA-74, INDIA.
All rights reserved throughout the World. Reproduction in any manner in whole or part, in Bengali or other languages, prohibited.

e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com
websites : www.srai.org & www. humanistassociation.org

বিষয় সূচি

কিছু কথা ৯

অধ্যায় : এক

বিভ্রান্তির সংস্কৃতি : বাঁচাও তাহারে মারিয়া ১১

অধ্যায় : দুই

অপসংস্কৃতি ও সুস্থ-সংস্কৃতি : পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হোক সুচেতনার পথে ২৫

অধ্যায় : তিন

সাংস্কৃতিক বিপ্লব : পৃথিবীর পথে হাজার বছর হাঁটা ৪০

অধ্যায় : চার

ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : কেউ কথা রাখেনি ৫৬

'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'বাংলার রেনেসাঁস' ৫৬

'প্রগতি লেখক সংঘ' ৬৬

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ৬৯

অধ্যায় : পাঁচ

নকশালবাড়ির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ৭৫

অধ্যায় : ছয়

যুক্তিবাদী আন্দোলন, সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন : এসো আমরা আগুনে হাত রেখে প্রেমের গান গাই ৭৮

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ : ধর্মে আছ, জিরাফেও আছ ৯২

ফিরে আসি পুরনো কথায় ৯৪

পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস : একবার তুমি ভালবাসতে চেষ্টা করো ১০৮

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র : জলেতে ডোবানো আছে বারুদভর্তি সিন্দুক ১১২

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন : একটি মহান, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মিথ্যা ১১৯

গণবিজ্ঞান ও জনবিজ্ঞানের আন্দোলন : জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি ১২৩

চলো যাই ফিরে : পুরনো কথায় ১২৬

বিজ্ঞান জাঠা : বড় বেশি দেখা হল ধর্মত যা দেখা অপরাধ ১২৭

অধ্যায় : সাত

'যুক্তিবাদ' একটা সম্পূর্ণ দর্শন, একটা বস্তুবাদী বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি : কুয়াশা কাটে, কাটে নেশা, আকাশের ঘষা-সূর্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয় ১৪৭

অধ্যায় : আট

যুক্তির পথচলা : লোভের অন্ধকারে চোকে না দিনের আলো ১৬৭
মগজ ধোলাইয়ের সেকাল-একাল : সমস্তই এক বয়ে চলা স্রোত ১৮০
শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে ১৮৭
মগজ ধোলাই প্রসঙ্গে রাজনীতিকদের জ্যোতিষ ও রাজনীতি ১৯২

অধ্যায় : নয়

মূল্যবোধ : কে কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা? ১৯৬
প্রেম ও বিবাহ : বন্ধন মেনো না, ভাঙো অচলায়তন ২০৩
প্রসঙ্গ জনসেবা : ভালোবাসার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ২১৬
পরিবেশ আন্দোলন : মানুষ থাক বা না থাক বাঁচাও সোঁদরবনের বাঘ ২১৯
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই : যুদ্ধ ছাড়া শান্তি নেই ২২৩
দেশপ্রেম : কানামাছি ভোঁ ভোঁ ২২৭
গণতন্ত্র : একটি মোরগের কাহিনি ২৩৫
মানবাধিকার : এসো মুক্ত কর ২৪০
ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার ২৪৯
জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি : গোলমালে পীরিত কইর্যো না ২৫৯
বিচ্ছিন্নতা : যন্ত্রণার দাউদাউ আগুনে আপসের জল ঢালো নতুবা পুড়তেই থাকবে বিচ্ছিন্নতার আত্মনিগ্রহে ২৬৩
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম : হানিমুনে বাঘ ডাকে ২৬৬
ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বুকে জড়াও আবেগভরে, পৃষ্ঠে বসাও ছুরি ২৭১
একটি সত্যিকারের আন্দোলন : দিন বদলের ক্ষিদে ভরা চেতনার ২৯৫
ভাঙা ও গড়া : এই খেলা ভাঙার খেলা শুধু নয় ৩০৭
দ্বিচারিতা : অপ্রিয় কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন ৩১৫

কিছু কথা

শুরুতেই গোড়ার কথা বলে নিতে চাই। এই গ্রন্থটিকে এক কথায় বলা যায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র manifesto, অর্থাৎ সংগঠনটির কর্মসূচি, মতামত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

আমরা মনে করি—বিপ্লবের সময়, বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটি নিয়েই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে নানা বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির জঞ্জাল নিয়ে সাংস্কৃতিক অন্দোলন এবং বিপ্লব কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই আলোচনার শুরুই করেছি 'সংস্কৃতি' নিয়ে।

আলোচনায় এনেছি এ-দেশের 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন'-এর ইতিহাস, নকশাল আন্দোলন। নকশালদের বিভাজন। এমনকী যুক্তিবাদ প্রসঙ্গ, মূল্যবোধ, প্রেম-বিবাহ, জনসেবা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সঠিক আন্দোলনের ভাঙা ও গড়া—ইত্যাদি বহুতর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে সঠিক ধারণা ছাড়া আন্দোলন ও বিপ্লব গড়ে তোলা অসম্ভব। নেতৃত্ব দিতে গেলে এ'সব জানতেই হবে।

শোষণমুক্ত সাম্যের একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে এই গ্রন্থটিকে আত্মীকরণ করা।

ঢাকঢোল না পিটিয়েও একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে চলেছে ভারতে। এ-দেশের ৬৭৫টি জেলার মধ্যে প্রায় ৩০০টি জেলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম বা স্বরাজ বা সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে কৃষি অঞ্চল, বনভূমি, খনি অঞ্চল, জলাভূমি, চা-বাগিচা এ-সব।

এটা তো শাসক-শোষকদের সর্বনাশ। তারপরও এগুলো গড়ে উঠল কী করে? এ-সবের উত্তর পেতে হলে পড়তেই হবে 'সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ স্বয়ম্ভর গ্রাম।' এই গ্রন্থটি পাড়ার আগেই পড়ে নিন 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ।

সমস্ত সহযোদ্ধা ও পাঠক-পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

মে ২০১৭

অভিনন্দনসহ

প্রবীর ঘোষ
দেবী কমপ্লেক্স, ব্লক সি, ফ্ল্যাট নং-১০৪
দমদম, কলকাতা-৭০০০৭৪
email:prabir_rationalist@hotmail.com
website:www-srai.org
9330121900

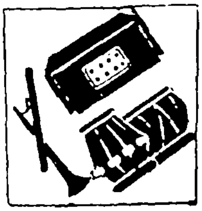

অধ্যায় : এক

বিভ্রান্তির সংস্কৃতি : বাঁচাও তাহারে মারিয়া

'সংস্কৃতি' শব্দটি বয়সে অতি নবীন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও বাংলা শব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' কেউ ব্যবহার করেছেন কি না, সন্দেহ। এই সন্দেহ শুধুমাত্র আমাতেই দানা বাঁধেনি, এই একই সন্দেহের কথা সোচ্চারে উচ্চারণ করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থে। কিছু বছর আগে পর্যন্ত 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত 'কৃষ্টি' শব্দটি।

'কৃষ্টি'র মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য'। চাষ অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, 'Culture' অর্থে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটিকে গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শব্দটি সম্বন্ধে তাঁর একটু অস্বস্তি ছিল। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার প্যারিসে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুকে 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনে সুনীতিকুমারের খুবই মনে ধরে শব্দটি এবং বাংলা শব্দের জগতে একটি নতুন শব্দের সংযুক্তি-সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এমন উচ্ছ্বাস দর্শনে বিস্মিত সুনীতিকুমারের বন্ধু জানান—Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে মারাঠী ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯২২ সালেই সুনীতিকুমার দেশে ফিরে এসে—'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার 'কৃষ্টি' শব্দের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।

যদিও তার পরেও দীর্ঘ বছর 'সংস্কৃতি'র চেয়ে 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। আজ কিন্তু 'কৃষ্টি'র সেই সুদিন আর নেই। কৃষ্টির জায়গা দখল করেছে 'সংস্কৃতি'।

এ তো গেল 'সংস্কৃতি' শব্দের বাংলা শব্দ জগতে প্রবেশের বৃত্তান্ত। বিগত কিছু বছরের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব 'সংস্কৃতি' শব্দটি আজ নানাভাবে

ব্যবহৃত হয়ে বাংলা শব্দ জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। তবু এরপরও সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, যতই ব্যবহারে ব্যবহারে ব্যবহৃত হতে হতে সংস্কৃতি শব্দটি প্রচলিত হয়ে উঠুক না কেন, শব্দটির প্রকৃত অর্থ আজও এক আজব ঘেরাটোপে বন্দি হয়েই রয়েছে।

'সংস্কৃতি', 'লোকসংস্কৃতি', 'জাতীয়সংস্কৃতি', 'সাংস্কৃতিক-সংস্থা', 'সাংস্কৃতিক-আন্দোলনকর্মী', 'সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ', 'সাংস্কৃতিক-বিপ্লব', 'অপ-সংস্কৃতি' বা 'অ-সংস্কৃতি' ইত্যাদি শব্দগুলোর সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া বাঙালিরা যতটা পরিচিত, সম্ভবত প্রায় ততটাই এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ তাঁদের কাছে অ-ধরাই থেকে গেছে। সাধারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা 'সংস্কৃতিবান' বলতে সমাজের সেইসব মানুষকেই চিহ্নিত করেন, যাঁরা সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা, নৃত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি কোনও এক বা একাধিক বিষয়ে জানেন-বোঝেন; অথবা এই ধরনের চারুকলার কোনও একটি বিষয়ের সঙ্গে নিজের কর্ম-জীবন জড়িয়ে গেছে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই। আবার যাঁরা ঘর সাজাতে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেন বাঁকুড়া কী গোয়ার পোড়ামাটির কাজ, মধুবনীর চিত্রকলা, ডোকরার মূর্তি, পটের ছবি, ছৌ-নৃত্যের মুখোশ বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর অথবা ভাস্করের চিত্র বা মূর্তি, তাঁদের ওপর 'সংস্কৃতিবান'-এর তক্‌মা সেঁটে দিই আমরা। সমাজের একটি শ্রেণিকে আমরা যেমন এই ধরনের বিচারের মাধ্যমে 'সংস্কৃতিবান' হিসাবে চিহ্নিত করি, একই ভাবে সমাজের আর একটি শ্রেণিকে 'অসংস্কৃত' মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের অমার্জিত রুচির মানুষ বলেই বোঝাতে চাই।

কিছু মানুষ সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং কিছু মানুষের সংস্কৃতি নেই—এই ধারণাটি প্রচলিত হলেও অবশ্যই ভ্রান্ত।

মানুষ অস্ত্র বানিয়েছে, শিকার করেছে, পশুকে গৃহপালিত করেছে, আগুনের ব্যবহার শিখেছে, শিখেছে চাষবাস করতে। মৃৎপাত্র বানিয়েছে, ভাষা সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি করেছে লিপির। এসেছে যুক্তি, বিজ্ঞান, জ্ঞান, বিদ্যা। প্রকৃতির শক্তির কাছে অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। জল, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, আগুন, পাহাড়-পর্বত, আকাশ, মাটি সমস্ত কিছুকে বসিয়েছে দেবত্বের আসনে। সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি জড় নক্ষত্র ও

গ্রহগুলো পূজিত হয়েছে জীবন্ত দেবতা হিসেবে। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করেছে বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শুয়োর এবং আরও নানা গৃহপালিত পশু। এইসব সম্পদই পূজিত হয়েছে দেবতা হিসেবে। বন থেকে সম্পদ সংগ্রহের সময় শক্তিমান পশুদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে, তাদের তুষ্ট করতে পুজো করেছে পরম ভক্তি ভরে, পুজো করেছে বনকেও। অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচতে সৃষ্টি করা হয়েছে নানা দেব-দেবীর, পুজো করা হয়েছে তাদের। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে। গোষ্ঠীর শক্তিমান ও বুদ্ধিমানকে বরণ করেছে নেতার পদে। শক্তিমান হয়েছে শাসক, বুদ্ধিমান হয়েছে ধর্মীয় নেতা। শক্তিমান ও বুদ্ধিমানেরা মিলিত ভাবে শুরু করল ক্ষমতার মধুপান করতে। সময় এগিয়েছে। বাড়ি-ঘর, রাস্তা, যানবাহন তৈরি হয়েছে, গড়ে উঠেছে কল-কারখানা, এগিয়েছে বিজ্ঞান। এগিয়ে গেছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদি চারুকলা। মনের খোরাক জোগাতে আপন তাগিদে মানুষ গড়ে তুলেছে ক্লাব, সমিতি। চারুকলা ও ক্রীড়া উভয়কেই এগিয়ে নিয়ে গেছে এইসব ক্লাব বা সমিতি। রাষ্ট্রশক্তিও এ-বিষয়ে পিছিয়ে থাকেনি। অন্ধবিশ্বাস, জ্ঞান, চারুকলা, খেলাধুলো-এই সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। এ-সবই একটি রাষ্ট্রের অধীন মানুষের সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট সব কিছুই হল সংস্কৃতি।

একটি জনগোষ্ঠীর তৈরি জীবনযাত্রার প্রণালী, ছক, আচরণবিধি, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ভাষা, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংগীত, অবসর যাপনের পদ্ধতি, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক উৎসব, সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক বিচার পদ্ধতি সবই ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মধ্যে যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিবিরোধী, ভালো, খারাপ, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা সবই থাকতে পারে, মিলে-মিশেই থাকতে পারে, এবং থাকেও।

শহর কলকাতার অভিজাত এলাকার মানুষদের যেমন সংস্কৃতি আছে, তেমনই বাঁকুড়ার হত-দরিদ্র, নিরন্ন, নিরক্ষর মানুষগুলোরও রয়েছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আর চারুকলাকে যাঁরা সমার্থক বলে মনে করেন, তাঁরা অবশ্যই ভ্রান্ত চিন্তার শিকার। এমন ভ্রান্ত চিন্তার দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি প্রভাবিত হওয়ার কারণ, এমন চিন্তা উৎসারিত হয়েছিল বিদগ্ধ মনীষী রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক থেকে। 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তা মানেই অভ্রান্ত' এমনই এক গণহিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো ধারণার ফলে, 'সংস্কৃতি' বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত চিন্তা বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বহুকেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে
'ব্যক্তিপূজার' প্রাবল্য এতই অমোঘ
যে বুদ্ধিজীবীরাও এ-ক্ষেত্রে ক্ষণিকের তরে যুক্তিকে ছুটি দিয়ে
হাঁফ ছাড়েন। তখন একবারের জন্যেও ভাবতে
চান না—যুক্তির কাছে ব্যক্তি—
বিশ্বাস মূল্যহীন।

যুক্তি চলবে সংগৃহীত তথ্য ও পরীক্ষিত সত্যের ওপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করলেন, কি করলেন না, তার ওপর কখনওই প্ল্যানচেটের বাস্তব অস্তিত্বের থাকা না থাকা নির্ভরশীল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের ওপর নির্ভর করে প্রমাণিত হয় না পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব। বরং রবীন্দ্রনাথের এইসব বিশ্বাস দ্বারা এটুকুই প্রমাণিত হয়— তাঁরও চিন্তার সীমাবদ্ধতা ছিল।

আর এমনই এক রবীন্দ্রচিন্তার সীমাবদ্ধতার জ্বলন্ত উদাহরণ 'সংস্কৃতি' বিষয়ে তাঁর নিরূপিত ধারণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক পরিবেশ থেকে, তাঁর শ্রেণিচেতনা থেকে সংস্কৃতির এই অসংগত ধারণাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ।' ('ছন্দ', রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ২১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২)

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন, '... তার [মানুষের] সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"। ('সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৪)।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লেখায়, বিশেষত সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট উক্তিকে টেনে এনেছেন—'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'ভারতের সংস্কৃতি'তে আছে ব্রাহ্মণ ঐতরেয়র

কাহিনি। ঐতরেয়কে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন নাকি এই ধরিত্রীই, ঐতরেয় রচনা করেছিলেন 'চরৈবতি' মন্ত্র। যে মন্ত্রে আছে:

চরণ্ বৈ মধু বিপুতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো না তন্দ্রয়তে চরণ্।।
চরৈবতি চরৈবতি।।

মন্ত্রের যে অনুবাদ ক্ষিতিমোহন করেছেন, এখানে তাই তুলে দিচ্ছি 'চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। ('ভারতের সংস্কৃতি'; ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১৩)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ধারণা বোধ ও কথাকে অমোঘ ও চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করার যে বিকট ব্যাধিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত তারই পরিণতিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সমাজ বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের বিষয়ে চোখ বুজে থেকে 'সংস্কৃতি' বলতে গ্রহণ করছে রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে। ফলে 'সংস্কৃতি'কে আমরা করেছি একান্তই মানসিক অবস্থা বা ভঙ্গি অথবা কিছু ভান মাত্র। 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' বলতে আমরা নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটক-মাইম-মূকাভিনয়-যন্ত্রসংগীত ইত্যাদিকেই বুঝি বলে এ সবেরই আসর বসাই 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানে। এই বোঝার এবং এমন ধরনের আচরণের পিছনে রয়েছে 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে একটা খণ্ডিত ধারণা, একটা অস্বচ্ছ ধারণা, একটা ভ্রান্ত ধারণা— সংস্কৃতি মানে মার্জিত ব্যাপার-স্যাপার, শিষ্টাচার, ললিতকলা, চারুকলা ইত্যাদি।

'সংস্কৃতি' বলতে ভদ্র আচার, সহবত, ললিতকলাকে বোঝায় না, এমন ধরনের কথা বলছি না। নিশ্চয়ই বোঝায়। এ-সবও সংস্কৃতির অঙ্গ বটে, কিন্তু এ-সবই শেষ নয়। সংস্কৃতি আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত, জীবনযাত্রার সঙ্গে আরও সম্পর্কিত। সংস্কৃতি শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপায় নয়, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র নয়। এই বাস্তব সত্য রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়ে আমরা ভুলতে বসেছি বলেই 'সংস্কৃতিবান' বলতে চিহ্নিত করি সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষকে, ধনীকে, সাহিত্যিককে, নাট্যকারকে, অভিনেতাকে, নাটক বা চলচ্চিত্রের পরিচালককে, সংগীত শিল্পীকে, চিত্র-শিল্পীকে। কোনও 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এ প্রধান অতিথি বা সভাপতির কোনও একটিতে এঁরা অপরিহার্য শোভাবর্ধনকারী। একই সঙ্গে আমরা অবহেলিত নিচুতলার মানুষদের চিহ্নিত করে বসি 'অসংস্কৃত' বিশেষণে।

'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছেন।

বুদ্ধিজীবী প্রভাবিত, পাঠাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরাও একই বোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছেন। এইভাবে আমরা মানব সমাজের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ করে দেখি, এক ধরনের উচ্চ-নীচ সীমারেখা টেনে দেখি। আর তাইতেই কারো উদ্দেশ্যে মূর্খের স্পর্ধা নিয়ে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারি— "লোকটার কোনও 'কালচার' নেই।"

এই প্রভাব থেকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই ভাষাচার্যের কলম থেকেই উৎসারিত হয়, 'পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই; কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম, ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি—প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপী ভাষায় Culture (জর্‌মান Kultur 'কুলতুর') শব্দ রূপে। ..... আমরা মোটামুটি ভাবে বল্‌তে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তা হ'চ্ছে Culture।' (সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, প্রকাশকাল ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৬)

ভাষাচার্য এ-কথাও বলেছেন, 'ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান।' (ওই গ্রন্থেরই পৃষ্ঠা ১০)

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকার নীহাররঞ্জন রায়, তাঁর 'কৃষ্টি কাল্‌চার সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ Culture বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি; একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি, তাকে তিনি 'Culture' বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।" .... 'সুনীতিবাবুর সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় রচনাদি থেকে মনে হয়, তিনিও এই ধরনের মতই পোষণ করতেন।' (পৃষ্ঠা ৮)

তাহলে সংস্কৃতির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হওয়া উচিত? তার সন্ধান দিতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন, 'মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মানবশিশুর সঙ্গে একটি পশুশাবকের কোনও পার্থক্য বড় একটা থাকে না। কিন্তু তার পর থেকেই মা-এর ও পরিবারের কোলে সে যখন বাড়তে থাকে, তখন

খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শোয়া, বসা, চলা থেকে পদে পদে স্তরে স্তরে তার সংস্কার সাধন চলতেই থাকে; বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও সেই সংস্কারক্রিয়ারই অন্তর্গত। শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পসাহিত্যচর্চা, গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আদান-প্রদানক্রিয়া ইত্যাদিও তার নিজকে ক্রমশ উন্নততর, ক্রমশ বেশি সংস্কৃতি করবার অবিরাম প্রয়াস। যে-জীবন ছিল প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মশাসিতমাত্র তাকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্র কর্মের বিচিত্রতর নিয়ম-সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলা। তাছাড়া, জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারের দৈনন্দিন কর্মের রথচক্রে নানা মালিন্য, নানা আবর্জনা জমতেই থাকে। মালিন্য ও আবর্জনা শুধু ধুলোবালি-কালি নয়, শুধু মৃত খড়কুটো নয়, অভ্যাসের মালিন্য আছে, অর্থবোধহীন আবৃত্তিরও আবর্জনা আছে, ব্যবহারে-ব্যবহারেও ক্ষয় আছে। সেজন্য প্রতিনিয়তই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা রাখতে হয় জীবনকে ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখবার জন্যে; এই সচেতন সজ্ঞান ক্রিয়াও সংস্কার-ক্রিয়া, এবং এই ক্রিয়ার যে ফললাভ ঘটে তাকেই তো আমরা বলি সংস্কৃতি।' (কৃষ্টি কাল্চার সংস্কৃতি, প্রকাশ কাল ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)

নীহাররঞ্জন রায়ের 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-প্রভারিত-বুদ্ধিজীবীদের ধারণা থেকে আরও কিছুটা বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হলেও তাঁর ধারণাও ছিল অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত।

সংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নতুনতত্ত্ব-ঘেঁষা এবং মধ্যবিত্ত-রুচি-নিয়ন্ত্রিত ধারণা থেকে আরো সার্বজনীন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-ভিত্তিক ধারণার দিকে যেতে চাইলে আমাদের আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের অর্থাৎ অ্যানথ্রোপলজিস্টদের দ্বারস্থ হতে হবে। নৃবিজ্ঞানে "সংস্কৃতি" বা Culture-এর সংজ্ঞা হল, 'Culture is the man-made part of the environment.' (Cultural Dynamics, New York. Alfred A. Konpf, 1966, page-4)।

ডঃ পবিত্র সরকার-এর কথায়, 'সংস্কৃতি'র ব্যাপকতম এবং সবচেয়ে বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা হল—'মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল— এই দু'য়ের তফাতই হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবনপ্রতিবেশে মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই 'সংস্কৃতি', বাকিটা হল 'প্রকৃতি'।' (লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, প্রকাশকাল ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১২)।

সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক গোপাল হালদারের কথায়, 'মানুষের জীবন- সংগ্রামের

বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি;' ... 'জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনই পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তার পরিবর্তন চলে।' (সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রকাশকাল ১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৩৩) ওই গ্রন্থেরই ৪১ পৃষ্ঠায় শ্রীহালদার লিখছেন, 'সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। ... সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়— চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়, —তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।"

আর এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি গবেষক পল্লব সেনগুপ্তের মতে 'সংস্কৃতি শব্দের সীমানা সুদূরবিস্তৃত। সাধারণভাবে মনে করা হয়— সংস্কৃতি মানেই হল নাচ, গান, অভিনয়, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি—প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটির তাৎপর্য তার থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্ত।

সংস্কৃতির দুটি দিক : ব্যাবহারিক বস্তুসম্পদ এবং তার থেকে বিবর্তিত ভাবসম্পদ। বস্তুসম্পদের ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে ভাবসম্পদ। ওপরে বিন্যস্ত দ্বিতীয় তালিকাটিকে যদি আলোচনার জন্য আবার হাজির করি, তাহলে সংস্কৃতির ঐ দুই প্রকরণেরই কিছু কিছু নমুনা দেখা যাবে। যেমন: খাদ্য পোশাক, ভাষা, খেলাধুলা, অঙ্গভঙ্গিমা, কিছু-কিছু আচরণবিধি ও পরিচর্যা পদ্ধতি-ইত্যাদিকে সরাসরিই বস্তুসম্পদের বিষয় বলে নির্দিষ্ট করা চলে। অন্যপক্ষে, ভাবসম্পদের উপজীব্য হল : শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, নাটক ইত্যাদি। সংস্কার, বিশ্বাস, অলৌকিকতার প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়কে সংস্কৃতির দুই প্রকরণের মধ্যে সাধারণ বা ['কমন্'] উদাহরণ হিসাবেই ধরতে হয়। ..... সুতরাং জীবনের সর্ব-পর্যায়েই তার [সংস্কৃতির] অভিক্ষেপ।' (লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

M. Felix Keesing তার Cultural Anthropology গ্রন্থে 'Culture' *শব্দটির সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন* এই বিষয়ে বিশ্বখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Clyde Kluckhohn (ক্লাইড ক্লাকহোন) - এর মতামত। সেই মতে Culture বা সংস্কৃতি হল— '...all those historically created designs for living, explicit and implicit, rational, irration and non-rational which exist at any time as potential guides for the behaviour of man." অর্থাৎ 'সংস্কৃতি' হল একটি জনগোষ্ঠীর বংশানুক্রমে জীবনযাপন প্রণালীর নানা ছক, যার কিছু প্রকাশ্য, কিছু অপ্রকাশ্য, কিছু যুক্তিযুক্ত, কিছু যুক্তিবিরোধী, যে ছকগুলি মানুষের আচরণবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক বিনয় ঘোষের মতে, "কালচার ট্রেট্' হল সংস্কৃতির প্রত্যেকটি মৌল পদার্থ ও উপাদান, যার নানারকমের সমাবেশে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপমণ্ডল হয়। যেমন শিকার, চাষবাস, ঘরবাড়ি, দেবদাসী, দেবালয়, আচার-ব্যবহার প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান।" (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশকাল ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৪৬)।

'সংস্কৃতি' বা 'Culture' মানুষ মাত্রেরই আছে—এরই প্রতিধ্বনি শুনি ক্লাইড ক্লাকহোন-এর কথায়। তার সোচ্চার ঘোষণা, 'to be human is to be cultured'।

এই আলোচনাটুকুর মধ্য দিয়ে আমরা 'সংস্কৃতি' বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় অবশ্যই পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। আমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পেরেছি, এতাবৎকাল প্রচলিত অতি জনপ্রিয় 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা বিষয়ক ধারণাটি ছিল খণ্ডিত, অস্বচ্ছ, ভ্রান্ত।

'সংস্কৃতি' বলতে চারুকলা বোঝালে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন চারুকলার উন্নতি বিষয়ক আন্দোলন বলেই মনে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

'সংস্কৃতি' বলতে যেহেতু একটি মানবগোষ্ঠী বা সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনধারাকে বোঝায়, তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে আমরা অবশ্যই একটি মানব-গোষ্ঠী বা সংস্কৃতিক গোষ্ঠী জীবন ধারার সুস্থ বিকাশের প্রতি অগ্রগমনকেই বুঝব।

বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Edward Sapir (এডওয়ার্ড সাপির)-এর 'সংস্কৃতি' বিষয়ক কিছু আলোচনায় এ-বার আমরা ঢুকছি। সাপির তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধের গ্রন্থে (Selected Writings of Edward Sapir. University of California Press) 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি' শব্দের অর্থকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।

এক : মানুষের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা পদ্ধতি, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, বিজ্ঞান, চারুকলা সবই সংস্কৃতির উপকরণ। এই অর্থে মানুষ মাত্রেরই সংস্কৃতি রয়েছে, মানবগোষ্ঠী মাত্রেরই সংস্কৃতি আছে।

দুই : সংস্কৃতির দ্বিতীয় অর্থটি ব্যবহৃত হয় এই ভাবে—শিক্ষিত, মার্জিত, পোশাক-আশাক, কথা-বার্তায় রুচিবানকে 'সংস্কৃতি সম্পন্ন' মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

তিন : কোনও মানবগোষ্ঠী যখন নিজেদের একটি স্বতন্ত্র 'জাতি' বলে ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে অসংখ্য বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে একটি 'জাতিস্বভাব' বা 'জাতিচরিত্র' গড়ে ওঠে, তাও জাতীয়-সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হয়।

সাপিরের হাজির করা সংস্কৃতির প্রথম অর্থ বা ব্যাখ্যাটি যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যা আমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্যতা লাভ করতে পারে না। সাপির দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতির যে অর্থ হাজির করেছেন, তাতে শিক্ষিত, মার্জিতকে সংস্কৃতিবান বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা কিন্তু শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, প্রায় নগ্ন জারোয়াদের 'সংস্কৃতিহীন' বলে চিহ্নিত করার মতো ভুলটি করে বসতে পারি। আপনার চোখে জারোয়াদের যে সংক্ষিপ্ততম পোশাক অমার্জিত মনে হয়, জারোয়াদের চোখে তো তা হয় না? আমার পরিচিত এক বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তাঁর একমাত্র পুত্রের বিয়ে দেওয়ার পর আমার কাছে আক্ষেপের সুরে পুত্রবধূর সম্পর্কে বলেছিলেন, "ওর সবই ভাল, কিন্তু এত রুচিহীন পোশাক পরে.....।" রুচিহীন পোশাকটি কী? না, সালোয়ার-কামিজ, যা পাঞ্জাবিদের কাছে একান্তভাবেই মার্জিত রুচির পোশাক। অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বাঙালিই হিন্দি লঘু সংগীতের 'বোম্বাই বেলেল্লাপনা' খুঁজে পান। জনপ্রিয় এইসব গানের বাণীতে, সুরে অনেক হিন্দিভাষী এমনকী অহিন্দিভাষীরাও প্রাণের আনন্দ খুঁজে পান। যাঁরা ধুতি-পাঞ্জাবিতেই বাঙালির সংস্কৃতি খুঁজে পান, তাঁরা 'সংস্কৃতি' ও 'ঐতিহ্য'কে সমার্থক হিসেবে ভুল করেন। কিন্তু শুধু ধুতি-পাঞ্জাবিকেই কেন আমরা 'ঐতিহ্য' হিসেবে গ্রহণ করব? বাঙালির ঐতিহ্যময় পোশাক যেমন ধুতি-পাঞ্জাবি, তেমনই বাঙালির ঐতিহ্যে ছিল ধুতি-ফতুয়া, ধুতি-উত্তরীয়, শুধু ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্রহীনতা, এই সবই। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবিকেই বাঙালির ঐতিহ্য বলে কেন চিহ্নিত করা হবে?

সাধারণভাবে আমরা শিক্ষিত, মার্জিত মানুষকে 'সংস্কৃতিবান' বলে চিহ্নিত করে থাকি। এমন চিহ্নিতকরণের পিছনে রয়েছে আমাদের আজন্ম পালিত 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, ফলে যাকে 'সভ্য' 'বিদগ্ধ' অর্থাৎ 'civilized' বলে চিহ্নিত করা

উচিত ছিল, তাকেই অজ্ঞতাবশে
'সংস্কৃতিবান' বলে চিহ্নিতকরণের
মতো অনুচিত কাজ
করে বসি।

সংস্কৃতির উপাদানের প্রগতিশীল দিকগুলির বিপুল উপস্থিতি ঘটলে তাকেই বলে 'সভ্যতা' বা civilization'। 'গ্রিক সভ্যতা', 'সিন্ধু সভ্যতা' ইত্যাদিকে যে অর্থে 'সভ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই অর্থে অন্যান্য বহু অঞ্চলের সংস্কৃতিকেই কিন্তু 'সভ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। অর্থাৎ সাপির যে অর্থে সভ্য মানুষকে 'সংস্কৃতিবান' বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন, তাতে 'অ-বিদগ্ধ' মানুষদের 'সংস্কৃতিহীন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে যায় নিজের অজান্তেই, বে-খেয়ালে। এ-কথা আমাদের ভুলে থাকলে চলবে না, 'অ-বিদগ্ধ' মানুষেরও 'সংস্কৃতি' আছে, 'সুসভ্য' হিসেবে চিহ্নিত নয় এমন মানবগোষ্ঠীরও 'সংস্কৃতি' আছে।

সাপিরের তৃতীয় ব্যাখ্যাটি কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। মানবগোষ্ঠী ভাষা, ধর্ম বা দেশকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই সূত্র ধরে আমরা যদি বলি 'এক ভাষা এক সংস্কৃতি', 'এক ধর্ম এক সংস্কৃতি', 'এক দেশ এক সংস্কৃতি' তবে তা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হবে না। এই সরলীকৃত হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি কয়েকটি জটিল হিসেব। সেগুলো কী? সেই আলোচনাটুকু বরং আমরা সেরে ফেলি আসুন।

ভারতবর্ষে 'ভাষা', 'ধর্ম' অবশ্যই সংস্কৃতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক, কিন্তু অবশ্যই একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। ভাষা, ধর্ম বা দেশকে ঘিরে যে ভাবেই আমরা মানবগোষ্ঠী বা সমাজকে চিহ্নিত করি না কেন, সেই সমাজের ধনী ও গরিবের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংস্কৃতির বা কৃষ্টির পার্থক্য অবশ্যই দেখতে পাব আমরা। তাই তো বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বেড়ে ওঠা শিল্পপতি চন্দন বসুর সঙ্গে রসুলপুরের ভূমিহীন চাষি হারান মণ্ডলের সংস্কৃতির মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বড় বেশি। চন্দন বসুর খাদ্য-পানীয়ের অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদের রুচি, অবসর বিনোদনের পদ্ধতির সঙ্গে হারান মণ্ডলের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া ভার। একই ভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলির ও রাজাবাজারের গরিব ফল বিক্রেতা একরাম আলির সংস্কৃতিতে, যদিও দু'জনেই একই ধর্মগোষ্ঠীর মানুষ।

ধনিক শ্রেণি ও দরিদ্র শ্রেণির সংস্কৃতির এই পার্থক্য গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক

কারণে। এই শ্রেণি পার্থক্যের সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে আমরা বিবেচনার মধ্যে না আনলে ভুলই করব।

একইভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশই আবার সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টা বোধহয় আর একটু ব্যাখ্যা করলে আমাদের বোঝার পক্ষে সুবিধে হয়। 'হোপ ৮৬' শিরোনামে ৮৬ সালে বিশাল প্রচার ও বিশাল বাজেট নিয়ে রাজ্য সরকার পশ্চিমবাংলার রাজধানীর বুকে হাজির করেছিলেন চরম উত্তেজক, যৌন আবেদনে ভরপুর নাচ-গানের দারুণ হুল্লোড়। বম্বের চিত্র জগতের স্বপ্ন-সুন্দরীরা আলোর ঝল্‌কানির সামনে শরীরের যে ঝিলিক্ হেনে ছিলেন ঝট্‌কা-মট্‌কা নাচের ঝট্‌কানিতে; কোঁচা দুলিয়ে কোমর হেলিয়ে সুপারস্টার যে পাগলামো জাগিয়ে তুলেছিলেন দর্শকদের মস্তিষ্ক কোষে, তাই বিস্ফারিত হয়েছে প্রায় প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমের অকৃপণ সহযোগিতায়। ফলে দ্রুত গড়ে উঠেছে একটি সম্প্রদায়—বোম্বের স্বপ্ন-সুন্দরীদের নিয়ে 'হোপ-৮৬' ধাঁচের ফাংশন করার প্রোমোটার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক কাগজগুলোতে চোখ বোলালেই চোখে পড়বে এইসব ফাংশন প্রমোটারদের ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন। অনেক প্রোমোটার এইসব বিজ্ঞাপনে নিজেদের ছবিও প্রকাশ করছেন। পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে সর্বত্র আজ 'হোপ-৮৬' ধাঁচের ফাংশনের রমরমা বাজার। তা হলে আমরা শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম? ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সরকার আমাদের অর্থাৎ বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের মস্তিষ্কটি ধোলাই করে যে উত্তেজনাপূর্ণ, যৌন আবেগের আঁশটে গন্ধে ভরপুর হুল্লোড়ময় 'হোপ-সংস্কৃতি' 'ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতি'র আদিম ক্ষুধা চাগিয়ে দিয়েছিল, তার ফলহিসাবে 'হোপ-সংস্কৃতি' আজ বঙ্গ সংস্কৃতিরই অঙ্গ হয়ে পড়েছে, বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা হয়ে থাকেনি। আমদানি করা নতুন সংস্কৃতিক পরিবেশই এ-ক্ষেত্রে আমাদের বঙ্গ সাংস্কৃতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে বই কী। অথবা এও বলা যায়—'হোপ ৮৬' ছিল ভোগবাদী সংস্কৃতির কাছে কমিউনিস্ট দল পরিচালিত একটি সরকারের আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

কখনও অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্যেও সংস্কৃতি তার ধারা বদলায়। আর তেমন উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে বহু শতাব্দী ধরে ভূরি-ভূরি।

সংস্কৃতি কখনওই অনড় নয়, একই জায়গায় থেমে থাকে না, বদলে যায়। বদলায় কারা? মানুষরাই। মানুষের নতুন নতুন ভাবনাই প্রভাবিত করে সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলোকে, মানুষের সংস্কৃতিকে।

সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলোকে আমরা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : বস্তুগত উপাদান; দুই : অবস্তুগত উপাদান।

বস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে ওই মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তু সমূহ। যেমন—বাসস্থান, গৃহ-সামগ্রী (যার মধ্যে মাদুর, চাটাই, হাত-পাখা, কুলো, দাওয়া থেকে ফ্রিজ, ওয়াটার কুলার, এয়ার কুলার, টেলিভিশন, জেনারেটর ইত্যাদি সবই পড়ে), পোশাক, খাদ্যাভ্যাস শস্য উৎপাদন পদ্ধতি, শিল্প উৎপাদন পদ্ধতি, পথ-ঘাট, যানবাহন, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছুকেই সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান হিসেবে আমরা গ্রহণ করব।

অবস্তুগত উপাদান বলতে আমরা গ্রহণ করব মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত উপাদানগুলোকে। এর মধ্যে আছে যুক্তিবাদী চিন্তা, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, অজানাকে জানার আগ্রহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

এরই পাশাপাশি অবস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নানা শিল্পকলা যার মধ্যে অনেক সময় মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে ভাববাদী অলীক চিন্তা, অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ-সংস্কার, ঈশ্বরতত্ত্ব, তথাকথিত ধর্ম ইত্যাদি।

অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যেই রয়ে গেছে একটি মানব গোষ্ঠীর, একটি সমাজের মানুষের মধ্যে চেপে বসা নীতিহীনতা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, মূল্যবোধের অভাব, চাটুকারিতা, স্পষ্টবাদিতা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, আপসহীনতা, প্রতিবাদহীনভাবে অন্যায়কে মেনে নেওয়ার প্রবণতা, সংগ্রামী-মানসিকতা, অজ্ঞানতা, তথাকথিত ধর্মে বিশ্বাস, ঈশ্বরতত্ত্ব-অলৌকিকত্ব-জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ-অদৃষ্টবাদ ইত্যাদিতে অন্ধ-বিশ্বাস, যুক্তিবাদী মানসিকতা ইত্যাদি সব কিছুই।

এই বস্তু ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো নিয়েই চলমান একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হতেই থাকে, পাল্টে যেতে থাকে সংস্কৃতি। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে পরিবর্তন সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষে সুফল বয়ে আনবে, কী কুফল বয়ে আনবে—সে অন্য প্রসঙ্গ।

সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক ধনকুবের হুজুরের দল ও তাদের অর্থে নির্বাচন জিতে গদিতে বসা শাসককুল। ধনকুবেরদের টিকে থাকার পক্ষে, আরও বেশি পুষ্ট হয়ে ওঠার পক্ষে কী ধরনের সংস্কৃতি কখন

প্রয়োজন, সেটা হিসেব করেই হুজুরের দল ও রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করতে ময়দানে নামায় তাদের বুদ্ধিজীবীদের। বুদ্ধিজীবীরা নানা পদ্ধতিতে মগজ ধোলাই করে মানুষের চিন্তায়-চেতনায় প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো ঢোকাতে থাকে।

ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলোর সর্বগ্রাসী প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস সবই যাচ্ছে পাল্টে। চিঁড়ে মুড়িকে বিদায় নিতে হচ্ছে 'বনিমিক্স' 'কর্নফ্লেক্স' 'বিনিজ মাঙ্গতা'র স্বপ্নময় স্লোগানের ঠেলায়। পাখা, ফ্রিজ, টেলিভিশন, ভিডিও, জেনারেটর, স্কুটার, এয়ার কুলার, ওয়াকম্যান, প্রেসার কুকার, স্টিরিও থেকে শুরু করে লিপস্টিক, নেলপলিশ, পাউডার, সাবান, পানীয়, শাড়ি, সুটিং-শার্টিং-এর বিজ্ঞাপনের মধ্যে উৎপাদনকারী ধনকুবেররা আমাদের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলোকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেলতে নেমেছে। ফলে থামস্-আপ, পেপসি, সেভেন-আপ্, সিট্রা ইত্যাদি পানীয়ের কোনটা পিপাসার্ত খাবে; ক্রেতা হিরো হোন্ডা কিনবে, কি বাজাজ, অথবা কিনবে সুজুকি—লড়াইটা এর মধ্যে।

এবার অবস্তুগত উপাদানগুলোর দিকে একটু তাকানো যাক। আমরা কী ধরনের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা পড়ব, তা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত করে দিচ্ছে বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী ও প্রকাশক। কী দূরদর্শনে দেখব, তা ঠিক করে দিচ্ছে সরকার। কোন্ ধরনের সিনেমা দেখব, তা নির্ণয় করে কোটিপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেনসর ক্ষমতার অধিকারী সরকার। এ সবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাধারণভাবে গড়ে উঠছে আমাদের রুচি, চাহিদা, চেতনা, এ সব কিছুকেই গড়ে জীবনধারা। আর এই জীবনধারাকেই প্রকাশ্যে বা অ-প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণ করে শাসককুল ও তাদের প্রভু ধনকুবের গোষ্ঠী।

অধ্যায় : দুই

অপসংস্কৃতি ও সুস্থ-সংস্কৃতি : পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হোক সুচেতনার পথে

শব্দটা 'অপসংস্কৃতি' অথবা 'অসংস্কৃতি' এই বিতর্ক আপাতত স্থগিত রাখছি। 'অপসংস্কৃতি' কথাটি যে ব্যাকরণের দিক থেকে শুদ্ধ এই বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুকুমার সেন।

অপসংস্কৃতি কী? যে সংস্কৃতি একটি সংস্কৃতি গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে এবং গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের জীবন ও চেতনার, মননের পুষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সুস্থ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অসুস্থ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাইই অপসংস্কৃতি।

আমরা তাকেই বলব সুস্থ-সংস্কৃতি যা একটি সংস্কৃতি গোষ্ঠীর জীবনকে সুস্থ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই সুস্থ বিকাশের প্রকাশ দেখা যায় সংস্কৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সমগ্রভাবে এবং গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে।

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রাকে, মননকে দূষিত করে তুলেছে দুর্নীতি। এই দুর্নীতিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর জীবনধারারই অঙ্গ, অর্থাৎ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। সমাজের সুস্থ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এই সংস্কৃতিকে আমরা অবশ্যই অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করব।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একশো ষাটটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতিতে আজ ভারতবর্ষ প্রথম তিনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। দুর্নীতির বিশাল নেট ওয়ার্কে

জড়িয়ে থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য-মন্ত্রী, বিচারপতি, পুলিশ, প্রশাসন, সেনা, আয়কর, বিক্রয়কর, কাস্টমস, রেল, ব্যাঙ্ক, বেতার, দূরদর্শন, স্টেট ট্রান্সপোর্ট, রেশনের দোকান, স্কুল, কলেজ, কে নয়? ভারতীয় রাজনীতিতে যে দুর্নীতি ও লুঠ চলেছে শেয়ার কেলেংকারি, বফর্স, ইঞ্জিন সংক্রান্ত কেলেংকারি সেই দুর্নীতির হিমশৈলের ভাসমান চূড়াটুকু মাত্র। এদেশে এখনও চাকরি কিনতে হয় নগদ টাকা দামে। চাকুরি ক্রেতাকে হয় হতে হবে রাজনীতিকের ক্রীতদাস, নতুবা তুলে দিতে হবে নগদ টাকা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পদের নিলামে দর চড়ে চল্লিশ হাজার। হাইস্কুলের ষাট হাজার। আমাদের দেশে অক্ষমরাও ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে সক্ষম বিবেচিত হয় সাত থেকে এগারো লাখ টাকা ডোনেশন নামক ঘুষ দেওয়ার রেস্ত থাকলে। দূরদর্শনে স্ক্রিপ্ট পাশ হয় লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে স্বপন নামক জনৈক রাজনৈতিক সমাজবিরোধীর হাতে চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হন মন্ত্রী থেকে যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, বুদ্ধিজীবী থেকে প্রাক্তন সাংসদ। স্বপনের অশালীন তাণ্ডবে আর যাই হোক, একটা বিষয়ে অনেকের চোখ খুলে গেছে। তাঁরা আজ আমাদের সমাজের চেপে রাখা কুৎসিত ঘাটা দেখতে পাচ্ছেন। পত্র-পত্রিকার কল্যাণে জানা যাচ্ছে, স্বপনের সঙ্গে ইয়ার-দোস্তের সম্পর্ক ছিল অনেক অতি পদস্থ পুলিশ অফিসারদের। অনেক আদর্শবাদী, গরিবদরদী, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী রাজনীতিকের মুখোশধারী সমাজের নেতারা স্বপনের মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ পেলে বর্তে যেতেন। স্বপন এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত ও প্রচার-মাধ্যমগুলোর সামনে এমন অশালীন তাণ্ডব ও হামলা চালানোয় স্বপনের শাস্তি হতে পারে, কিন্তু সে তো সমালোচনার মুখ চাপা দিতে। স্বপনের মতো হাজারো, লাখো সমাজবিরোধীরা তো একদিনে গজিয়ে ওঠেনি। রাজনীতির প্রয়োজনেই এদের সৃষ্টি। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা চিরকালই মহৎ। তাই স্বপনের স্রষ্টা আমাদের সমাজের ক্রিম, আমাদের নেতারা সমস্ত রকম আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। এক স্বপন ধরা পড়ল কি ধ্বংস হল, তাতে স্রষ্টাদের কিছুই আসে যায় না। সৃষ্টি করে আরও এক স্বপন। স্বপনের জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে। নির্বাচনে হারা-জেতার অনেক অঙ্কই তো স্বপনদের হাতে।

স্বপনের ঘটনাই কেন হাজির করলাম? কেন সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাথায় লাঠি মারা রাজনৈতিক মস্তান লালুর ঘটনা টানলাম না? এমনতর প্রশ্ন কারও মাথায় উঁকি-ঝুঁকি মারলে জানাই—না, কোনও রাজনৈতিক দলকে ছোট বা বড় করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, স্বপনের ঘটনাটা হাজির করলাম একটি দৃষ্টান্ত টানতে, দেখাতে মস্তান ও মুখোশ আঁটা নেতাদের কুৎসিত চেহারাটা। আর এইসব নিয়েই তো আমাদের সংস্কৃতি যা অবশ্যই অপসংস্কৃতি।

আমাদের এই দেশে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা নিয়েও হস্তক্ষেপ করছে রাজনৈতিক দলগুলো। 'অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ করেছে, অতএব ভর্তি হবে'— ওসব মামদোবাজির দিন আর রাখেনি তা-বড় রাজনৈতিক দলগুলো। পুরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনার, পঞ্চায়েত প্রধান, এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী, সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের পাইকারি রেটে ভর্তির সুপারিশ করে পাঠাচ্ছেন। ফলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াচ্ছে, দেখাতে দৃষ্টান্ত হাজির করছি মাত্র একটি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর বিদ্যাপীঠে ১৯৯২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থী ছিল ৩৭৩ জন। পরীক্ষায় সফল ১৮৫ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। রাজপুর পুরসভার তরফ থেকে ৪৪ জনের নাম সুপারিশ করে পাঠানো হয়। সোনারপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও সুপারিশ করে পাঠানো হয় ২০০ জনের নাম। এর অর্থ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজনেরও স্থান হবে না ওই বিদ্যালয়ে। এমন চিত্রটাই বে-সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর। এই তো আমাদের সংস্কৃতি।

শহর কলকাতার উপকণ্ঠে বিরাটিতে ভয়াবহ গণধর্ষণের পর ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে সোচ্চার না হয়ে ধর্ষকদের পক্ষে ওকালতি করে যিনি বলেছিলেন, "ওইসব ধর্ষিতারা নষ্ট চরিত্রের" তিনি একজন নারী, প্রগতির ধ্বজাধারী বিপ্লবী রাজনৈতিক নেত্রী। তবে কি আমরা ওই নেত্রীর কথা মান্য করে ধরে নেব, যাদের সমাজ 'নষ্টা' বলে চিহ্নিত করেছে, তাদের যখন যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করার, ধর্ষণ করার অধিকার পুরুষদের আছে? শোনা যায়, ধর্ষক বলে চিহ্নিতরা ওই নেত্রীর রাজনৈতিক দলের লোক, "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ"? এই তো আমাদের সংস্কৃতি।

'৯২-এর গোড়ায় দমদমে জনৈক বড় বিপ্লবী দলের বড় মাপের নেতার বিপ্লবী ছেলেকে সাট্টার আসর থেকে বহু অর্থ সমেত গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই বিপ্লবীর বিরুদ্ধে রয়েছে ধর্ষণের অভিযোগ। এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড়ের বাড়ির কাজে সাহায্যকারী একটি মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছিলেন

বলেই খ্যাতির জোরে ওই খেলোয়াড় বহু কাঠ-খড় পোড়ানোর পর অভিযোগ দায়ের করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওই গ্রেফতারের পরই নাকি এক মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের কাছে 'জবাবদিহি' চেয়েছেন— তার স্নেহভাজনকে এমনভাবে হেনস্তা করার জন্য। এ-সবই তো আমাদের সংস্কৃতি, অস্বীকার করতে পারি কি?

মালদহের মানিকচকে গণধর্ষণের ঘটনার পর আমরা কী দেখলাম? অন্যতম অভিযুক্তকে নিয়ে স্থানীয় এলাকায় সভা করে এলেন জনৈক মার্কসবাদী মন্ত্রী। এতে অপরাধীর হাত আরও লম্বা হবে, এই তো স্বাভাবিক। আমরা পুলিশের দক্ষতা দেখেছি চন্দন বসুর হারানো ব্রিফকেস চোখের পলকে খুঁজে বের করতে, কিন্তু এরাই আবার হাতের নাগালে খুনে-গুন্ডা, ধর্ষণকারীদের ঘুরতে দেখেও পরম আলিস্যে হাই তুলে হিসেব কষে মনে মনে, কোন্ অপরাধীর কাছ থেকে কতটা হিস্যা বাগান যায়। সাধারণ মানুষ আজ আর পুলিশকে বিশ্বাস করেন না। অনেক ভুক্ত ভোগীদের চোখেই পুলিশরা আজ 'অর্গাইজড ক্রিমিন্যাল'। এ-সব নিয়েই তো আমাদের সংস্কৃতি।

'৯২-এর ২৫ মার্চ লন্ডনে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম ও দূরদর্শনের সাংবাদিকরা ভারতের সর্বত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ শুনলেন। অভিযোগুলো হাজির করেছিলেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই অভিযোগগুলোতে ভারতীয় সমাজ, সরকার ও বিচার ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। "ভারত : অত্যাচার, ধর্ষণ ও জেল হাজতে মৃত্যু" শিরোনামের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ধৃতদের বিচার বিভাগের সামনে হাজির না করে সম্পূর্ণ বে-আইনিভাবে নানা ধরনের অমানবিক, পাশবিক ও নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানো এখন ভারতবর্ষের পুলিশদের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রতি বছর হাজারে হাজারে বিচারাধীন মানুষ হাজতে মার খেয়ে মারা যায়। শয়ে শয়ে অসহায় মহিলা জেলের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়। রিপোর্টে এও মন্তব্য করা হয়েছে, ভারতের হাজতগুলোতে বিচারাধীন বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচার ও তার দরুন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলবে। কারণ, পুলিশরা জানে, প্রতিটি হত্যার অপরাধ থেকে তারা দিব্যি পার পেয়ে যাবে। ভারতের বহু ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্তদের তুলে আনা হয়। বে-আইনিভাবে আটক রেখে বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়ে যায়। তাতে হয় মানুষটি এক সময় ভেঙে

পড়ে, নতুবা এক সময় মারা পড়ে। এইসব অত্যাচারী পুলিশরা বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলিরই আজ্ঞাবহ। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে নেতারা পুলিশদের আজ্ঞাবহ, নীতিহীন একদল 'অর্গানাইজড ক্রিমিনাল' করে তুলেছে। এই পুলিশরা রাজ্যে রাজ্যে শাসকদলগুলোর স্বার্থে নেতাদের রাজনৈতিক স্বার্থে নিরাপরাধীদের ওপর অত্যাচার চালায়। পুলিশরা যখন প্রতিটি বে-আইনি কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে, অপরাধ সংগঠিত করতে দেওয়ার বিনিময়ে ঘুষ খায় বা ভাগ নেয়, তখন রাজনৈতিক নেতারা নিজের ও দলের স্বার্থে বাধ্য হয় পুলিশদের এইসব বে-আইনি কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে।

অ্যামনেস্টির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পুলিশরা হাজতে বিচারাধীন মহিলাদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চালায় তাতে শুধু নিচের তলার পুলিশরা জড়িত মনে করলে ভুল করা হবে। বহু ক্ষেত্রেই উঁচুতলার সম্মতি বা আজ্ঞা থাকে এ-সব ব্যাপারে। বিশেষ ঘটনা এই যে অত্যাচারিতাদের মধ্যে গর্ভবতী মহিলা থেকে ছ'বছরের শিশুও আছে। এ-সবই তো আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গেই মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এ-অন্যায় 'চলছে, চলবে' করে ধারাবাহিক হয়ে ঘটেই চলেছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে।

এই অংশটা লেখার সময় দূরদর্শনের খবরে জানতে পারলাম আই.এ.এস -এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। এ তো নতুন কিছু নয়। দুর্নীতির হাত ধরে যাঁরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগে আই.এ.এস. বনে যান, যাঁরা দুর্নীতির হাত ধরেই জীবিকা শুরু করেন, তাঁরা ভবিষ্যতে ভয়ংকর রকমের দুর্নীতিগ্রস্ত হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এমনটা বলার অর্থ—এই নয় যে, শুধুমাত্র টুকে পাশ করা বন্ধ করলেই আমলাদের দুর্নীতি বন্ধ হবে, আমলাদের দুর্নীতি বন্ধ হবে, আমলাদের চরিত্র পাল্টে যাবে। কারণ, আরও দুর্নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমলাদের চরিত্র। এরই পাশাপাশি এও সত্যি—এই টুকে পাশ করার সংস্কৃতিও টুকলিবাজদের প্রভাবিত করছে।

তিন বছর আগের ঘটনা। ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখানদীগুলো বর্ষার শুরুতেই ফুলে ফেঁপে ভাসিয়ে দিল অসমের উপত্যকা অঞ্চল। ভেসে গেল হাজারটা মানুষের প্রাণ, লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশু, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত, লক্ষ লক্ষ বাড়ি। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খোলা আকাশের নীচে গৃহহীন, খাদ্যহীন, পানীয়হীন, বস্ত্রহীন অসহায় মানুষগুলো শুধু ভাগ্যকে দুষতে দুষতে দিন কাটাতে লাগল। এরই মাঝে হানা দিল দূষিত জলবাহিত আন্ত্রিক রোগ। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী

নিয়মমাফিক হেলিকপ্টারে ফর ফর করে চক্কর দিলেন দলা দলা পিঁপড়ের মতো জমাট হয়ে থাকা মানুষগুলোর মাথার ওপর। মানুষগুলো চিৎকার করল, হাত নাড়ল। প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি ফিরে যেতে উড়ে এলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল। অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্র বন্যাত্রাণে বরাদ্দ করল কুড়ি কোটি টাকা। বরাদ্দ নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বাক্-বিতণ্ডা হল বিস্তর। কিন্তু বরাদ্দ বাড়ল না। 'হাতি কা দাঁত আউর মরদ কা বাত'-এর কি নড়চড় হতে আছে?

এরপরই বন্যায় পাঞ্জাবের কিছু কিছু গ্রাম গেল ভেসে। মানুষ না মরলেও শস্যের ক্ষয়-ক্ষতি হল। খবর পেতেই প্রধানমন্ত্রী ছুটলেন বন্যাপীড়িতদের দেখতে। বন্যাদুর্গতদের দেখে শোকার্ত প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের আসা এবং পর্যবেক্ষণের পর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বন্যার জলের মতোই ভাসিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, পাঞ্জাবের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

এই নিয়ে আবার নতুন করে বিতণ্ডা। প্রধানমন্ত্রী মেনে নিলেন অসমের বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে পাঞ্জাবের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কোনও তুলনাই চলে না। সেই সঙ্গে অকাট্য যুক্তিও হাজির করলেন তাঁর কাজের সমর্থনে: অসমের লোকেরা গরিব, তাই ওদের কম দিলেও চলে, পাঞ্জাবের মানুষরা অনেক বেশি অবস্থাপন্ন, তাই ওদের বেশি পরিমাণে অর্থ সাহায্য না দিলে অন্যায় হত।

সমাজতন্ত্রের নবীন সূর্য যে নীতিতে বলেছেন, বড় লোকদের অভাববোধ বেশি তাই ওদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশি বেশি করে সুযোগ-সুবিধে দেওয়াটাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। গরিবদের অভাববোধ কম, ওদের ছিটেফোঁটা দিলেও চলে। মেরুদণ্ডহীনদের দেশে এটাই জীবনদর্শন, এটাই সংস্কৃতি। প্রাদেশিকতার জন্ম এ-ভাবেই হয়। প্রাদেশিকতা হঠাৎ করে ধূমকেতুর মতো হাজির হয় না। আর এও তো শুধু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত সব সময়ই ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। মগজ ধোলাইয়ে অন্ধ না হলে, নজরে পড়বেই। আমাদের দেশে যিনিই কেন্দ্রের মন্ত্রী হন, তিনিই তাঁর দপ্তরের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধার বান ডাকান নিজের রাজ্যে—এ তো অবধারিত সত্য। আর এমন জাতীয় কর্মকেই আমরা স্বাভাবিক বলে ধরেই নিয়েছি, এই যেন নিয়তি, এ-দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রীড়ার উন্নতির চেয়ে কৃপাধন্য সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকেন বেশি। ফলে খেলাধুলার জগতেও ভারত যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই

রয়ে গেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিযোগীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশবাসীকে নিরাশ করেছেন। নৈরাশ্যের গ্লানি আমাদের প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে। কিন্তু এটা কোনও প্রতিযোগীর ব্যক্তিগত দোষত্রুটির বিষয় নয়। এই সামগ্রিক ব্যর্থতা আমাদের পচন ধরা, দুর্নীতিতে ভরা সামাজিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন। এই নিয়েই তো আমাদের সংস্কৃতি।

ব্যক্তিগত জীবনে পাড়ার রাজনৈতিক মস্তানকে দেখলে আমরা বিগলিত হয়ে হাত কচ্‌লে জিজ্ঞেস করি, "ভালো তো?" দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও মন্ত্রীর সংগে পরিচয় থাকলে আমরা সেই খবরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুজনকে বলে গর্ব অনুভব করি। পচনধরা ধনীর সঙ্গে গা ছোঁয়া-ছুঁয়ি করতে পারলেও ধন্য হয়ে যাই। প্রতিবাদের পরিবর্তে আপসকামিতাকেই জীবনদর্শন হিসেব গ্রহণ করেছি। প্রতিরোধের প্রাচীর গড়তে যেন ভুলে গেছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেণিচেতনার জন্য লাফালাফি করেন, গলা ফুলিয়ে গলগল করে রাশিরাশি কথা উগ্‌রে দেন, তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগুরুরাই দুর্গাপুজোকে শারদোৎসব নাম নিয়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার মিলনোৎসব হিসেবে হপ্তা খানেকের জন্য শ্রেণিচেতনার চিন্তাকে ছুটি দিই। তারপর আবার এক সপ্তাহের জন্য শ্রেণিচেতনা মুলতবি রাখি ধনী বন্ধুর সঙ্গে শৈলশহর গ্যাংটকে গরম কাটাতে আসতে। ধনী বন্ধুর লক আউট করা কারখানার শ্রমিকভাইদের কথা কয়েকটা দিনের জন্য শীত-শেষের লেপের মতোই গুটিয়ে তুলে রাখি। আদর্শ তো কোনও শখের খেলনা হতে পারে না, আজ আদর্শ নিয়ে চলব, কাল আদর্শ নিয়ে চলব, পরশুর জন্য আদর্শ গুটনো থাকবে, এবং তারপর দিনই আদর্শের নকশিকাঁথা খুলে বসব।

আমাদের সমাজের অনেক বিপ্লবীর, অনেক বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীর মগজে যে চিন্তাটা কিল্‌বিল্‌ করে খেলে বেড়াচ্ছে, তা হল—সব্বাইকে নিয়েই যখন আন্দোলন গড়তে হবে, সব্বাইকে নিয়েই যখন চলতে হবে, তখন কোনও মানুষ বা সংগঠনের চ্যুতি, স্খলন নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। এতে ঠগ বাছতেই গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। তখন আন্দোলন করবেটা কে?

নীতি বিসর্জন দিয়ে নৈতিক সংগ্রাম চালানো কখনও যায়নি, যাবেও না। যাঁরা আপস করার কথা বলেন, বিচ্যুতদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে দ্রুত দলে ভারী হয়ে ওঠার মধ্যেই আন্দোলনের সার্থকতা খুঁজে পান, তাঁদের কাছে প্রশ্ন: আপোষ ও মানিয়ে নেওয়ার অর্থ যদি হয় আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া, তবে কি জবাব দেব নিজের বিবেকের কাছে?

তবে এ-কথা বলি 'বিচ্যুত' ও 'ভুল বোঝা' দু'টি গুণগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। একজন দুর্নীতিপরায়ণ জনপ্রতিনিধি বা জনসেবক অবশ্যই বিচ্যুত। এই বিচ্যুত মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নামা যায় না। এরা সংগ্রামকে ভাঙিয়েও আখেরই গোছাবে। ফলে সংগ্রামের 'দফা হবে রফা'। কিন্তু একজন বিজ্ঞানকর্মী, যিনি কিনা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়তে চান, তিনি নিশ্চয়ই একজন জীবনযুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত গ্রহরত্নধারণকারীকে এড়িয়ে চলবেন না। এই বঞ্চিত মানুষদের জন্যই তো আন্দোলন, এই নিপীড়িত মানুষদের নিয়েই তো আন্দোলন। এদের যে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে, অদৃষ্টবাদী করে' তোলা হয়েছে—এ কথা বোঝানোই তো আন্দোলন কর্মীদের কর্তব্য। এই হতদরিদ্র অদৃষ্টবাদী মানুষগুলো বিচ্যুত নয়, এরা ভুল চিন্তার শিকার। এদের প্রকৃত সত্য যে দিন বোঝাতে পারব, সে দিন ওরা নিজেরাই আংটিটি খুলে রাখবে। কিন্তু এর পরিবর্তে কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী বা নেতা যদি আংটিধারীকে দলে টানতে নিজেও একটি গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করে বোঝাতে প্রয়াসী হন— 'আমি তোমাদেরই লোক' —তবে বলতে বাধ্য হব, এতে সমাজ বা সমাজের সংস্কৃতির কোনও উত্তরণই ঘটবে না, আন্দোলন সংগঠিত হবে না, আগাছার মতোই একটা দল বাড়বে শুধু। আদর্শ ছাড়া বিপ্লব কোনও দিনই সংগঠিত হয়নি, হবেও না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে মেকি আন্দোলনকারী, আপসপন্থী ধান্দাবাজরাই সংখ্যাগুরু। সুসংস্কৃতির স্বার্থেই প্রয়োজন এইসব বিচ্যুতদের নিয়ে চলা নয়, ওদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা।

গত মে '৯২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি গ্রামের 'নাইট গার্ড'দের হাতে মারা পড়ল একাধিক তরুণ। তরুণদের অপরাধ, তারা এক আত্মীয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে স্টেশনে এসে শেষ ট্রেনটিও না পেয়ে আবার বিয়ে বাড়িতে ফিরে না গিয়ে স্টেশনেই রাতটা কাটাবে বলে শুয়েছিল। নাইট গার্ডরা ওদের স্টেশনে পাকড়াও করলে ওরা বার বারই জানিয়েছে আমরা অমুকের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে এসেছিলাম, আমাদের কথায় বিশ্বাস করতে হবে না। ওই বাড়িতে নিয়ে চলুন, খোঁজ করুন, সত্যি কি মিথ্যে জানতে পারবেন। কিন্তু ও-সব যুক্তির ছেঁদো কথায় নাইট গার্ডদের মনের চিঁড়ে ভেজেনি। লক্‌লক্ করে উঠেছিল ওদের ভেতরের হিংস্রতার আগুন। ওরা ওই তরতাজা তরুণদের কানের ভিতর দিয়ে, চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল লৌহ শলাকা। সেই সঙ্গে ইট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভেঙেছিল হাত-পা বুকের

পাঁজরগুলো। আদা থেঁতলানোর মতোই থেঁতলে দিয়েছিল গোটা শরীরটা। তীব্র যন্ত্রণায় মানুষগুলো শলাকাবিদ্ধ শূকরের মতোই ব্যর্থ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছিল। তরুণরা মারা গেল। কারো বুক খালি করে দিয়ে চোখের জল ঝরিয়ে ওরা বিদায় নিল। বর্বরদের চেয়েও বর্বরদের মতো অত্যাচার চালিয়ে যারা হত্যা করল, সেই নিষ্ঠুর হত্যাকারীরাও তো আপনার আমার বাড়িরই ছেলে। ওরা তো বেসিক্যালি খুনে নয়। তবে? তবে?

এ তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই পচনধরা সমাজে এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত আকছার ঘটেই চলেছে। ছাপোষা, নিরীহ, বঞ্চিত মানুষগুলো হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কথায় কথায় হিংস্র হয়ে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে সামান্য সন্দেহ কারো দিকে বিদ্ধ করলেই। যুক্তি-প্রমাণের ব্যাপার-স্যাপারকে সামান্যতম পাত্তা না দিয়ে ছেলেধরা সন্দেহে, রক্তচোষা সন্দেহে, গুজবে পরম বিশ্বাস রেখে উত্তেজনার আগুনে নিজেদের তাতিয়ে এরা নিরীহতার গণ্ডি থেকে হিংস্রতার গণ্ডিতে পা রেখেছে, হয়ে উঠেছে হিংস্র খুনি। প্রতিটি অবদমিত বঞ্চনাই এ-ভাবে সৃষ্টি করছে হিংস্রতার গণ-হিস্টিরিয়া, হিংস্রতার বিস্ফোরণ। এ-সব নিয়েই তো আমাদের বহমান সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি।

আমাদের দেশের নাগরিকদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ বিরোধীরা। আমাদের দেশের নাগরিক-অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে নপুংসক, ক্ষমতালোভী অর্থলোভী সরকারি আমলা। আমাদের দেশের নাগরিক-অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে আমাদেরই করের টাকায় পালিত উর্দি পরিহিত সবচেয়ে সংগঠিত সমাজবিরোধীরা।

যাঁদের দেখে শ্রদ্ধা করা যায়, উদ্দীপ্ত হওয়া যায়, আদর্শকে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে আদর্শের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করা যায় এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে অতিক্ষীয়মাণ। এই তো আমাদের সমাজের আসল চেহারা, যা আমাদের সংস্কৃতি।

এত শোষণ, এত দুর্নীতির অনাবিল স্রোত, এতে লাভবান মানুষের সংখ্যা কোটিতে গুটিক; ওরা বণিক-ধনিক সম্প্রদায় ও তাদের কিছু উচ্ছিষ্টভোগী। আসমুদ্রহিমাচলে নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষরাই তো সংখ্যাগুরু। বঞ্চনাকারী এইসব মানুষরা বঞ্চিতদের তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের দুর্বার বিস্ফোরণে শেষ হয়ে যাবে, অপেক্ষা শুধু বিস্ফোরণের। বণিক-ধনিক-শাসককুলের কাছে এই

তথ্যটি মোটেই অজানা নয়। তারা দেখেছে নব্বই-এর দশকের গোড়াতেই কী করে এক একটি বিশাল শক্তিধর দেশের সরকারের গদি উল্টেছে। গদি উল্টেছে জন-প্রতিরোধে। বিশাল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাধ্য হয়নি জন-রোষকে প্রতিহত করার। এই কথা বলার উদ্দেশ্য কোনও দেশের প্রাক্তন সরকারকে সমর্থন বা অসমর্থন নয়। উদ্দেশ্য একটিই : দৃষ্টান্ত হাজির করে বোঝার ব্যাপারটা সোজা করা। এ-দেশের শোষকরা ভালোই জানে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষদের ক্ষুব্ধতাকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা পুলিশ, সেনা ও রাষ্ট্রশক্তির নেই। তাই নানা কৌশলে শোষিত মানুষদের ক্ষুব্ধতার আগুনে জল ঢালে রাষ্ট্রনায়করা।

সমাজের হুজুরের দল ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা চায় না মজুরের দল জানুক তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ এই সমাজেরই কিছু মানুষের লোভ, দুর্নীতি, এই সমাজব্যবস্থা। অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকে বঞ্চিত মানুষগুলো যদি বঞ্চনার কারণ হিসেবে স্বর্গের দেবতা, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্ট ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে, তবে তো কেল্লা ফতে। ওদের ক্ষুব্ধতাকে স্তব্ধ করতে পুলিশ মিলিটারি নামাতেই হয় না।

সমস্ত জন-চেতনা যদি বঞ্চনার কারণ হিসেবে হুজুরের দল ও তাদের সাঙাতদের দায়ী করে, নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নিতে ময়দানে নেমে পড়ে, তবে যে পুলিশ, মিলিটারি দিয়েও ক্ষমতায় থাকা যাবে না, এ সত্য হুজুরদের ভালোমতই জানা, তাই হুজুরের দল চায়, অন্ধ বিশ্বাসগুলো মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখুক, দৃষ্টিকে করে রাখুক ঘোলাটে। তাহলে অনেক সহজে, অবহেলিত বঞ্চিতদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে হুজুর-মজুর সম্পর্ক, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বজায় রাখা যাবে।

কথাগুলি যে কী ভয়ঙ্কর রকম সত্যি, তার উদাহরণ টানতে দু-তিনটে ঘটনার উল্লেখ করছি।

গীতা যে উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন, সেটাকে 'বারো বস্তি এক উঠোন' বললেই বোধহয় ঠিক হয়। গীতার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন একটি মহিলা।

গীতার আশে-পাশে আরও জনা দশেক মহিলা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন। এঁরাও বারো বস্তিরই বাসিন্দা, এঁদের কয়েকজনের কোলে-কাঁখে হাড়-জিরজিরে পেট-ফোলা শিশু। অপুষ্টি ও অতিমাত্রায় পরিশ্রম হাত ধরাধরি করে মহিলাদের যৌবনকে বরণ করেছে।

"লেখাপড়া শিখে কী করব? চাকরি করতে তো আর আমরা যাব না। ভাগ্যে আমাদের যা লেখা আছে, তা লেখাপড়া শিখে কি খণ্ডাতে পারব?" গীতার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন যে রুগ্ণা প্রবীণা মহিলা, তিনিই আমাদের উদ্দেশে কথাগুলো বললেন।

ঘটনাটা বছর ক'য়েক আগের। আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের কিছু বস্তিতে। ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করছিলাম এই অঞ্চলের একটি মহিলাগোষ্ঠীর মধ্যে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলতে। উদ্দেশ্য ছিল, ওঁদের লেখাপড়া শেখার ও পাশাপাশি কুসংস্কারমুক্ত করার চেষ্টা। আর তখনই অনেকেই এই ধরনের প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে। এই মহিলারা রাতের ঘুমকে বাক্সবন্দি করে বউবাজার স্ট্রিট ও তার আশপাশের গলিগুলোর পুরুষমানুষগুলোর দিকে নজর রাখেন। বিকেল না হতেই রাস্তাগুলোয় বাড়ি ফেরতা উথাল পাথাল মানুষের ঢেউ, চলেছে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে। শুধু মানুষ আর মানুষ। রং মেখে নিজের শরীরটাকে আকর্ষণীয় করতে যতটা সম্ভব দামি পোশাক পরেন এঁরা। দেখে বোঝার উপায় থাকে না, বাড়িতে এঁরাই পরেন একটুকরো ত্যানা কাপড়। এঁদের বাড়ির ছেলেরা মা'য়ের দুধ না ছাড়তেই নেমে পড়ে পেট চালাবার যুদ্ধে। এত নিপীড়ন ও বঞ্চনার পরও এঁদের কারও কোনও অভিযোগ দেখিনি সমাজের কারও প্রতি। নিজেরই ভাগ্যফল বলেই সব কিছুকে মেনে নিয়েছেন।

কুড়ি বছর আগের আর একটি ঘটনা। ঘটনাস্থল বিহারের সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রাম। ওই গ্রামে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম গ্রামবাসীদের পান করার একমাত্র জল তীব্র দুর্গন্ধে ভরা, রং কালচে শ্যাওলা মতন। এমন সর্বনাশা মড়কের খবর আমাদের কাছে পৌঁছলেও সরকারি প্রশাসকের কানে পৌঁছয়নি। টিকিটির দেখা মেলেনি স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদের। তৈরি নরকে একটি করে তাজা মানুষ অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। গ্রামের মানুষ রোগীদের দূরের হাসপাতালে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। ধরেই নিয়েছিলেন, ভাগ্যে যাঁদের মৃত্যু লিখেই রেখেছেন 'বোঙ্গা',

তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য কোনও মানুষেরই নেই। ওদের কোনও অভিযোগ ছিল না সমাজের প্রতি, নির্বাচিত সরকারের প্রতি।

সুন্দরবনের ভয়ংকর সৌন্দর্য নিয়ে কাব্য করা যতটা সোজা, সুন্দরবনের মানুষগুলোর ভয়ংকর দারিদ্র ও লাঞ্ছনাভরা জীবন নিয়ে কাব্য করা ততটাই কঠিন। এখানকার মহিলা-পুরুষ বা বাচ্চারা পর্যন্ত কাকভোরেই নদী আর খাঁড়িগুলোতে নেমে পড়ে মাছ ধরতে। দিনান্তে তাই বেচে জোটে একবেলা পান্তার খোরাকি। মাছ ধরতে গিয়ে কখনও কখনও ধরা পড়ে কামটের কামড়ে। ধারালো ক্ষুর দিয়ে কাটার মতোই জলের তলায় নিঃসাড়ে পা কেটে নিয়ে যায় হাঙর, স্থানীয় মানুষরা যাকে বলে কামট। এর পর কেউ কেউ পা হারিয়ে জান বাঁচায়, কেউ কেউ মারা যায় অবিরাম রক্তক্ষরণে। কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রক্ত নেই, তাই কামটের কামড়ের পর মৃত্যুটাই এখানে স্বাভাবিক। যদিও কামটের কামড়ের ঘটনা এখানে আকছারই ঘটছে, কিন্তু তবুও সরকার পরম উদাসীন। আর স্থানীয় মানুষগুলো? না, ওরা কোনও দাবি তোলে না, অভিযোগহীন এই মানুষগুলো ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের জীবন।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সাপে কাটা রোগীদের ক্ষেত্রে। প্রতি বছরই সাপের কামড়ে মারা যায় এ অঞ্চলের বহু মানুষ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সাপে-কাটা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ইনজেকশন না থাকায় মানুষগুলো বাধ্য হয়েই শেষ চেষ্টা করতে ওঝা-গুনিনদের শরণাপন্ন হয়। বিযাক্ত সাপ ঠিক মতো বিষ ঢাললে তাকে বাঁচানোর সাধ্য ওঝা, গুনিনের হয় না। রোগী মরে।

দারিদ্র্যের নগ্ন লাঞ্ছনায় নুয়ে পড়া মানুষগুলো
'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে সবই ভাগ্যের লিখন',
ধরে নিয়ে ক্ষোভের পরিবর্তে
শোক পালন করে।

হিঙ্গলগঞ্জের মাস্টারমশাই শশাঙ্ক মণ্ডল ক্ষোভের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন, "সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণে সরকার যত সচেষ্ট, মানুষ সংরক্ষণে তার এক শতাংশ চিন্তাও সরকারের নেই।"

সত্যিই নেই। বাঘ পুষতে, তাদের সময়মতো খাবার জোটাতে কত পরিকল্পনা, কত অফিস, কত কর্মচারী। আর মানুষগুলোর জন্যে? সুন্দরবনের

হত দরিদ্র ক্ষুধার্ত জেলে, মউলে ও বাউলেরা জঙ্গলে যায় বাঁচতে। এর জন্য বন দপ্তরের পাশ নিতে হয়। কাঠ কাটা ও মধু সংগ্রহের জন্য পাশ। তারপর এরা অনেকেই বাঁচতে পারে না বাঘের থাবা থেকে। গোসাবা, কাটাখালি গ্রামে এমন একটি পরিবার পাওয়া যাবে না, যে পরিবার থেকে কেউ বাঘের পেটে যায়নি।

বাঘের থাবা থেকে যারা বেঁচে ফেরে তাদের জন্য থাবা মেলে বসে থাকে সুন্দরবনের ডাকাত ও মহাজনরা।

গোসাবার ফতেমা বিবি যৌবনে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন বাঘের থাবার তলায়। সব হারিয়েও ফতেমা বিবির চোখ শশাঙ্ক মাস্টারের মতন জ্বলে ওঠে না ক্ষোভে। কপাল চাপড়ে নিজের ভাগ্যকেই দোষে।

ভয়ংকর দারিদ্র্যে নুয়ে পড়া মানুষগুলো পেটে পান্তা, পরনে ত্যানা আর মাথা গোঁজার মতন একটা অন্ধকারময় ঝুপড়ি পেলেই বর্তে যায়। 'শিক্ষালাভের অধিকার', 'চিকিৎসালাভের অধিকার' কথাগুলো ওদের কাছে অর্থহীন বিলাসিতা মাত্র। বঞ্চনার জন্য ওরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে ওদের চোখ বাঘের মতন ভয়ংকর হয়ে জ্বলে ওঠে না। বঞ্চিত মানুষগুলো প্রতিটি বঞ্চনার জন্য নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে বিলাপ করে, চোখের জল ফেলে।

দুর্নীতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কিছু মানুষ যখন চূড়ান্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেও টাকা ফুরোতে পারছে না, টাকার কলেবর বৃদ্ধিতে এ-দেশের ব্যাঙ্কে স্থান সংকুলান হচ্ছে না বলে সুইস ব্যাঙ্কে পাচার করতে হচ্ছে, ঠিক তখন আমাদের দেশের কয়েক লক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। কয়েক কোটি বেকার মানুষ ক্ষুধায়, চিন্তায়, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় জর্জরিত। বেকারত্বের তীব্র জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেকেই বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ। অনেকে হয়েছেন অপ্রকৃতিস্থ। অবস্থা উত্তরণের জন্য অনেকেই মন্দিরে কি দরগায় মানত করেছেন, কেউ বা দৌড়োদৌড়ি করেছেন জ্যোতিষীর কাছে—যদি ভাগ্যটা ফেরানো যায়। কারও স্ত্রী পরম নিষ্ঠাভরে ব্রত পালন করেছেন অনেক দেব-দেবীর উদ্দেশেই। কেউ বা হত্যে দিয়ে পড়েছেন তারকেশ্বরে বা ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে। কেউ বা বাবাজি বা মাতাজিদের পায়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছেন, "আমাকে বাঁচান প্রভু"। কিন্তু এই দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের এই সমাজে কোনও প্রভুরই বাঁচাবার ক্ষমতা নেই।

কোনও ঈশ্বর, কোনও অবতার, কোনও জ্যোতিষীর কি ক্ষমতা আছে প্রতিটি বেকার তাদের কাছে পরম শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বেকারত্বের জ্বালা ঘোচাবার প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা পূর্ণ করার? উত্তর—না, না, এবং না।

বিনা চিকিৎসায় ছেলে আমার মারা গেল, আমি দোষ দিলাম বিধিলিপির, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার অধিকার নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললাম না। কারণ সেই প্রশ্ন আমার মাথায়ই আসেনি। আমার ভাই স্রেফ অর্থের অভাবে পড়াশুনো করতে পারল না। আমি দোষ দিলাম ভাগ্যের।

লেখাপড়া শেখার অধিকার নিয়ে কোনওই দাবি তুললাম না। কারণ ওই দাবির কথা আমার মাথাতেই খেলেনি। আমি স্ত্রীকে ধর্ষিতা হতে দেখলাম। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে স্ত্রী গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেল, আমি ভাবলাম জ্যোতিষী ঠিকই বলেছিল—তোমার বউটা তাড়াতাড়ি মারা যাবে। আমি একবার ভাবলাম না, এ লজ্জা তো আমার স্ত্রী'র নয়, এ-লজ্জা গোটা সমাজের। আমি দেখলাম ধর্ষণকারী মস্তানরা পাড়াতেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখ না খোলার জন্য একে ওকে শাসাচ্ছে। থানায় ডাইরি করতে যেতেই থানার বড়বাবু খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হেসে বললেন, "কী করে বুঝলি তোর বউকে ধর্ষণই করা হয়েছে? ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তা প্রমাণ করতে পারবি তো?"

তারপর তো আসছে 'কে ধর্ষণ করছে তার প্রমাণ সাক্ষী-সাবুদ', আমি চেঁচালাম, "বউটা মরার আগে এক ঘর লোকের সামনে হাবু, মানিক আর খ্যাঁদার নাম বলে গেছে, ওরা তিনজনই পাড়ার মধ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরছে হুজুর। সাক্ষীদের ভয় দেখাচ্ছে, আমাকেও ভয় দেখিয়েছে।"

আবার বিশ্রী রকম ভাবে হেসে উঠলেন বড়বাবু, "তোর তো দারুণ সাহস দেখছি! অন্য কেউ যদি তোর মতো সাহস করে সাক্ষী দিতে না আসে, তখন কী হবে?"

"খেতে আমার ভাইটা ওদের তিনজনকে দেখেছিল হুজুর।"

"কী দেখেছিল?"

"ওরা আমার বউটাকে....."

"কিন্তু হারুরা যদি বলে পয়সা দিয়েই করছিলাম। তোর ভাইটা দেখে ফেলার জন্যে লজ্জা বাঁচাতে গপ্পো ফেঁদেছিল তোর বউটা।"

ফ্যাল ফ্যাল করে বড়বাবুর কথাগুলো শুনে বেরিয়ে এসে ভাবলাম—সত্যিই

তো সাক্ষী-সাবুদ-আইন-আদালত কি চারটিখানি কথা। বড়বাবুই বা কী করবে, ওকেও আইন মেনেই তো চলতে হবে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণীর কথাটাই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। বউটা বড় ভালো ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—সত্যিই 'অদৃষ্টের মার দুনিয়ার বার'। মানুষের সৃষ্টি প্রবঞ্চনে মনের জ্বালা কিছুটা মিটল। ঠিক করেই ফেললাম, আজ বাসুদেব বাড়ি কীর্তনের আসরে যাব। ঠাকুরের কাছে মনটা সঁপে দিলে শান্তি পাব।

এই 'আমি' আজ ভারতে কোটি কোটি ছড়িয়ে রয়েছে, বঞ্চনা যাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারেনি।

প্রিয় পাঠক, প্রিয় বঞ্চিত মানুষ, প্রতিটি বঞ্চনার কারণকে ঘৃণা করুন। ঘৃণাই আপনার সংগ্রামের শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠবে। আপনার ঘৃণার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিস্ফোরক শক্তি, লুকিয়ে রয়েছে শোষক ও শাসক নামের দৈতদের প্রাণ-ভোমরা।

আপনার আমার ঘৃণাই ঝড় হয়ে ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে আবর্জনার স্তূপে।

অত্যাচারিতের, বঞ্চিতের এই ঘৃণা ও ক্ষুব্ধতার আগুনে জল ঢালতেই হুজুরের দল চায় দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষ সত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকুক, বিশ্বাস করুক ঈশ্বর, অলৌকিকত্ব, পূর্বজন্ম, কর্মফল, ভাগ্য ইত্যাদির অলীক অস্তিত্বে। ওরা বিশ্বাস করুক—যারাই সরকারের, রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করছে তারাই দেশদ্রোহী। ওরা পরিবেশ বলতে গাছ-পালা আর প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকুক, ভুলে থাকুক আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা—যার প্রভাব মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি রকম জোরালো। ক্ষুব্ধতার গরম বাষ্পে শোষক-যন্ত্র প্রেসার কুকারটি যেন বিস্ফোরণে খান্-খান্ না হয়, তারই জন্যে 'সেবা'র সেফটি ভাল্ব লাগানো হয়। বঞ্চিত-প্রেমিক তরুণ সমাজকে সেবামূলক কাজে আটকে রাখতে হাজির করা হয় নানা চতুর পরিকল্পনা। যুব সমাজকে ভুলিয়ে রাখতে হাজির হয় উত্তেজক নানা নেশা, পুজোর রমরমা, মাদকতাময় সংগীত, চলচ্চিত্র, নাটক। দাবি, পাল্টাদাবি, অর্থহীন মিটিং-মিছিল, পেশিশক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র, পাড়া দখল, অঞ্চল দখল, বিরোধীদের হাত কেটে নেওয়া-জিব কেটে নেওয়া-চোখ উপড়ে নেওয়া-ইজ্জত লুটে নেওয়া-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া-পাড়া জ্বালিয়ে দেওয়া, এইসব তো আমাদের সমাজের চলমান-চিত্র, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অপসংস্কৃতি।

অধ্যায় : তিন

সাংস্কৃতিক বিপ্লব : পৃথিবীর পথে হাজার বছর হাঁটা

একটি সংস্কৃতিগোষ্ঠীর জীবনকে অসুস্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, যে বিপ্লব, তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। একটি সংস্কৃতিগোষ্ঠীর জীবনকে সুস্থ ভাবে বিকশিত করে তোলার সংগ্রামই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আমাদের সমাজ জীবনে, আমাদের সংস্কৃতিতে শোষণ চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই দুর্নীতির উপস্থিতি অপরিহার্য। শোষণ ও দুর্নীতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বার্থেই শোষিত মানুষদের চেতনায় অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির উপস্থিতি অপরিহার্য। আর তাই শোষক শ্রেণির একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—বঞ্চিত মানুষদের চেতনা এগুতে না দেওয়া। চেতনা এগুলে শোষণের কারণগুলো আর লুকোনো থাকবে না। ফলে গরিব মানুষগুলোকে আর বশে রাখা যাবে না— লাঠি, বন্দুকের ভয় দেখিয়েও। ক্ষমতা হারাতে হবেই। তাই জন-চেতনা মুক্তির প্রতিটি প্রয়াসকে প্রতিহত করতেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীদের কাজ-কর্মকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে। কৌশল হিসেবে 'সংস্কৃতি'র ভুল সংজ্ঞাকেই প্রচারের জোয়ারে প্রত্যেকের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে আমরা ভাবতে শুরু করেছি 'সংস্কৃতি' মানে সংগীত-নৃত্য-সাহিত্য-গৌতম ঘোষ-শ্যাম বেনেগাল-শম্ভু মিত্র-সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার-রবিশংকর-আমজাদ আলি-ভীমসেন যোশী-হুসেন-বিকাশ ভট্টাচার্য ইত্যাদিরা। যে বাড়ির ড্রইংরুমে শোভা পায় বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি, নিদেন টেরাকোটা, যে বাড়ির মানুষ মার্জিত হাসে, মার্জিত কথা কয়, আমরা তাদেরই বলি 'সংস্কৃতিবান।'

এমন ভাবনার গণ্ডিতে যাঁরা আবদ্ধ, তাঁরা যে 'সংস্কৃতিবান' বলতে রিকশাচালক আবু ভাইকে ভাবতেই পারবে না, বরং ওকে সংস্কৃতিহীনের দলেই ফেলবে-এটাই স্বাভাবিক। ওরা 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলতে চারুকলার জয়যাত্রাকেই শুধু চিহ্নিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। 'সংস্কৃতি' নিয়ে গোলপাকানো চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলে মনে হবে কী করে? চেতনা মুক্তির আন্দোলনকে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলে মনে হবে কী করে? মনে হয়ও না। এই ভ্রান্ত, খণ্ডিত চিন্তার প্রভাবে অনেক তা-বড় রাজনৈতিক নেতাও ভেবে বসেন প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রতিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ 'রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম', 'রাজনৈতিক সংগ্রাম'। প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনচেতনাকে বিদ্রোহী করে তোলায় যে প্রক্রিয়া; এটাই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, জন-চেতনাকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা, সমাজ সচেতন করে তোলাই যে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদেরই কাজ এই সত্যটুকু অনেক রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাণ্ডজ্ঞানের বাইরে বলেই অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক বাক-বিতণ্ডা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শোষণমুক্তির সংগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা মুখ্য, না রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা প্রধান? 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা ও 'রাজনীতি'র সংজ্ঞা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকলে এই পুরো বিতর্কই অসার হয়ে যায়। কারণ,

স্পষ্টতই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন ও প্রগতির সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও প্রগতি মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে, যাকে গুছিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, সহযোগী।

কিন্তু 'সংস্কৃতি' বিষয়ে ভ্রান্ত ও খণ্ডিত চিন্তা দিনের পর দিন যে-ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষকে প্রভাবিত করেছে, তাতে শোষণ মুক্তির কাজে নিবেদিতপ্রাণ মানুষও ভুল চিন্তার ফাঁদে পা ফেলে শোষকদেরই সুবিধে করে দেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে আন্দোলনকারীরা যাতে সচেতন না হন, তার জন্য মগজ ধোলাই চালিয়ে

চলেছে রাষ্ট্রশক্তি ও হুজুরের দল। এটা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অনেক সৎ রাজনীতিকরাও এই মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক ও সহযোগী আন্দোলন—সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনও চরম সার্থকতার দিকে এগুতে বার বার ব্যর্থ হয়ে গেছে, চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরও ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে—এমন উদাহরণ তো আজ পৃথিবী জুড়ে। সমাজকে চিনতে হলে দৃষ্টিকে শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় আবদ্ধ না রেখে মেলে দিতে হয় সমাজেরই দিকে, সমাজকে আন্দোলিত করা প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহের দিকে, খুঁজে বের করতে হয় সমাজের সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর সম্পর্ককে। শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ আমার রান্নার জ্ঞান নিয়ে রাঁধতে গিয়ে আমি যে বস্তুটি তৈরি করেছিলাম, সেটিকে 'অখাদ্য' বলে নিজেই মুখে তুলতে পারিনি। 'রান্না করতে করতেই রান্না শিখতে হয়, যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ'—এর কোনও বিকল্প নেই। আর তাই তো যে বয়সের শিশু লজেন্স চুষতে চুষতে পথ চলে বাবা-মা'র সতর্ক প্রহরায়—পথ যাতে না হারায়, সেই বয়েসের শিশুই আবার ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে, মা-বাবার সংসারকে পথ চলতে সাহায্য করে। জীবন যুদ্ধই তাকে এমনটা তৈরি করে।

কিন্তু আমরা বহু শ্রদ্ধেয়র কাছ থেকেই 'সংস্কৃতি' বিষয়ে এমন সংজ্ঞা শুনতে পাই, যা আমাদের বোধকে বিভ্রান্ত করে। আমাদের বোধই যেখানে ভ্রান্ত, সেখানে বোধ থেকে উদ্ভূত আন্দোলনও যে ভুলের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে— এ তো অনিবার্য।

এক বিশিষ্ট বাম বুদ্ধিজীবী ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর লেখা একটি বই হাতে এল। যেখানে 'সংস্কৃতি' বিষয়ে লেখকের মতামত বারবার ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে।

তাঁর কথায়, "সংস্কৃতি কি সর্বজনীন হতে পারে? সংস্কৃতিকে বহুজনীন করার প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির অবনতি ঘটে না কি? 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন'—সংস্কৃতিকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা কি নেহাত হৃদয়াবেগের শিথিল উচ্ছ্বাস নয়? হাটুরে হট্টগোল কি সংস্কৃতি সহায়ক?"

এক বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের চোখে অপসংস্কৃতি কী? তাঁর কথায়, "এই সর্বজনীন কালচারের নাম দেওয়া হয়েছে অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেই এই অপসংস্কৃতি বিচরণভূমি—চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র।"

তাহলে 'সংস্কৃতি' ব্যাপারটা কী? তাঁরই কথায়, "সংস্কৃতি জীবনযাপনের শিক্ষা, বহু বিচিত্র দক্ষতা ও কর্মনিপুণতার চর্চা, উৎপাদন নির্মাণ, উদ্ভাবন সৃজনের বাস্তব ইহলৌকিক প্রতিভা।"

মাননীয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা তো আপনার অজানা নয়, তবে এমন জঙ্গি আপনি হঠাৎ সুর পাল্টালেন কেন? সুর পাল্টেছেন বলেই কি ভারতের বৃহত্তম পত্রিকাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আপনার বইটি পরম যত্নে বহু বিজ্ঞাপিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে? না কি প্রকাশকের চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন? দুঃখ হয় সেইসব তরতাজা সম্ভাবনাময় তরুণদের কথা ভেবে, একদিন যাঁরা আপনার হুকুমে জীবনের সুন্দরতম সময়গুলো বিসর্জন দিয়েছেন। আপনার এমন সুবিধাবাদী চিন্তা 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' ও 'শোষণ মুক্তির আন্দোলন'কে পথে বসাবার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়? আজ আপনার পুরোনো সঙ্গীরা আপনাকে ছেড়েছেন, কিন্তু মগজ ধোলাইয়ের কারিগর হিসেবে আপনাকে ধরেও নিয়েছেন বিশাল পত্রিকাগোষ্ঠী।

সর্বত্র যে জেনেশুনে গুলিয়ে দেওয়ার এমন প্রয়াস চলে— তা কিন্তু নয়। অনেক সময়ই লাগাতার প্রচারের শিকার হয়ে নিজের ভ্রান্ত চিন্তাই অন্যের মধ্যে প্রচারে উদ্যোগী হন বহু উদ্যোগী মানুষই। এমনই একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছিল অতি-সম্প্রতি। উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে 'সংস্কৃতি' ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের ভূমিকা' শিরোনামের এক আলোচনা সভায় একটি বাম রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক শাখার বিশিষ্ট নেতা যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে স্পষ্টতই বোঝা গেল ওই মার্কসবাদী দলটি অনেক দিনই 'স্টাডি ক্লাস'-এর পাঠ চুকিয়েছেন। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামান্য রূপরেখাটাও তাঁর অজানা থেকে গেছে, অজানা থেকে গেছে সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, এবং রাজনীতির প্রথম পাঠটুকুও।

১৯৬৬ সালের ৮ আগস্ট চিনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বিষয়ে ১৬ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাতে মানুষের চেতনার উত্তরণের জন্য দেশ জুড়ে যুক্তিবাদীদের ব্যাপক প্রসার চাওয়া হয়েছিল, চাওয়া হয়েছিল দেশ জুড়ে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রয়োগ।

ঘোষণায় দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয়েছিল : সর্বহারাদের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একমাত্র পথ হচ্ছে-জনগণ নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করবেন। এ মুক্তি চেতনার মুক্তি। এ মুক্তি আসবে যুক্তির পথ ধরে, ব্যাপক বিচার-বিতর্কের পথ ধরে।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সিদ্ধান্তগুলোতে অতি মাত্রায়

জোর দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রচারের উপরে। বলা হয়েছিল দেশ জুড়ে যুক্তিবাদী মানুষ গড়তে বিচার-বিতর্ক চালাও। মনে রেখো, এই বিচার-বিতর্ক কখনোই কলহ নয়। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকাই স্বাভাবিক এবং বিভিন্ন মতামতের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রয়োজনীয়, উপকারী ও অনিবার্য। পরিপূর্ণ বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ফলে যুক্তির নিরিখে জনগণই যেটা সঠিক তাকে প্রতিষ্ঠা করবে, যেটা বেঠিক তাকে শোধরাবে এবং এ-ভাবেই ক্রমে তারা একমতে পৌঁছবে। আর সেই মতটা অবশ্যই হয়ে দাঁড়াবে যুক্তিনিষ্ঠ। যুক্তিবাদীর পথ ধরে যখন জনচেতনা এগুবে তখন সেই জনচেতনা অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবে।

যুক্তিবাদী মানসিকতাই জনগণকে পরিচালিত করবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, আমলাতন্ত্র ঘোচানোর সংগ্রামে, বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে, নীতিবোধ ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এ-গুলো কোনওটাই পৃথক পৃথক ব্যাপার নয়, পরস্পর সম্পর্কিত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায় না। এই সম্ভাবনা দেখা দেয় মানুষের ব্যক্তিগত লোভের পথ ধরে। কিছু মানুষ জনসাধারণকে বঞ্চিত করার কুমতলবে নানা ভাবে মগজ ধোলাই করতে শুরু করে। এই লোভী মানুষগুলোকে বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষে, শোষকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দিতে পারে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী হবে? সে বিষয়ে বলা হয়েছে—জনগণের কাছে তথ্য হাজির কর, যুক্তি হাজির কর। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেহেতু যুক্তির দিকে আকর্ষিত হওয়া, তাই সঠিক যুক্তি, সুযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলে জনগণ সেই সুযুক্তিকে গ্রহণ করবেই। এতদিনকার যুক্তিহীনতার কারণ অবশ্যই এই—সুযুক্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ ছিল তা হল— বল প্রয়োগ করে কাউকে নতিস্বীকারে বাধ্য কোরো না। বলপ্রয়োগে চেতনার মুক্তি ঘটে না। বলপ্রয়োগ যুক্তিবাদের বিকল্প নয়, ভুল যুক্তির মানুষদেরও তাদের মতামতের সপক্ষে যুক্তি হাজির করার অধিকার দেওয়া উচিত। চিন্তা করার সাহস, প্রশ্ন করার সাহস এবং কাজ করার সাহস নিয়ে যে তেজ, সেই তেজের বিকাশ ঘটানোই বিপ্লবীর কর্তব্য, যুক্তিবাদভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্তব্য। কোনও কিছুকে মেনে নেওয়ার আগে প্রয়োজনে প্রশ্ন করে নিজের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করে নাও। অন্ধ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে প্রশ্নহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়ে নেতাদের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ দিও না। প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, প্রতিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, ধনতান্ত্রিক চিন্তার অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। এগিয়ে যাবে, সুস্থ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাবে।

**এই যে আন্দোলন, সমাজ ও সংস্কৃতির আন্দোলন,
জনগণ কর্তৃক জনগণকে মুক্ত করার আন্দোলন,
এরই নাম 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'।**

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল — বিতর্কের ঝড় তুলতে প্রচারকে তুঙ্গে তোলো, বড় হরফের প্রাচীরপত্রে হাজির করতে থাকো বিতর্ক, যুক্তিবাদের পক্ষে প্রচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে যুক্তির প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হবে, ফলে বহু কুসংস্কার, ভূতপ্রেত ইত্যাদি চিন্তার আবরণ খুলে পড়বে, খসে পড়বে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে জিইয়ে রেখে বঞ্চনা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াসগুলো।

অতি স্পষ্টতই চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল জনগণকে প্রাচীন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এবং অবতার পূজার মতো বঞ্চনার হাতিয়ার, প্রগতির পরিপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে কিছু ভুল-ভ্রান্তি বা অতি আবেগজনিত উল্টোপাল্টা কিছু কাজকর্ম হয়তো হয়েছিল। Joan Robinson তাঁর গ্রন্থ The Cultural Revolution in China-তে লিখেছেন : প্রতিটি অন্যায়ের,

দুর্নীতির ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আহ্বান 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এ রাখা হয়েছিল তার মধ্যে এক সময় নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকও দেখা গিয়েছিল। ফলে বহুর মধ্যেই এমন হঠকারী চিন্তা মাথা চাড়া দিয়েছিল — "সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করো।"

চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও সে তুঙ-কে নিয়ে ব্যক্তিপূজা অতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমন কথা শোনা যায়। মাও-কে নিয়ে এমন কিংবদন্তি তৈরি হয়েছিল যাতে মাওকে অলৌকিক শক্তির আধার হিসেবে দেখানো হয়েছিল। চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই ব্যক্তি পূজা প্রসঙ্গ নিয়ে মাও বলেছিলেন, ব্যক্তিপূজার বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে। এটা বর্জনীয়। তবে ব্যক্তিপূজার কিছুটা প্রয়োজন আছে।

এডগার স্নো (Edger Snow)-র গ্রন্থ 'The Long Revolution' (Publisher-Hutchinson, London) -এ দেখতে পাই মাও স্নো'কে এ -কথাই বলেছিলেন।

'বৌদ্ধ-দর্শন', 'মার্কস-বাদ' 'লেনিন-বাদ', 'গান্ধী-বাদ', এই সমস্ত মতবাদের কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো কিছু ব্যক্তি-পূজা এসেই পড়ে। এ-ক্ষেত্রে দর্শনের স্রষ্টার প্রতি এই ব্যক্তি-শ্রদ্ধা তো একটা আদর্শের প্রতীকের প্রতিই শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে, একটা শিক্ষার প্রতিই শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-শ্রদ্ধা, ব্যক্তি-পূজা যেখানে ভক্তকে যুক্তিহীন করে তোলে, অন্ধ-স্তাবক করে তোলে, সেখানে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয়র প্রতি শ্রদ্ধার, অতি-শ্রদ্ধেয়র প্রতি অতি-শ্রদ্ধা তো আদপেই নিন্দনীয় নয়।

শ্রদ্ধা ও অন্ধ-শ্রদ্ধার উদাহরণ টানতে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির তৃতীয় খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ' গ্রন্থটি নিয়ে লিখেছিলাম—

কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বইটির 'টাইটেল পেজ'-এ ছাপা আছে— "অন্ধতা ও যুক্তির বিরুদ্ধে রামমোহন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু"। সম্পাদকীয়তে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, "অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঙ্গমনীষীর ইতিহাসে একের পর এক মানুষের আবির্ভাব; তাঁদের যে-অভিযান তা যেমনই দুঃসাহসিক তেমনই

প্রখর প্রতিভার পরিচয়। রামমোহন রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখুন। বুকের বল ফেরত পাবেন। এই সব দীপ্ত মেধাবীরা কিন্তু প্লেটোর ওই অসুর দলে পড়েন। ধর্মান্ধতার ঊর্ণজাল ছিন্নভিন্ন করে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল জ্বেলে, যুক্তিনিষ্ঠ নির্মল চিন্তার হাতিয়ার হাতে বিজ্ঞানের সমর্থনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন।"

ধর্মান্ধতার ঊর্ণজাল কে ছিন্ন করেছিলেন? রামমোহন রায়? সত্যেন্দ্রনাথ বসু? রামমোহন রায় তো স্বয়ং এক ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙে কালের করাল গ্রাসে। অথবা নিশ্চিহ্ন হয় কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। নিরাকার ঈশ্বরকে ওভাবে মুছে ফেলা যায় না। এমনই এক ঈশ্বর-চিন্তা জনমানসে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন, যেখানে ঈশ্বর থাকবেন অনেক নিরাপদে।

রামমোহন রায়ের রচনাটির আগে যে সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন তাতে রামমোহন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতাকামী ও সাধারণতন্ত্রী আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।"

বাস্তব সত্য যে অন্য কথা বলে। বামবুদ্ধিজীবী হিসেবে, আই. এস. আই. ছাপ মারা সুপণ্ডিত দেবীপ্রসাদবাবু কী অস্বীকার করতে পারবেন যে নিচের তথ্যগুলো ভুল বা মিথ্যে?

রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই—

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য করো।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা করো। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এসো।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান করো। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো।

(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করো।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন করো।

রামমোহনীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেবীপ্রসাদ 'ইংরেজ' শব্দের পরিবর্তে 'শাসক' শব্দটি রামমোহনের নীতিবাক্যগুলোতে বসিয়ে নিয়ে গ্রহণ করেছেন বলেই কী অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের মস্তক চর্বণের জন্যেই তাঁর এই মিথ্যাচারিতা?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে পরম ঈশ্বরভক্ত এবং অলৌকিক ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন, তা আচার্যদেবের সামান্য হালফিল জানা মানুষদের যেখানে অজানা নয়, সেখানে দেবীপ্রসাদবাবুর মতো এমন সুপণ্ডিতের তো অজানা থাকার কথা নয়। সম্পাদক হিসেবে দেবীবাবু কি তবে না জেনেশুনেই শুধুমাত্র সুন্দর কিন্তু শব্দবিন্যাসের তাগিদেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বঙ্গমনীষা বলে অবহিত করলেন? সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যদি অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র বলে দেবীপ্রসাদবাবুর মনে হয়ে থাকে, তবে দেবীবাবু নিশ্চয়ই অন্ধকার ও অযুক্তির ধারক-বাহক হিসেবে অবহিত করবেন সেইসব মানুষদের, যাঁরা অন্ধভাবে ঈশ্বর ও অলৌকিকতাকে মেনে নিতে নারাজ; যাঁরা অন্ধবিশ্বাস ও অযুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

দেবীপ্রসাদের মতো ট্রয়ের ঘোড়া' শুধুমাত্র অন্তর্ঘাত চালিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে না, এরা অশ্বমেধের দিগ্‌বিজয়ী ঘোড়ার ভূমিকাও পালন করে একের পর এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দুর্গে ধস নামিয়ে। এইসব অশ্বমেধের ঘোড়াদের অগ্রগতি রোধ করতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীদেরই।

'৯২-এর গোড়ার ঘটনা। কলকাতার বিড়লার শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায় একটি বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকার বার্ষিক আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন আমাদের সমিতির কিছু সভ্য ও সভ্যা। সেখানে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক নেত্রী আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে আমাদের সদস্যদের কাছে অভিযোগ তুললেন আমার বিরদ্ধে —দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিতের ওপর প্রবীরবাবু যে জঘন্য নোংরা ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন তাঁর 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে তা একান্তভাবেই নিন্দনীয়।

প্রবীরবাবুর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল। তা একেবারে ভেঙে গেল। প্রবীরবাবু এটা কী করলেন?

আমাদের সমিতির এক সদস্য বলেছিলেন, প্রবীরবাবুর সমালোচনার কোন্ অংশটা আপনার কাছে যুক্তিহীন মনে হয়েছে যদি একটু বলেন তো, বুঝতে সুবিধে হয়। দেখুন আমরা যুক্তিবাদী। আমরা কখনোই মনে করি না, আমরা যা ভাবছি, সেটাই অভ্রান্ত। বরং আমরা মনে করি— আমরা যা ভাবছি, সেটা প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কোনও বিপরীত যুক্তি যদি আমার ভাবনার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। দেবীপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে প্রবীরবাবুর দেওয়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে আমার। আপনি যুক্তি দিয়ে যদি বুঝিয়ে দেন প্রবীরবাবুর চিন্তার ত্রুটি কোথায়। নিশ্চয় সেই যুক্তি গ্রহণ করব।

উত্তরে মহিলা বলেছিলেন, মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা কি যুক্তির নিরিখে মাপা যায়? না কি মা-বাবার প্রতি কারও অশ্রদ্ধা আপনি মুখ বুজে মেনে নেন?

সদস্যাটি বলেছিলেন, আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না। এই ধরনের অন্ধ ব্যক্তিপূজা সব সময়ই বর্জনীয় বলে মনে করি। নতুবা এই অন্ধ-ব্যক্তিপূজাই অনেক সংগ্রামী মানুষকে আপসকামীতে পরিণত করবে। আমরা মনে করি, যাঁরা মন্দ, যারা দুর্নীতিপরায়ণ, যারা চোর, লম্পট, সমাজবিরোধী, তারাও কারো না কারো মা, বাবা, ভাই, বোন। কিন্তু সমাজবিরোধীর সর্ব-শক্তি দিয়েই তার বিরোধিতা করব, তাকে কখনোই অন্ধ-শ্রদ্ধা বিলোব না।

ব্যক্তিপূজার গ্রহণযোগ্যতা ও বর্জনীয়তা বোঝাবার পক্ষে এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট বিবেচনায় এখানেই দাঁড়ি টানলাম।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কী? এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে আনা একান্তই জরুরি বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৃথিবীকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছিল। চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কেন নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, কেন সংস্কৃতিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল, এটা আমার লেখার বিষয়বস্তু নয়। তবে এও জানি, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল-যুদ্ধে নেমে, যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধবিদ্যা শেখার মতো একটা ব্যাপার। এটা হয় বহু জনযুদ্ধের ক্ষেত্রেই। যেখানে জনগণকে আগে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলে তারপর জন-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো সম্ভব হয় না। তাতে প্রথম দিকে জনযোদ্ধাদের পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি

ঘটে, অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়, কিন্তু বহু মানুষ এ-ভাবেই যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ করা শিখে ফেলে। আবিষ্কার করে ফেলে প্রথাগত যুদ্ধবিদ্যার বারে নানা কৌশল। এমন যুদ্ধ কৌশলের সামনে প্রথাগত যুদ্ধবিদ্যাকেও যে পিছু হটতে হয়, এর উদাহরণ পৃথিবীর বহু দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে। চিনের মুক্তি সংগ্রামও এ-ভাবেই শুরু হয়েছিল, এবং সম্পূর্ণ জয়ের মধ্য দিয়েই তার সমাপ্তি ঘটেছিল।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টায় যথেষ্ট প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি চিনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অনিবার্য বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ক্ষয়-ক্ষতির কণ্টকময় পথ অতিক্রম করে বিজয়ের দিকে এগোতে পারেনি, অতএব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয় ও সুফল অধরাই থেকে গেছে।

প্রাক্তন রাশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশগুলোর দিকে একবারের জন্য ঘুরে তাকান, তাকান চিনের দিকে, সর্বত্রই দেখতে পাবেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভাবে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাবে সেইসব দেশে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে নেতাদের একনায়কতন্ত্র-স্বেচ্ছাচারিতা-স্বজন পোষণ, বিচ্যুতি-আখের গোছানোর প্রচেষ্টা-দুর্নীতি-প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভের প্রয়াস। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, ও-সব দেশে বিপ্লবের পরিবর্তে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল শুধু। লাগাতার ভাবে সুসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য জনগণের চিন্তা, চেতনাকে যে খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়া অতি প্রয়োজনীয় ছিল, তা হয়নি। যে মানসিক শিক্ষার ও প্রস্তুতির সাহায্যে কুসংস্কার, আমলাতন্ত্র, নেতৃত্বের চ্যুতি, দুর্নীতি ও বঞ্চনাকে সরানো যেত, সেই মানসিক শিক্ষা প্রচারের লাগাতার প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে অপসংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল। এরই সুযোগ নিয়ে ও-সব দেশের সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা ভোগসর্বস্ব ক্ষিদে। মগজ ধোলাই করে ও-সব চিন্তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে শত্রু শিবিরের দেশগুলো। ফলে যা অবধারিত ছিল, তাই ঘটেছে। সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নগুলো একের পর এক হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

আমি অতি সচেতনভাবেই মনে করি, এ-দেশের বর্তমান সমাজের হুজুর-মজুর সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থাই আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই শোষক-শোষিতের সামাজিক

কাঠমো টিকে রয়েছে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তাকে পরিপুষ্ট করে। সমাজ-বিজ্ঞান ও বাস্তব-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নিয়ে সুগভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি অবশ্যই বেরিয়ে আসে—অন্ধ বিশ্বাসজাত কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির পরিমণ্ডল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে আমাদের আর্থিক কাঠামো এবং শোষিত-শোষিতের শ্রেণিবিশ্বাসের সঙ্গে এবং এরা পরস্পরের পরিপূরকও বটে। অর্থাৎ এ-দেশের আর্থিক কাঠামোকে নিম্নস্থ কাঠামো বা ভিত্তি-কাঠামো (infra-structure) আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে উপরি কাঠামো (superstructure) বলে ভাবলে ভুলই ভাবা হবে। অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ভ্রান্ত-চেতনাপ্রসূত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এ-দেশে অবশ্যই ভিত্তি-কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

অনেক রাজনীতিকদেরই বক্তব্য : হুজুর-মজুর সম্পর্কের টিকে থাকার ওপর যে-হেতু অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, মগজ ধোলাই করে ঢোকানো গোলপাকানো চিন্তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল, অতএব শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারলে এইসব অন্ধ সংস্কারের কুয়াশা কেটে যেতে বাধ্য।

তাঁদের এই ধরনের চিন্তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিককালের বহু সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষিত দেশের সরকারের মুখ থুবড়ে পড়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। কেন এমন হল?

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ওপরই যদি জনগণের চেতনার উন্মেষ নির্ভরশীল হত, তবে সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে কেন তেমনটা ঘটল না? সে-ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা কেন একমুখী হল না?

হল না, কারণ-পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী দেশগুলোতে দীর্ঘ দিন ধরে মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে মার্ক্সবাদ বিরোধী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সে-সব দেশে ধৈর্যের সঙ্গে লাগাতার মার্কিন সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে। ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে, মানুষের চেতনায় নিরন্তর উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপনের খোরাক পাঠানো হয়েছে। সে উত্তেজনা একান্ত সুখের উত্তেজনা, বহুর থেকে বাড়তি সুখ ভোগের উত্তেজনা, নাচ, গান,

যৌনতা, যুদ্ধ, ধর্মীয় নেশা ইত্যাদি নানাভাবে পাওয়া উত্তেজনা। এই সব উত্তেজনার, এইসব ভোগসর্বস্ব চিন্তার এমনই মাদকতা মানুষ তখন আত্ম-সুখের বাইরে কিছু ভাবতেই চাইবে না। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আখের গোছানোর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তারা পরিচালিত হবে। বৃহত্তর সমস্যার প্রতি, অন্যের সমস্যার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না, দেখতে চাইবে না এইসব দেশে।

মার্ক্সবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে মার্কিন গোয়েন্দা সি. আই. এ. বা বোমা, গোলা, বারুদ কিছুই প্রয়োগ করল না। প্রয়োগ করল মগজ ধোলাইয়ের ব্রহ্মাস্ত্র। আর তাইতেই হুড়মুড় করে একের পর এক মার্ক্সবাদী সাম্রাজ্য ধসে পড়ল।

অস্বীকার করার উপায় নেই সর্বত্র নাক গলানোর ব্যাপারে সি. আই. এ-র যেমন জুড়ি নেই, তেমনই চিন্তাকে একমুখী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সবার কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। চিন্তার অন্ধত্বে আবদ্ধ না থেকে শেখার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হলে অবশ্যই অনেক কিছুই শেখা যায়। সি. আই. এ-র ঘটানো ঘটনাগুলো থেকে আমরা অবশ্যই একটা শিক্ষা নিতে পারি, একটা সত্যে পৌঁছতে পারি—জনচিন্তাকে একমুখী করেও রাষ্ট্রক্ষমতায় ধস নামানো যায়। বিশ্ব-ত্রাস রাষ্ট্রশক্তির মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার করা যায়।

এই শিক্ষাকে আমরাই বা কেন কাজে লাগাতে পারব না। আমরাও যদি জন-চেতনাকে বঞ্চিত মানুষদের পক্ষে একমুখী করি তবে, আমাদের দেশের সরকারই বা গণেশ উল্টোবে না কেন? ভারতবর্ষের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়েও যখন গণ-বিদ্রোহের মুখে পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোকে পিছু হটতে হয়েছে, তখন ভারতের ক্ষেত্রেও একমুখী গণ-বিক্ষোভের মুখে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করা যাবে না কেন?

সাংস্কৃতিক চেতনাকে এক-মুখী করে অপসংস্কৃতির দ্বারা, অর্থাৎ ভোগবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করে জনগণকে যদি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামানোর

কাজটি সি. আই. এ-নিখুঁত ও সার্থক ভাবে পালন করতে সমর্থ হয়, তবে আমরাই বা কেন বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে সুস্থ-সংস্কৃতির খাতে বইয়ে বঞ্চনার প্রকৃত কারণগুলোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জনগণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামাতে পারব না?

যাঁরা তোতা পাখির মতো আউড়ে যান—"সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামই আনতে পারে শ্রেণিমুক্তি", তাঁরা অবশ্যই বিশ্বের তাবৎ ঘটনার থেকে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখেন শুধুমাত্র বইয়ের পাতায়। জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে এঁরা শিক্ষা নিতে চান শুধুই ছাপার অক্ষর থেকে। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাববাদও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে নেই, শোষণের প্রক্রিয়াগুলো। জিততে গেলে বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থেই শোষণের আধুনিকতম কৌশলগুলোকে বুঝতে হবে, শোষকদের বিরুদ্ধে আধুনিকতম কৌশলগুলোরই প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য যতই স্থির থাকুক, আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে মান্ধাতার আমলের অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালানো যায় না। এখানে অস্ত্র বলতে বোঝাচ্ছি—'মগজ-ধোলাই' নামক শক্তিশালী অস্ত্রের কথা, যে অস্ত্রের কার্যকারিতা ও সাফল্য প্রশ্নাতীত বলেই আজ তাতে যে কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তিই প্রশ্নাতীত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে একটা বিভেদের পাঁচিল তুলে দেন, তাঁরা চোখটি খুলে দেখতে চাননি সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কাল্পনিক বিভেদের পাঁচিল বার বারই ভেঙে পড়েছে, দুই আন্দোলনকর্মীরাই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, যখনই বঞ্চিত মানুষদের চেতনা মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা ময়দানে নেমেছেন।

একটা বিপ্লবের আগে জনগণকে মানসিকভাবে ক্ষুধার্ত করে তুলে, মোটিভেট করে তুলে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চালিত করা যায় এবং রাষ্ট্রশক্তির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা যায়, এটা যেমন আজ বহুবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তেমনই এও সত্য—বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বকে

বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে, বিচ্যুত নেতাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে এবং জনগণকে ভোগসর্বস্ব চিন্তা থেকে রক্ষা করতে, ভাববাদী চিন্তা থেকে বাঁচাতে একান্তভাবেই যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী চিন্তার এক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া, তাই তো সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

এমন একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকলে নেতারা বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে উঠতেই পারে। আখের গোছানো, স্বজন পোষণ ইত্যাদি দুর্নীতি ঘাড়ে চাপতেই পারে, যা পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোর নেতাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে মানুষের চিন্তাকে একমুখী করে তোলা সম্ভব, মানুষকে মোটিভেট করা সম্ভব— এটা আজ প্রমাণিত সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি—বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাও সে তুং-ও এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। ইয়েনানে শিল্পী সাহিত্যিকদের আলোচনা সভায় মাও-সে তুং এই বাস্তব সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঘোষণা করেছিলেন—সামরিক বাহিনী এবং সাংস্কৃতিক বাহিনী— এই দুই শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

গত কয়েক দশকের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখতে পাব, কোনও শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে পর্যায়ে তার সামরিক বাহিনীকে ময়দানে নামায়, তার বহু আগেই ময়দানে নামায় তার সাংস্কৃতিক বাহিনীকে। ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী শ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন রাখতে, পরিচালিত করতেই এমনটা করে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে সারাংশ উঠে আসে, তা হল — একটি সফল বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পরও সেই বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে, ধরে রাখতে লাগাতার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিমণ্ডল বজায় রাখা ও উন্নতি করার কাজ চালিয়েই যেতে হয়, যাতে শত্রুবাহিনী আবার ক্ষমতা না দখল করতে

পারে; যাতে আবার এক নতুন সুবিধাভোগী শোষকশ্রেণি না গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিলেও সাংস্কৃতিক বাহিনীর কোনও পর্যায়েই বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে না। বর্তমানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক বাহিনীর রণনীতি, কৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত জটিল। এই সাংস্কৃতিক বাহিনী জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত চেতনা গড়ে তুলতে ব্যর্থ-হলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোনও শক্তিশালীতম বাহিনীরও সাধ্য নেই এই ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপ দেওয়ার। অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি সমাজ সচেতন, শোষিতের মুক্তিকামী মানুষদের বুঝে নিতে হবে — বিপ্লবকে সফল করতে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আংশিক যুদ্ধ চালালে চলবে না। চালাতে হবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধ। আমাদের এ-বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে—অপসংস্কৃতির বর্তমান রূপ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তার জগৎকে পঙ্গু করে দেওয়ার কাজই করে চলেছে অতি সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে। এই বিষয়ে সংস্কৃতিক কর্মীদের স্বচ্ছতার অভাব থাকলে তাঁদের সংগ্রাম কখনোই চূড়ান্ত জয় ছিনিয়ে আনতে পারবে না। এ-কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই সংগ্রাম শুধু-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-মূলক সংগ্রাম নয়, একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ারও সংগ্রাম। পরিণতিতে নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসবে নতুন নেতৃত্ব, যে নেতৃত্বে থাকবে সমাজ পরিবর্তনের, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের অঙ্গীকার।

অধ্যায় : চার

ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : কেউ কথা রাখেনি

‘ইয়ং-বেঙ্গল’ বা বাংলার ‘রেনেসাঁস’

উনিশ শতকের গোড়ায় শহর কলকাতায় কিছু নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কিছু উদ্দীপ্ত মানুষ। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি গবেষক ও ঐতিহাসিক উনিশ শতকের এইসব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নায়কদের চিহ্নিত করেছেন ‘ইয়ং-বেঙ্গল’, ‘ডিরোজিয়ান’, ‘রেনেসাঁস যুগের পুরোধা’ ইত্যাদি বিশেষণে। এঁরা ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, পানাভ্যাস ইত্যাদির দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁস প্রবক্তা হিসেবে পরিচিতদের যেটি প্রধান ও স্থায়ী-কৃতি, তা হল ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিশাল উল্লম্ফন। যদিও এইসব সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক দুর্বলতা ছিল। প্রবন্ধ সাহিত্য ছিল বেশিটাই রম্যরচনা অথবা জিজ্ঞাসাবিহীন ভাষা। উপন্যাসে ও প্রবন্ধে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের যুক্তিযুক্ত, বাস্তববোধ-সম্পন্ন কোনও প্রতিফলন ছিল ভীষণ রকম অনুপস্থিত।

এই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যুগের মহানায়কদের প্রভাবে উনিশ শতকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কিছু মানুষ অতি স্পর্শকাতর বিভিন্ন অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিলেন। সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ, কুলীনপ্রথা, জাতিভেদ, ইত্যাদির বিপক্ষে এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষে এই সময়ই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যা ছিল অবশ্যই এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এরই পাশাপাশি এঁরা অনেকে গো-মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, স্নানাহ্নিক না সেরে খাদ্যগ্রহণ, ইউরোপীয় বেশভূষা ধারণ ইত্যাদির মধ্য দিয়েও সমাজের অভ্যস্ত জড়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রতিবাদের এই আন্দোলনের ফলে আমাদের সমাজ-জীবনে কিছুটা গতিশীলতা নিশ্চয়ই এসেছিল, দেখা

দিয়েছিল সাংস্কৃতিক জগতে কিছুটা প্রগতির হাওয়া। এই সময় বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের পুরোধা রামমোহন খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মের মেলবন্ধন ঘটিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একেশ্বরবাদী নিরাকার প্রভুর তত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব।

ইউরোপের রেনেসাঁস নিয়ে ছোট্ট একটু আলোচনা সেরে না নিলে বঙ্গীয় রেনেসাঁস নিয়ে একটা ভোঁতা চিন্তা, অস্বচ্ছ ধারণা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল।

যে ঘটনার নির্দেশক হিসেবে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, তার স্থান ও উৎস ছিল ইউরোপে। কনস্টান্টিনোপাল-এর পতনের (১৪৫৩ সাল) পর গ্রিক উদ্বাস্তুদের ইতালিতে আগমন এবং তৎপরবর্তীকালে একই সময়ে ইতালিতে বহু জিজ্ঞাসু, যুক্তিনিষ্ঠ, মৌলিক প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে।

সমাজের প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের প্রগতির উপর অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রগতির উপর।

মধ্যযুগে চার্চ ও রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে ইউরোপীয় সমাজ ছিল অজ্ঞানতার তমসায় আচ্ছন্ন। প্রতিভাবানদের জ্ঞান-চর্চা, তাদের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে; অর্থাৎ বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সমাজ ও সংস্কৃতির এই বিরাট উত্তরণ বা উল্লম্ফনকেই অভিহিত করা হয় 'রেনেসাঁস' নামে। তারপর ইতালির রেনেসাঁসের হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে ইতালি থেকে ফ্রান্সে এবং পরবর্তীকালে ইউরোপের আরও বহু দেশে।

ইউরোপের এই 'রেনেসাঁস' ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বণিকশ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাল্টাবার আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু শহরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামে।

এখন আর রেনেসাঁস শব্দটির প্রয়োগ শুধুমাত্র ইউরোপের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নেই। আমেরিকা, জাপান, চিন, আফ্রিকা, ভারত ইত্যাদি দেশের ক্ষেত্রে নতুন যুগকে, বিশাল প্রগতিকে চিহ্নিত করতে এই 'রেনেসাঁস' শব্দটিকেই ব্যবহার করছেন বুদ্ধিজীবীরা, ঐতিহাসিকরা।

এ-বার আমারা বিশ্লেষণ করে দেখব, ইউরোপের তুলনীয় কোনও রেনেসাঁস আমাদের দেশে হয়েছিল কি না; অথবা যা হয়েছিল তা নিছকই সমাজের উপরতলার কিছু ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষের সীমাবদ্ধ প্রয়াস কি না।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সঠিক মূল্যায়ন করতে চাইলে এই সময়কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে জানতেই হবে। নতুবা পরবর্তী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রগতি সত্যিই কতটা হয়েছিল, তার হদিশ পাব কী করে?

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকদের সহযোগী ছিল ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় এবং জমিদারশ্রেণি। এক সময় কলকাতা ছিল ইংরেজ শাসকদের রাজধানী। এই সময়কার বাঙালি ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় মোটেই স্বাধীন বা স্ব-নির্ভর ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের উপরই নির্ভরশীল। তার উপর জমিদারশ্রেণিও ছিল নিজ স্বার্থেই একান্তভাবে ব্রিটিশ-শাসনের সমর্থক। ব্রিটিশ সরকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে, তার ফলে এই বন্দোবস্ত মতো সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দেওয়ার বিনিময়ে জমিদাররা পেল জমির উপর নিঃশর্ত মালিকানাস্বত্ব। জমিদার হল কৃষকদের জমির মালিক। কৃষকরা এর ফলে পুরোপুরি ভাবে জমিদারের ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হল। জমিদারের ইচ্ছের উপর রইল কৃষককে চাষ করতে দেওয়ার বা উচ্ছেদ করার অধিকার। জমিদার ঠিক করে দিত কৃষক কতটা খাজনা দিতে বাধ্য থাকবে। খাজনা দিতে না পারলে কৃষককে আটকে রাখবার, তার অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার এবং তাকে জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার জমিদারদের দিল ব্রিটিশ সরকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত ছিল একটি বিশাল উৎপাদনকারী দেশ এবং একই সঙ্গে কৃষি-ভিত্তিক দেশ। ভারতের তাঁতবস্ত্র এই সময় এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হত। এ-ছাড়াও যেত সিল্ক, লবণ, সোরা ও মশলা। এই সময় দেশে বেকার যেমন কেউ ছিল না, তেমনই ছিল না কোনও ভূমিহীন কৃষক। এই কথাগুলো কোনও অতীত সুখ কল্পনার আবেগে লেখা নয়। এ-সবই ঐতিহাসিক সত্য। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "Studies in Bengali Renaissance' গ্রন্থে প্রকাশিত এন. কে. সিন্‌হা লিখিত 'Economic Background of the country'-তেও আমার এই কথাগুলোরই সমর্থন মিলবে।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের

দ্রুত অধঃপতন। এবং মাত্র বছর পঁচিশের মধ্যেই বাঙালির শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে দেশীয় বাজারকে প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করল ব্রিটিশ শিল্প-দ্রব্য। ব্রিটিশ সরকার এমনভাবে বাণিজ্যিক নীতি ও আইন তৈরি করতে লাগল, যার ফলে ভারতে তৈরি হতে লাগল ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল। ব্রিটিশ সরকার সচেষ্ট হল তাদের দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসেবে ভারতবর্ষকে দখল করতে।

এই সময়কার বাঙালি অগ্রণী শিল্পোদ্যোগী এবং রেনেসাঁস-এর অন্যতম পুরোধা দ্বাকানাথ ঠাকুর গভীর হতাশা থেকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ব্রিটিশরা এ-দেশীয়দের যা কিছু ছিল সবই কেড়ে নিয়েছে। এখন এদেশীয়দের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং সবকিছুই নির্ভর করছে ব্রিটিশ সরকারের করুণার উপর।

এরপর তিনিও ব্যবসা গুটিয়ে তাঁর প্রায় সমস্ত অর্থই নিয়োজিত করেন জমিদারি কিনতে। এ-ভাবে বহু ধনীরাই তাদের অর্থ নিয়োজিত করেছিল জমিদারি কিনতে। ফলে ব্রিটিশদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা দেশীয় ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়, ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহী ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় এবং বাঙালি জমিদারদের স্বার্থে তাদের পালক ও পোষক ব্রিটিশ রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। ফলে দেশীয় বণিক শ্রেণি ও জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার রক্ষাকবচকে আবিষ্কার করল।

বঙ্গীয় জমিদার সম্প্রদায়, জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকলের স্বার্থ সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে এই সব দেশীয় সম্প্রদায় এ-দেশে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ও সহযোগী হয়ে পড়েছিল। একইভাবে ব্রিটিশ সরকারও ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শোষণকে কায়েম রাখতে এবং আরও তীব্রতর করতে তাদের সমর্থক ও সহযোগী সম্প্রদায়কে পালন ও পুষ্ট করতে অতি মাত্রায় সচেষ্ট ছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাস্তবিক পক্ষেই অসম্ভব ছিল জমিদারতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিকে ধ্বংস করে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতির জন্য তাদের পুঁজি বিনিয়োগে চাপ সৃষ্টি করা।

বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষদের অধিকাংশই ছিলেন

ইংরেজদের সহযোগী অথবা ইংরেজ-সহযোগীদের সন্তান। অর্থাৎ সে সময়কার ইয়ং-বেঙ্গলদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজদের অনুগ্রহধন্য। এইসব বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশাল সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তাঁরা প্রগতিকে ব্রিটিশ প্রগতির সমর্থক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ব্রিটিশরা যে আমাদের দেশে আধা-ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে গেছে, সে-কথা বার-বারই সজ্ঞানে এড়িয়ে গেছেন।

একটি ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরোধিতা করাটাই কোনও আন্দোলনের পক্ষে বা ব্যক্তির পক্ষে প্রগতিশীল হিসাবে চিহ্নিত করার মাপকাঠি হওয়া উচিত।

ঔপনিবেশিক প্রভুর দালালি করাটা, সহযোগিতা করাটা কোনওভাবেই প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হতেই পারে না, বরং, তাদের দেশদ্রোহী, ঔপনিবেশিক শক্তির দালাল বলেই চিহ্নিত করা উচিত।

শহরবাসী, বণিকশ্রেণি, শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভূস্বামী শ্রেণির একটি অংশ যাঁরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে তথাকথিত 'রেনেসাঁস' আন্দোলনকে 'রেনেসাঁস' ছাপ মেরে দিয়েছিল 'প্রগতিবাদী', 'নবজাগরণের প্রতিভূ' ইত্যাদি বলে প্রচার চালিয়েছিল সাধারণ মানুষের মগজ-ধোলাই করে তদের প্রভাবিত করতে, 'প্রগতি' ও 'ব্রিটিশ সমর্থন'কে সমার্থক হিসেবে মাথায় ঢোকাতে।

ইয়ং-বেঙ্গলদের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হল এই তথাকথিত রেনেসাঁসের প্রধান চরিত্রগুলোর অধিকাংশই জনগণের ব্যাপক অংশের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

তৃতীয় সীমাবদ্ধতা হল ওঁদের আন্দোলন ছিল শহরকেন্দ্রিক। গ্রামে এর কোনও প্রভাব দেখা যায়নি।

চতুর্থ সীমাবদ্ধতা হল, রেনেসাঁসের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশিরভাগ সমাজ-সংস্কারই তৎকালীন বাঙালি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে ছিল অর্থহীন। ইসলাম ধর্মে সতীদাহ নেই, বিধবা বিবাহ আছে, মুসলমানরা গো-মাংস খান। অবিভক্ত বাংলার অর্ধেকের বেশি মানুষ যেহেতু মুসলমান, তাই এ-কথা তো অবশ্যই সত্য যে বেশিরভাগ বাঙালিদের (মুসলমানদের) কাছে এ-সবের কোনও প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। এ-কথাও নির্মম সত্য যে, এইসব সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ না থাকাটাই সমাজ-অগ্রগতির সূচক নয়। তারই জ্বলন্ত

উদাহরণ ভারতের মুসলিম সমাজ। মুসলিম সমাজে সতীদাহ প্রথা চিরকালই অনুপস্থিত, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, কনের পূর্ণ সম্মতিতে বিয়ে দিতে হয় বলে একটা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে রয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্কার বিয়ে ইসলামি মতে হতে পারে না। কিন্তু ভারতের মুসলিম সমাজে অপ্রাপ্তবয়স্কার বিয়ে হয়, এবং এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রভাবে। গো-মাংস মুসলমানেরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যে কয়টি বিষয় ঘিরে বাংলার রেনেসাঁস যুগের সমাজ সংস্কারের ঝোঁক দেখা গেছে, তার প্রায় সব কটি সংস্কারেরই ঊর্ধ্বে ছিল বাংলার মুসলমান সমাজ। কিন্তু তাতে বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতি লক্ষিত হয়েছে কি? শোষণ মুক্তি ঘটেছে কি? না, ঘটেনি। বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগুরু অংশই ছিল হিন্দু সংখ্যাগুরু অংশের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে পড়া, বেশি শোষিত।

আধুনিক ভারতে নিরাকার ঈশ্বর তত্ত্ব বা একেশ্বরবাদী ঈশ্বর তত্ত্ব পুনঃপ্রবর্তন করেন রামমোহন নন, মুসলমানগণ।

পঞ্চমত, রেনেসাঁস আন্দোলনের বিরাজমান হিন্দুধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব মুসলমান চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এর ফলে ভারতে যে হিন্দু-মুসলিম ধর্মকে ভিত্তি করে দ্বিজাতিতত্ত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তাতে শোষিত মানুষদের একত্রিত সংগ্রাম চেতনা যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তেমন এই বিভেদ ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে অতি সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

মুসলমানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য রূপে হিন্দু দেবীর আদলে ভারতমাতার রূপ কল্পনা করে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষকে পুষ্ট করতে সাহায্যই করেছিলেন।

রামমোহনের চিন্তায়-চেতনায় যে মুসলিম বিরোধী মানসিকতা স্থান পেয়েছিল তারই স্ফুরণ দেখতে পাই ১৮০৪ সালে প্রকাশিত তাঁর লিখিত এক প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বলছেন, "ইসলামধর্মীরা ব্রাহ্মণজাতির অনেক ক্ষতি করেছে ও তাদের ওপর অনেক নির্যাতন করেছে।" (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১২৭)

বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের নায়করা প্রত্যেকেই মনে করতেন, 'জাতি ও ধর্ম সমার্থক'। কাজেই জাতির উন্নতি ও মুক্তি বলতে তাঁরা বুঝতেন নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মুক্তি।

ষষ্ঠত, একগাদা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যতই প্রচারে রামমোহনকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' বলে সোচ্চার হোন না কেন এবং রেনেসাঁস 'ভারতীয়

জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছিল' বলে স্বীকৃতি দিন না কেন এ সবই যে বুদ্ধিজীবীদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গির ফল, যুক্তির নিরিখে মূল্যায়নে বসলে এই সত্য বার বারই বেরিয়ে আসবে।

রামমোহন যে একনিষ্ঠ ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ছিলেন, এই সত্যকে রেনেসাঁসের সমর্থক প্রতিটি বুদ্ধিজীবীই স্বীকার করেন বা বলতে পারা যায়, রামমোহনের জীবনচর্যার বিভিন্ন পর্যায়ে, লেখায়, বক্তব্যে এত বেশি বেশি করে তাঁর ব্রিটিশ শাসন অনুরাগের প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে যে, রামমোহনের সবচেয়ে বড় সমর্থককেও তা স্বীকার করতেই হয়। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশি শাসনের অধীনে

রামমোহনের এই জাতীয়তাবাদের মূল কথা ছিল—ব্রিটিশ শাসনের উপর জাতির একান্ত নির্ভরতা, ব্রিটিশ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ হিস্েবে গ্রহণ করা।

পরাধীন ভারতে রামমোহনীয় এই জাতীয়তাবোধে ছিল না কোনও রকম বিপ্লবী সত্তা। এমন মেকি জাতীয়তাবোধ থেকে জন্ম নেওয়া পরবর্তী জাতীয়তাবাদী নেতারা তাই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পথে না গিয়ে গিয়েছিলেন দর কষাকষির মধ্য দিয়ে আপসে স্বাধীনতা পাওয়ার পথে। এ কোনও বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্য নয়, নয় অজ্ঞাতাজনিত বাচাল-কথা, এই কথাগুলো ঐতিহাসিক সত্য। রেনেসাঁস-উদ্ভূত এই বিকৃত জাতীয়তাবাদ ছিল বিত্তবান বণিক, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী। এমন জাতীয়তাবোধের ফসল হিসেবেই ১৮৪৩ সালে ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'। ১৮৫১ সালে এই সোসাইটি মিশে গেল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে। ১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৮৩ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন হল কলকাতায়। সম্মেলন সভাপতি আনন্দমোহন বসু একে আখ্যা দিলেন 'ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট' বলে। এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিণতিতেই ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'। এইসময় অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছিল এবং সেই সংকটের পরিণতিতে যেভাবে দ্রুত জনক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার যথেষ্টই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময়কার

ব্রিটিশ ভাইসরয় ডাফরিন গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করতে ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ এক আন্দোলনে আটকে রাখতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টিতে মদত দিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি তাঁর লেখা 'Introduction to Indian Politics' গ্রন্থে দ্বিধাহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন কংগ্রেস 'ডাফরিনেরই অবদান'।

বাংলার রেনেসাঁসের নায়করা যে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, এই বাস্তব সত্যটি আজ বাংলার রেনেসাঁসকে 'মহান' বলে সিলমোহর দেগে দেওয়া বুদ্ধিজীবীরাও স্বীকার করেন। এইসব রেনেসাঁসপন্থীরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে যে যুক্তি হাজির করেন, তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মোটামুটি একই রকম। বক্তব্যের মূল সুর হল : ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতবর্ষের সমাজ প্রগতির গতি ছিল রুদ্ধ, অনড়। উন্নততর সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে ব্রিটিশরা ভারতকে নিজেদের অধীনে রাখার ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজের অচলতা সচল গতি পেয়েছিল। ব্রিটিশ-শাসনে ভারতীয় সমাজ-প্রগতির বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অশোক রুদ্র ১৯৮১ তে 'Frontier' পত্রিকায় 'Reassessment of the 19th century' শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের নায়করা সঠিকভাবেই আমাদের পুরোনো সামাজিক অবস্থাকে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং এই বাধাকে অপসারণের জন্যেই তাঁরা ব্রিটিশ-শাসনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অশোক রুদ্রর বক্তব্য মেনে নিলে বিগত দু-তিন শতক ধরে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিল, তাকেও তবে সমর্থন জানাতেই হয়। কারণ এই ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশই পুরোনো সমাজে অগ্রগতি আনতে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থনই যদি প্রগতিশীলতার লক্ষণ হয়, তবে ব্রিটিশ শাসনের আরও বড় সমর্থক ও সহায়ক বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠরা নিশ্চয়ই অশোক রুদ্রের চোখে আরও বড় প্রগতিশীল ছিলেন।

মানিক মুখোপাধ্যায় 'পথিকৃৎ' পত্রিকায় '৮৪ তে লেখা 'ভারতীয় রেনেসাঁ' ও রামমোহন' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন, ব্রিটিশ-শাসনে যখন ভারত ছিল, তখন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। ওরা চেয়েছিল এ-দেশের রাজা-জমিদার ইত্যাদি সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তাদের পুঁজিকে আকর্ষিত

করতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের স্বার্থেই সমাজ-প্রগতিকে গতিশীল করতে। সমাজ-প্রগতির জন্যেও ব্রিটিশ-শাসকদের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের। ফলে ব্রিটিশ-বাণিজ্যিক পুঁজি এবং ভারতীয় বাণিজ্যিক পুঁজি ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির প্রধান বাধা ভারতীয় সামন্ত প্রভুদের শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সময় ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রতি সমর্থনকে তাই বলতে হবে প্রগতিশীল।

মানিক মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবী কী করে এমন নিপাট মিথ্যে লিখলেন? তাঁর কি এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু জানা নেই—ব্রিটিশ সরকার রাজা-জমিদার ইত্যাদি সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চায়নি, বরং গড়ে তুলতেই চেয়েছিল? চাওয়ার কারণ, উপনিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিশাল সেনাবাহিনী ইংলন্ড থেকে না এনে এখানকার রাজা-জমিদারদের মতো সামন্তপ্রভুদের ব্রিটিশ সমর্থক করে তাদেরকেই উপনিবেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে লর্ড বেনটিঙ্ক-এর বক্তব্য থেকে আর কে মুখার্জির উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া 'Rise and Fall of the East India Company' বইটির ২৩৮ পৃষ্ঠা থেকে দুটি মাত্র লাইন হাজির করছি। কর্নওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর প্রায় চল্লিশ বছর পর লর্ড বেনটিঙ্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে ভারতে কতটা প্রয়োজনীয় ছিল সে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রশ্নে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক বিশাল সুবিধা রয়েছে। এই বন্দোবস্তের ফলে যে বিপুল সংখ্যক জমিদার তৈরি হয়েছে, তারা নিজ স্বার্থেই ব্রিটিশ প্রাধান্য বজার রাখতে উৎসাহী, ব্যাপক জনগণের উপরও তাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে।"

উপরের কথাগুলো থেকে এবং পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্টতর হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার যেমন সামন্তপ্রভুদের উচ্ছেদ চায়নি, তেমনই চায়নি দেশীয় পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে আকর্ষিত করতে। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে সমাজকে গতিশীল করতে ব্রিটিশ সরকার সচেষ্ট হয়েছিল—এই কুযুক্তিও কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘ সময়ের অভিভাবক রজনীপাম দত্ত তাঁর 'India Today' গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক রামমোহন রায়কে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' বলে চিহ্নিত করেছেন।

জানি না রজনীপামের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদের অর্থ কী? 'জাতীয়' কথার অর্থ জাতি সম্বন্ধীয়। রামমোহন কোন জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব এবং ভারতের জনগণের পরাধীনতাকে সোচ্চারে সমর্থন জানিয়েছিলেন? তিনি ধনীজাতীয় মানুষ সম্পর্কিত উপলব্ধি থেকে, ধনীজাতীয় মানুষদের স্বার্থ চিন্তা থেকে বৈদেশিক প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই 'ধনী' ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের জনক' ছিলেন—এই কথাটি বলতে রজনীপামের দ্বিধা কেন? আর কবে এইসব বুদ্ধিজীবীরা স্পষ্ট ভাষায় 'গোলাপ'কে 'গোলাপ', আর 'কোদাল'কে 'কোদাল' বলবেন?

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নরহরি কবিরাজ মার্কসবাদীদের একদা অভিভাবক রজনীপাম দত্ত, বুদ্ধিজীবী শিবনারায়ণ রায়, অশোক রুদ্র ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উনিশ শতকের রেনেসাঁসকেই সমর্থন করেছেন। যদুনাথ তো রেনেসাঁসকে "The greatest gift of English" বলেই ঘোষণা করেছেন। তাঁদের এমনতর স্বীকৃতির মধ্যে যুক্তির কোনও স্থান ছিল না। যুক্তির নিরিখে এইসব বিখ্যাতদের বক্তব্য নিতান্তই অসার হয়ে পড়ে।

রেনেসাঁসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁস যুগের পুরোধা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, ডিরোজিও প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতাদের যে মূল্যায়ন হয়ে আসছে তার মধ্যে যুক্তিবিচার বাস্তবিকই স্থান পায়নি। ব্যক্তিপূজার ফলে এঁরা অনেকেই আজ এমনই এক কিংবদন্তি জগতের মহানায়কের রূপ পেয়েছেন যে এঁদের সীমাবদ্ধতা, নেতিবাচক দিক, ভ্রান্ত-চিন্তা, এমনকী, দেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো দিকগুলোর প্রতিও বর্তমানের মূল্যায়নকারীরা কিছু বলতে ভয় পান। ফলে জনসমর্থন সচেতন এইসব সমালোচকদের কৃপায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এইসব নায়ক চরিত্রগুলোর মূল্যায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রেনেসাঁস যুগের নায়কেরা কেউই তাঁদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে বাস্তবিকই 'মহান' হয়ে উঠতে পারেননি। বাস্তবপক্ষে তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁদের অসাধারণ গুণাবলি ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাঁদের এই রেনেসাঁস নামক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল স্পষ্টতই সংখ্যালঘু কিছু মানুষের জন্য তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ এক খণ্ডিত ও আধুনিকতার প্রহসনে আবদ্ধ আন্দোলন।

৫

‘প্রগতি লেখক সংঘ’

১৯৩৫ সালের শেষাশেষি লন্ডনের কিছু প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও লেখক মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে এসে প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘প্রগতি লেখক সংঘ’। ‘প্রগতি লেখক সংঘ’র প্রথম ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিলেন সজ্জাদ জহির, মুলুকরাজ আনন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে হীরেন মুখার্জি, রাজা রাও, মহম্মদ আশ্‌রফ, ইক্‌বাল সিং, ভবানী ভট্টাচার্য, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ইস্তাহার মুসাবিদার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে-সময়কার প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের ‘ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড’ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ওপর।

ইস্তাহারটিতে যা বলা হয়েছিল তারই কিছুটা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের করা বাংলা তর্জমা থেকে তুলে দিচ্ছি :

“সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে, আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও অধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে। পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গি অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে। তার ভাবসম্প হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।”

“আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধরেছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা— এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য।....”

“...যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে উদ্‌বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে,

আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপুষ্ট সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

এই ইস্তাহারের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস দলের মণ্ডপেই 'সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'— এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক মুনশি প্রেমচন্দ্। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন সরোজিনী নাইডু। সম্মেলনে উৎসাহ জোগালেন জওহরলাল নেহরু। '৩৬ সালের এই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্মেলনে সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সজ্জাদ জহির। তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অতি ধনী পরিবারের সন্তান। বাবা, ইংরেজ সরকার বাহাদুর কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত জহির হাসান। সজ্জাদ-এর এক ভাই হুসেন জহির ছিলেন কংগ্রেস নেতা, আর এক ভাই আলি জহির ছিলেন মুসলিম লিগ নেতা। সজ্জাদ পরিবার ও নেহরু পরিবার ছিলেন হরিহরাত্মা।

সজ্জাদ-এর নেতা পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সমালোচনা নয়; দৃষ্টান্ত টেনে শুধু বলতে—সংঘের নেতৃত্বে এমন ধরনের উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তের ভিড় ছিল যথেষ্ট।

বিশ্ব-সাহিত্যের দিক্‌পাল স্বনামধন্য লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ১৯৩৬-এর ১১ জুলাই অ্যালবার্ট হলের কমিটি রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, খগেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, আনন্দবাজার), ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, অ্যাডভান্স)। গোর্কির এই শোকসভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

১৯৩৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী নিয়ে প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেছিল 'প্রগতি' নমের সংকলন। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হীরেন মুখার্জি ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সংকলনটিতে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ভূমিকায় নরেশচন্দ্র

সেনগুপ্ত লিখেছিলেন : "মানবের মানবত্বকে আকস্মিক ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সব মানবের সংহত চেষ্টা প্রয়োজন। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টা আজ প্রয়োজন— মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।"

১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন। সংগঠক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন মুখার্জি প্রমুখ। সারা ভারত থেকে ওই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রগতি সংস্কৃতির শিবিরের ভিতরে ও বাইরে শুরু হল মতবাদ ও মতাদর্শের লড়াই। একদিকে বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল। অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, হীরেন মুখার্জি প্রমুখ। বিনয় ঘোষরা সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে চাইলেন প্রগতি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দুর্বলতা দূর করতে। তাঁদের মতে মেকি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে কাজটি সংঘ করে চলেছে তাকে বলা যেতে পারে— বিভিন্ন মতের শিল্পী—সাহিত্যিকদের দলে ভিড়িয়ে দল বাড়াবার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা মাত্র। নেতৃত্ব সংঘের শিল্পী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে একমুখী করতে পারেনি, অর্থাৎ নিপীড়িত মানুষদের সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেনি; পারেনি নিপীড়িত মানুষদের চেতনাকে যুক্তিবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বাইরের লড়াইটা হয়েছিল একটু অন্য ধরনের। উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত ও অনর্গল ইংরেজদের মতন ইংরেজি বলতে পারার সুবাদে অনেকেই তখন সংঘের নেতা হয়ে বসেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশেষ মর্যাদা পেতে শুরু করেছেন। এইসব উচ্চমার্গের নেতারা যখন 'মজদুর হাম হ্যায়' গানে গলা মেলালেন, তখন শ্রমিক শ্রেণি এঁদের 'হিরো' হিসাবে ধরে নিলেও এঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেন না।

মার্কস-লেনিন-এঙ্গেলস্-এঁরা কেউই শ্রমিক শ্রেণির মানুষ ছিলেন না, যেমন পৃথিবীর বহু বিপ্লবী চরিত্রই শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন বলেই, নিপীড়িত মানুষদের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে যুক্ত করার মধ্য দিয়েই সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকদের বিশ্বাসযোগ্যতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

ভারতে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্বে যে-সব 'বুদ্ধিজীবী' ও 'বিলেত-ফেরত'দের প্রাধান্য ছিল, তাঁদের কাজকর্ম শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে 'শ্রেণিচ্যুত' হতে হয়নি, এইসব নেতারা মুখে 'শ্রেণিচ্যুতি'র প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে কোনও দিনই সচেষ্ট হননি। নিপীড়িত মানুষদের জীবনে নিজেদের জীবন যুক্ত করার পরিবর্তে মুখ আর কলমকে কাজে লাগিয়ে যে-টুকু করেছিলেন, তাতে এঁদের পুরো ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'শৌখিন মজদুরি'। ফলে সংঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ার আহ্বান নেহাতই রসিকতায় পরিণত হল। চল্লিশ দশকের শুরুতেই প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্ম কার্যত হল স্তব্ধ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ
(Indian People's Theatre Association)

১৯৪৩-সালের কথা, তখন জাপান বিরোধী যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে কিছু ব্রিটিশ বৈমানিককে চিনে যাতায়াত করতে হত। এই বৈমানিকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-পার্টির সভ্য। এঁরা প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে তুলে দেন ইয়েনান ফোরামে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মাও সেতুঙ্-এর ভাষণের কপি। কমিউনিস্ট পার্টি তা সাইক্লো করে বিভিন্ন

প্রদেশের প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়। মাও-এর এই ভাষণ পড়ে অনুপ্রাণিত হলেন বহু কর্মী। ভাষণে বলা হয়েছিল—শুধু মাত্র সেনাবাহিনীর সাহায্যে কখনওই বিপ্লব সফল হতে পারে না, বিপ্লব সফল করতে গেলে আর একটি বাহিনীর প্রয়োজন, আর তা হল—সাংস্কৃতিক বাহিনী, যারা নিপীড়িত মানুষদের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব শ্রেণি সংগ্রামকে, নিপীড়িত মানুষদের সংগ্রামকে কখনওই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চাইতেন না, তাই পলিটব্যুরোতে বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনও দিনই 'সংস্কৃতি আন্দোলন' বিষয়ক আলোচনা স্থান পায়নি। নেতৃত্ব ভাবতেন— যে কোনওভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা একবার দখল করতে পারলেই ঝপাৎ করে মানুষের চরিত্রগুলোও পাল্টে যাবে। (তা যে কত বড় ভ্রান্ত চিন্তা তারই প্রমাণ মেলে সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর হাল হকিকত দেখে।)

মাও সেতুঙ-এর ইয়েনান ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো এ-বিষয়ে কোনও আলোচনা চালাবার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এই নেতৃত্ব 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন। তাঁরা 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাপকতা বুঝতেও ছিলেন অক্ষম। এমন অবুঝ নেতাদের চোখে 'সংস্কৃতি' বলতে ধরা পড়ত নিছকই গান-বাজনা-নাটক। আরএই সংস্কৃতিকে তাঁরা ব্যবহার করতেন স্রেফ মিটিং-এ লোক জমাতে অথবা চাঁদা তোলার প্রয়োজনে।

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠল নাটক, গান ও নাচের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে তাকে আরও শক্তিশালী করতে। '৪৩-এর ২৫ মে বোম্বাইতে প্রথম নিখিল ভারত গণনাট্য সম্মেলনের প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা রাখা হয়েছিল—"এই আন্দোলনের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে উদ্দীপিত করে তোলা, যাতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাহস ও দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন।"

গণনাট্য সংঘ অর্থাৎ আই পি. টি. এ-র এক নম্বর বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে, শিরোনাম ছিল 'Historical Background' অর্থাৎ 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট'। তেরোটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ইংরেজিতে রচিত এই বুলেটিনে বলা হয়েছিল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের

কথা, ধ্রুপদী শিল্পকলা ও লোককলার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণের কথা। বলা হয়েছিল—সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী ভাবে শিল্পকলা সামঞ্জস্যহীন হয়ে যাচ্ছে তার কথা, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার কথা। তেমনই নাট্য-প্রসঙ্গও এসেছে, এসেছে শিল্প-সাহিত্যিকদের দায়িত্ববোধের কথা। অন্ধ্র, মালাবার, বাংলা এবং বোম্বাইয়ের খেটে-খাওয়া মানুষদের প্রাণমাতানো গানের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছিল—দেশের চিরায়ত নৃত্যশৈলী আর মন্দির বা রাজসভার মধ্যে আটকে থাকবে না, তা সংগ্রামী মানুষের ভাবকে প্রকাশ করবে। এর থেকেই সৃষ্টি হবে নতুন নাট্যকলার।

এল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। যুদ্ধের বারুদের গন্ধে, মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ, প্রতিবাদহীন মৃত্যু— আমাদের দেশের মানুষ এইসব বীভৎস অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। হিটলার এক সময় সোভিয়েত আক্রমণ করলেন। ভারতীয় কমিউনিস্টরা সোভিয়েতের মিত্র-পক্ষ ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করতে সচেষ্ট হল ব্রিটিশদের যুদ্ধ চালাবার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের দেশে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সে-দিন বাংলার যে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রতিবাদহীন ভাবে মৃত্যুকে মেনে নিল, তার জন্য প্রধান দায়ী ব্রিটিশ রাজশক্তির দিকে আঙুল না তুলে কমিউনিস্টরা দায়ী করল শুধু মজুতদার-কালোবাজারিদের। সে সময় ভ্রান্ত রাজনীতির ফসল হিসাবে হাজির হল 'নবান্ন' নাটক। নাটক হিসেবে যত সার্থকই হোক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দক্ষতা যতই তুঙ্গে উঠুক নাটকের বক্তব্যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের সুরের পরিবর্তে আমরা দেখলাম নিপীড়িত মানুষদের ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে ঘটে গেল নাবিক বিদ্রোহ। নাবিকদের প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সাহায্য চাইতে পলিটব্যুরোর সদস্যরা নাবিকদের হতাশ করে গান্ধী ও জিন্নার কাছে পাঠালেন। বম্বের সেই নৌ-বিদ্রোহ ইতিহাস তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল।

সে সময় গণনাট্য সংঘ নৌ-বিদ্রোহের উপর ব্যালে নৃত্য হাজির করল। গানে সেদিন ধ্বনিত হল রক্তের ঋণ রক্তে শোধার শপথ। বোম্বের সরকার ওই ব্যালে নৃত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন।

১৯৪৯-এর ১৬ আগস্ট, শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা ভারতের শোষিত শ্রেণিদের ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত করল। গণনাট্য সংঘ উদারনৈতিক মানবিকতার কাঁদুনি মিশিয়ে নামাল নাচ-গান-ছায়া-নাটক। ছায়া-নাটকে

'শহিদের ডাক' আঙ্গিকে অভিনয়ে অসাধারণ হলেও শৃঙ্খলিত মানুষদের চেতনা মুক্তির ক্ষেত্রে এই নাটকের অবদান ছিল এক বিরাট শূন্য।

১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারিতে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলন ছিল খুবই তাৎপর্যময়। এই সম্মেলনে মাও সেতুঙ-এর ইয়েনান ফোরামে রাখা বক্তব্য—'শিল্পকলা কার জন্য' বিশেষ ভাবে নাড়া দিল। সম্মেলনে গর্বিত ঘোষণা রাখা হল—"আমাদের মূল দর্শক সংগ্রামী জনতা"। একই সঙ্গে এই সম্মেলনেই প্রকাশিত হল আন্দোলনের এক বিশাল দুর্বলতা—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন (অবশ্যই সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই আন্দোলন ছিল না) গড়ে তুলতে, জনগণকে বাস্তবিকই নাড়া দিতে জনগণ এবং জনগণের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী প্রগতিশীল মানুষদের আন্দোলনে শামিল করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক 'ফ্রন্ট' বা সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ার বাস্তবিক প্রয়োজন অনুধাবনে গণনাট্য সংঘের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিল। নেতৃত্ব নিজ-সংগঠনের হাতে রেখে 'ফ্রন্ট' গড়ে সংগঠনের বাইরের প্রগতিশীলদের সংগঠনের মূল স্রোতে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকে সমাজের ব্যাপকতর অংশে ছড়িয়ে দিতে পারলে তবেই আন্দোলন সার্থক রূপ নিতে পারে, নতুবা আন্দোলন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বা শুধুমাত্র 'কমিটেড' লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সমাজ বিজ্ঞানের এই সত্য অজানা থাকার দরুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক 'ফ্রন্ট' গড়ে তোলার কোনও কর্মসূচি এই ষষ্ঠ সম্মেলনেও রাখা হল না। সম্মেলনে বলা হল—'যে সব শ্রেণি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলে কেবল তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে সমাজতান্ত্রিক শিল্প।"

নেতৃত্বের ভুলে সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম মতোই দেখা গেল সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গড়ার আহ্বান রাখায় গণনাট্য আন্দোলন ক্রমশ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

১৯৫৩ সালে বোম্বাইতে গণনাট্য সংঘের সপ্তম সম্মেলনে ঘোষণা-পত্রে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ-সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহবান জানানো হল ভাসাভাসা ভাবে। এরই পাশাপাশি ঘোষিত হল বিশ্বশান্তির কথা, 'সংগীত-নাটক আকাদেমি'কে স্বাগতম জানাবার কথা। ধনিকের অর্থে গদিতে বসা সরকার যারা কিনা শোষণের স্বার্থেই, গরিবদের মগজ ধোলাইয়ের স্বার্থেই অপসংস্কৃতির ধারক-বাহক, তাদের কাছেই গণনাট্য সংঘ আবেদন করল অর্থ সাহায্যের। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক অজয় ঘোষ নেতৃস্থানীয় পার্টির শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক ঘরোয়া সমাবেশে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন

গণনাট্য সংঘকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে সংঘাতহীন সহাবস্থানের নীতি মেনে চলতে হবে। যেটুকু সুস্থ নাটক-সংগীতের মাধ্যমে সংস্কৃতির কলা বিভাগকে উন্নত করার প্রয়াস গণনাট্য সংঘ নিয়েছিল, তাকে কবরে পাঠাল অজয় ঘোষের আপসকামী শোধনবাদী চিন্তা।

অজয় ঘোষের চিন্তাধারায় ১৯৫৮ সালের অষ্টম সম্মেলন পর্যন্ত চলল গণনাট্য সংঘ। দিল্লির অষ্টম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংগীত-নাটক আকাদেমির আমলাদের বিপুল উপস্থিতি ছিল অতি লক্ষণীয়। সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হলো, 'সংগীত-নাটক আকাদেমিকে অনুরোধ করা হোক, তারা যেন শিল্পের স্বার্থ সাধনের জন্য আমাদের সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং আমাদের বিভিন্ন শাখা ও শিল্পীদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে আমাদের প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ করে।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'New Age'-এ পি. সি. যোশী প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখলেন : 'গণনাট্য সংঘ সংগীত-নাটক আকাদেমির স্বীকৃতি লাভ করেছে।' আরও লিখলেন, 'এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ নিজেকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছে।' এ কি দলের কলেবর বৃদ্ধির স্বার্থে আদর্শ বিসর্জন, না কি স্বার্থবুদ্ধি নেতাদের এ-ভাবে আপসকামী ও হুজুরদের স্বার্থরক্ষাকারীতে রূপান্তরিত করেছে?

এল ১৯৬২ সাল। চিনের বিরুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল রাষ্ট্রশক্তি। সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাল জাত্যভিমানের ঝড় তুলতে। আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-ঘেঁষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'দেশপ্রেমিক' প্রমাণ কবে অনুকূল স্রোতে গা ভাসাতে। গণনাট্যের লড়াকু লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী গানের কথা পাল্টে ফেলে রাতারাতি নেমে পড়লেন দেশপ্রেমের জোয়ার আনতে। ভূপেন হাজারিকা তাঁর 'ভারত সীমানায়' গানের কথাই পাল্টে দিয়ে কমিউনিস্ট অপবাদ কাটিয়ে 'দেশপ্রেমিক' হয়ে গেলেন। গানের কথা ছিল, 'চিনের জনতার জয়ধ্বনি শুনি'। এ-জায়গায় তিনি নতুন করে কথা বসালেন, 'গাঁয়ের সীমানায় নিশীথ রাত্রির পদধ্বনি শুনি'। গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট সংগঠক অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস চিন-বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করলেন—পাছে পুলিশ তাঁকে চিনপন্থী বলে ঝামেলা করে। মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট গণনাট্য সংগীতকার ওমর শেখও রাতারাতি ভোল পাল্টালেন। ডিগবাজি খাওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমিউনিস্টদরদী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেউই পিছিয়ে রইলেন না। গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি নাট্যকার দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সীমান্তের ডাক' নামে চিন-বিরোধী একটা নাটকই রচনা করে ফেললেন। এমন ডিগবাজিকারদের সংখ্যা এতই বিপুল যে তাঁদের নামের ফিরিস্তি দিয়েই একটা গোটা বই লিখে ফেলা যায়। তবে এ-কথা বাস্তব সত্য যে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বড় অংশই ডিগবাজির খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। এমন এক হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়া আত্মবিক্রির মধ্যে দিয়ে গণনাট্য সংঘের নাটক-গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ার আংশিক চেষ্টাটুকুও বিশাল ধাক্কা খেয়েছিল।

সময় এগিয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে, অপসংস্কৃতির জোয়ারে সুস্থ সংস্কৃতিকে পিছু হটতে হয়েছে—জায়গা করে দিতে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে সংসদীয় কমিউনিস্টরা যেন-তেন-প্রকারেণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতার মধুপানকেই জীবনের একমাত্র কাম্য করে নিয়েছে। ফলে গণনাট্য সংঘের এখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটবাক্সকে স্ফীত করতে গান ও নাটক লেখা।

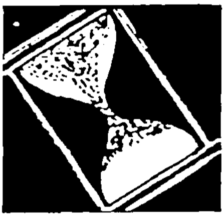

অধ্যায় : পাঁচ

নকশালবাড়ির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন

নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। নকশালবাড়ির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-নাটক-গান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন যাত্রা যুক্ত করতে এগিয়ে আসেন বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-গীতিকার-বুদ্ধিজীবী। এঁদের অনেকেই নকশালবাড়ির আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও বেশির ভাগই ছিলেন নকশালবাড়ির সংগ্রামের সমর্থক, অনুরাগী—পার্টির সদস্য নন।

কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো 'তির' নাটক। উপস্থাপনায়, পরিচালনায়, অভিনয়ে সার্থক নাটক 'তির'-এ ছিল নকশালবাড়ির সংগ্রামের কথা। 'তির' নাটকটি লেখার আগে উৎপল দত্ত নাটকের উপাদান সংগ্রহার্থে নকশালবাড়ি গিয়েছিলেন। সেই সময় এক চক্কর ঘুরে গেলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গিতে বললেন, "একদিকে নকশালবাড়ি, আর এক দিকে বেশ্যাবাড়ি। মাঝখানে গভীর নোংরা পাঁকের গাড্ডা। আজ ঠিক করে বেছে নিতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরকে, তাঁরা কোন্ বাড়িতে উঠবেন।" পরবর্তীকালে আমাদের সামনে অভিনীত হলো আর এক প্রহসন, যেখানে দেখতে পেলাম শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি উদাত্ত-আহ্বানকারী উৎপল দত্তই প্রথম বাড়িটিকে পরিত্যাগ করলেন।

অজিত পাণ্ডে গান লিখলেন :

"কৃষ্ণ কি আর কংস কারায়
বেঁধে রাখা যায়?
মাঠে মাঠে লক্ষ কৃষ্ণ
অগ্নি বাঁশের বাঁশি বাজায়।"

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষায় একটি গান সে সময় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কথাগুলো ছিল :

"ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা
ওমা তোর বুগোৎ রক্ত ঝরে
সেই অক্ত আজা নিশান লয়্যা
বাংলার চাষী জয়ের ধ্বনি করে।"

গানটি লিখেছিলেন দিলীপ বাগচী। কৃষক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেক গায়ক ও গীতিকারই এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামসুন্দর বসু, প্রতুল মুখার্জি, বিপুল চক্রবর্তী, নীতীশ রায়, কমলেশ সরকার, মেঘনাদ, অলোক সান্যাল, সুরেশ বিশ্বাস। অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কিছু গোষ্ঠী। যাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য 'অপেরা গ্রুপ'—অজিত পাণ্ডে ছিলেন এই গ্রুপে; 'গণ বিষাণ'—যাতে ছিলেন জলি বাগচী, পাখি রায়; 'নিশান্তিকা'—যাতে ছিলেন রমেন সাহা, পার্থ সেন, মানব সেন; 'অয়নিগোষ্ঠি'—যাতে ছিলেন অমিতেশ সরকার। নকশালবাড়ির সংগ্রামের আগে পর্যন্ত গোটা গণনাট্যের যুগে যত গান রচিত হয়েছিল, নকশালবাড়ির সংগ্রাম পরবর্তী দু-বছরের মধ্যেই তারচেয়েও বেশি গণসঙ্গীত রচিত হয়েছিল।

বহু নাটক এই সময় আমরা পেলাম যেগুলো ছিল নকশালবাড়ির সংগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত। মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখলেন 'পদাতিক'। 'রণক্ষেত্রে আছি' মনোরঞ্জনের আর একটি নাটক যা অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। শ্যামলতনু দাশগুপ্ত লিখলেন 'শীতের আগুন', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর', 'তির বিদ্ধ শিকার'। জ্যোছন দস্তিদার লিখলেন 'গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ'। অমিতাভ গুপ্ত ওরফে মানস দত্তগুপ্ত লিখলেন 'হিমালয়ের চেয়ে ভারী'। অমল রায় রচনা করলেন 'ঘটোৎকচ', 'কেননা মানুষ'। নাটক দুটিতে সরাসরি নকশালপন্থী রাজনীতির কথা না থাকলেও বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাই ছিল নাটক দুটির ভিত্তিমূল। গৌরব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'শৌভিক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় বাংলা একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে নাটক দুটি এক ইতিহাসই রচনা করে ফেলেছে। অমল রায়ের 'হট্টমেলায় হট্টগোল' ছোটদের নাটক হিসাবে অভিনীত হলেও রূপকের মোড়কে বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক। অমল রায়ের হাত থেকেই বেরিয়ে এলো 'বিপ্লবের গান', 'বাস্তিল ভাঙছে', 'বিদ্রোহের থিয়েটার', 'শববাহকেরা', 'দ্রোণাচার্য' ইত্যাদি। সত্যেন ভদ্রের নাটক 'যবনিকা কম্পমান'—এ তুলে ধরা হয়েছিল বিপ্লবী যুবকদের কারাগার ভাঙার কাহিনি। নীহার গুণ তাঁর 'মারীচ'

নাটকে তীব্র আক্রমণ চালালেন সংশোধনবাদের ওপর। মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু'তে আমরা ধ্বনিত হতে দেখলাম 'শ্রেণীশত্রু খতম'-এর লাইন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'গিনিপিগ' ও 'রাজরক্ত' নাটকে রূপকের মধ্যে দিয়ে শাসকদের স্বৈরাচারী বর্বরতার রূপকে তুলে ধরলেন।

পার্টির সদস্য নন কিন্তু নকশালবাড়ির সংগ্রামে শ্রদ্ধাবান সমর্থক শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল এই সময় অতিমাত্রায়। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলে সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য সংগ্রামী মানুষের বাহিনী নামাবারও আগে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বাহিনীকে নামান। এ কথা সমস্ত শ্রেণির পক্ষেই অতি বাস্তব সত্য। কিন্তু এমন বাস্তব সত্যকেই অনুধাবন করতে অক্ষম হলেন নেতৃত্ব। সাংস্কৃতিক বাহিনীর সাহায্যে সাধারণের মগজ ধোলাই করে ময়লা সাঙ্গ করার যে কথা ইয়েন্যানে মাও সেতুঙ বলেছিলেন—নেতৃত্ব সে কথাকে তেমন আমলই দিলেন না। বরং নেতৃত্ব এইসব সমচিন্তার মানুষদের নিয়ে ফ্রন্ট গড়ার বদলে পার্টির বাইরের শিল্পী-নাট্যকার-সাহিত্যিকদের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতাই প্রকাশ করেছিলেন। নেতৃত্বের এমন অপরিপক্কতা এবং ভ্রান্তির জন্যই সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাবলীল গতির প্রচেষ্টা অবশ্যই বাধা-প্রাপ্ত হয়েছিল।

অধ্যায় : ছয়

যুক্তিবাদী আন্দোলন, সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন : এসো আমরা আগুনে হাত রেখে প্রেমের গান গাই

সমাজ গড়িয়েই চলল। এল ১৯৮৫-র ১ মার্চ। এই দিনটিতে কিছু সমাজ-সচেতন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়নে সক্ষম, নিপীড়িত মানুষদের মুক্তিকামী, বে-পরোয়া, নিষ্ঠ, কিছু দামাল ছেলে দমদমের একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে (৭২/৮ দেবীনিবাস রোড) ঘরোয়া আলোচনা শেষে গড়ে তুলল একটি সংগঠন—ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি। তাদের ঘোষণা-পত্রে বলা হল—'আমরা সমাজ-সচেতনতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এতাবৎকাল যে সকল সংগ্রাম হয়েছে তার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ— সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব আরোপ না করা। শোষকদের রাজনীতি ও অর্থনীতি যখন শোষিতদের প্রতিরোধের মুখে সংকটে পড়ে, তখন আত্মরক্ষার চূড়ান্ত পন্থা হিসেবে শোষকরা লড়াকু মানুষদের লড়াইকে শেষ করতে সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে দুর্নীতির সংস্কৃতির, ভাষা-ভিত্তিক সংস্কৃতির, জাত-পাতের সংস্কৃতির, ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির, ভোগ-সর্বস্ব সংস্কৃতির, অদৃষ্টবাদী সংস্কৃতির, পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশ্বাসী সংস্কৃতির, আপসকামী সংস্কৃতির, সুবিধাবাদীর সংস্কৃতির, ক্যারিয়ারিস্ট সংস্কৃতির, দ্বিচারিতার সংস্কৃতির, মস্তান-নির্ভর রাজনীতির সংস্কৃতির, কুসংস্কারের সংস্কৃতির, অন্ধবিশ্বাসের সংস্কৃতির, মগজ ধোলাইয়ের সংস্কৃতির। শোষক ও শাসকগোষ্ঠী তাদের আপন স্বার্থে, টিকে থাকার ও শরীরবৃদ্ধির প্রয়োজনে নিপীড়িত মানুষদের মগজ ধোলাই করে তাদের একত্রিত সংগ্রামের সমস্ত চেষ্টাকে বার বার ভেঙে দিয়েছে ধর্ম, জাত-পাত বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে। কুসংস্কারের আফিং খাইয়ে বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চাইছে—প্রতিটি বঞ্চনার কারণ

অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া। একই সঙ্গে নিজেদের মতো করে 'দেশপ্রেম', 'জাতীয়তাবোধ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে ব্যাখ্যা হাজির করে লাগাতার প্রচারে সে-সব ব্যাখ্যাকে জনগণের মাথায় গুঁজে দিচ্ছে। যেন-তেন প্রকারেণ শোষিতদের চেতনাকে কুসংস্কারের মধ্যে, মগজ ধোলাই করে ঢুকিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারলে ওদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা যায়। শোষকদল শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতেই নানা ভাবে মগজ ধোলাই করে গড়ে তুলে চলেছে নতুন নতুন সংস্কৃতি, যা অবশ্যই অপসংস্কৃতি।

আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হবে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব, আর তাই আমাদের সমিতি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে থাকা বিভিন্ন ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ চিন্তাকে দূর করতে। আমরা মনে করি শোষিত মানুষদের হাতিয়ার যুক্তিবাদী চিন্তার প্রবলতম শত্রু তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদী দর্শন, বিশ্বাসবাদ ইত্যাদি। তথাকথিত ধর্মের এই যুক্তি-বিরোধী স্বরূপকে সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারলে কুসংস্কার মুক্তির, চেতনা মুক্তির, শোষক-শোষিত সম্পর্ক অবসানের কল্পনা শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যাবে।

যারা ট্রট্স্কিবাদী-নীতি মেনে মনে করে—রাজনৈতিক বিপ্লব হলেই সব হয়ে যাবে—আমরা মনে করি তাদের এই মনোভাবের পিছনে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাস্তববোধের অভাব।

ডান-বাম নির্বিশেষে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই সংসদীয় নির্বাচনের কথা মাথায় রাখতে হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনই ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ। শোষক-শোষিত সম্পর্ক অবসানের কথা বলা রাজনৈতিক দলগুলোও সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে যে কোনও উপায়ে ভোট সংগ্রহ করাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বসেছে। ফলে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে গিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করার চেয়ে ভোটার তোষণনীতিকেই অভ্রান্ত অস্ত্র হিসেবে মনে করতে শুরু করেছে। তাই তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হানার সময় এলে কৌশল হিসেবে কে কখন কতটুকু মুখ খুলবে—এটাই তাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। দরিদ্র-শৃঙ্খলিত মানুষদের শৃঙ্খলমুক্তির লক্ষ্যেই যে সংসদীয় গণতন্ত্রে ঢোকা,

তা বিস্মৃত হলে উপলক্ষ্যই (সংসদীয় গণতন্ত্রে ঢোকা) লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে।

আমরা গভীরভাবে লক্ষ করেছি—আমাদের দেশে বাস্তবিকই আজ পর্যন্ত জনজীবনে কোনও ব্যাপকতর গুণগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে একইভাবে শোষিতদের চিন্তার ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ রেখে শোষকরা শোষণ চালিয়েই যাচ্ছে। এতাবৎকাল আমাদের দেশে কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের নামে অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে যা যা ঘটেছে তার কোনওটাই বাস্তবিক অর্থে আদৌ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। ভারতবর্ষে সংগঠিত তথাকথিত রেনেসাঁস যুগের আন্দোলন ছিল সমাজের উপরতলার কিছু ইংরেজি শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু সংস্কার প্রয়াস মাত্র। তৎপরবর্তী তথাকথিত সাংস্কৃতি আন্দোলনগুলি ছিল শুধুমাত্র কলাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তাদের আন্দোলনের এমন সীমাবদ্ধতার কারণ দু'টি হতে পারে। এক : নেতৃত্বের 'সংস্কৃতি' বিষয়ে ভুল ও অস্বচ্ছ চিন্তা। দুই : নেতৃত্বের ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক আন্দোলন আদৌ গড়ে উঠতে না দেওয়ার কৌশল।

আমাদের যুদ্ধ শোষণের শক্তিশালীতম হাতিয়ার প্রতিটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে, যে ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'দেশপ্রেম', 'জাতীয়তাবোধ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি বহু বিষয়ে শোষক শ্রেণির মধ্যে ঢুকিয়ে দেখা বিশ্বাস। আমাদের যুদ্ধ ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, শোষকশ্রেণি সৃষ্ট বা পালিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। কুসংস্কারের আবর্জনা সাফ করার প্রসঙ্গ উঠলেই যারা সোচ্চার হয়— "মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত নয়", "ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতের মতো হঠকারী কাজ করলে আঘাতকারী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য"— তাদের বিরুদ্ধে। যারা নিপীড়িত জনগণকে একত্রিত সংগ্রাম থেকে বিরত করতে "জাতের নামে বজ্জাতি"-র রাজনীতি করে, তাদের বিরুদ্ধে। যারা অদৃষ্টবাদ ও পূর্বজন্মের কর্মফলজাতীয় ভ্রান্ত-চিন্তা প্রচারের মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চায়, তাদের পঞ্চনার প্রতিটি কারণ অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি— তাদের বিরুদ্ধে। যারা ধর্মের নামে মানুষের মানবিকতার চূড়ান্ত বিকাশ-গতিকে রুদ্ধ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, প্রতিটি বিজ্ঞান-মনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষই চরমতম ধার্মিক। একটা তলোয়ারের ধর্ম যেমন তীক্ষ্নতা, আগুনের ধর্ম যেমন দহন, তেমনই মানুষের ধর্ম মানুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সেই বিচারে যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন আমরাই ধার্মিক, কারণ আমরা শোষিত মানুষদের মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত করতে চাইছি। মানুষের চিন্তায়, মানুষের চেতনায় ঘটাতে চাইছি বিপ্লব—সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আমরা জানি, যে দিন বাস্তবিকই যুক্তিবাদী আন্দোলন দুর্বার গতি পাবে, সে-দিন দু'টি জিনিস ঘটবে। এক : আন্দোলন শোষকশ্রেণির স্বার্থকে আঘাত হানবেই। এবং শোষকশ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তীব্র প্রত্যাঘাত হানবেই। এই প্রত্যাঘাতের মুখে কেউ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগ্রামকে, অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ পিছু হটবে না। দুই : যুক্তিবাদী চিন্তা বঞ্চিত জনতার চেতনার জগতে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে, তারই পরিণতিতে গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব : যে নেতৃত্বে থাকবে সমাজ পরিবর্তনের, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের, সার্বিক বিপ্লবের অঙ্গীকার।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব যখন শোষিতদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক বিপ্লবে পরিণত হবে, তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংগ্রামী মানুষরাই রাজনৈতিক বিপ্লবেরও সংগ্রামী মানুষ হয়ে উঠবেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনৈতিক আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে তথাকথিত সীমারেখার দেওয়াল আপনিই ভেঙে পড়বে— আন্দোলন দুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

আমরা সুনিশ্চত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, তাদেরকে আমাদের চিন্তার শরিক করতে চাই। আমরা চাই আমাদের চিন্তার, আমাদের দর্শনের বিস্তার। আমাদের চিন্তাকে নিয়ে যেতে চাই সেখানেই, যেখানে রয়েছে মানুষ। আমরা তাই ডান, অতি-ডান, বাম, অতি-বাম বিচার না করে প্রত্যেকের আহ্বানেই হাজির হব— আমাদের নানা অনুষ্ঠানের পশরা নিয়ে—নাটক নিয়ে, মাইম নিয়ে, গণসংগীত নিয়ে, আলোচনাসভা ও সেমিনার নিয়ে, লেখা-পত্তর নিয়ে। আমরা মানুষদের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে, আমাদের চিন্তার খাতে বওয়াতে প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে আমাদের মতাদর্শকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। জনগণকে যত বেশি সম্ভব প্রভাবিত করার স্বার্থে বেশি বেশি করে সমস্ত রকম প্রচার-মাধ্যম এবং গণ-মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকব। এই বিষয়েও অবশ্যই সতর্ক

থাকব, যাতে প্রচার-মাধ্যম ও গণ-মাধ্যমগুলি শোষিত মানুষদের স্বার্থ বিরোধিতায় আমাদের না কাজে লাগাতে পারে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তীব্রতর করতে সাংস্কৃতিক 'ফ্রন্ট' গড়ার বৈপ্লবিক তাৎপর্য মাথায় রেখে আমাদের সমিতির সদস্য নয়, কিন্তু আমাদের কাজ-কর্মে অনুরাগী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ্ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সংঘবদ্ধ করে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তুলব। আমাদের সমিতির শাখা নয়, অথচ আমাদের কাজ-কর্মে শ্রদ্ধাবান বিভিন্ন গণ-সংগঠনগুলিকে একত্রিত করতে গণ-সংগঠনগুলির সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করব। আমরা সচেষ্ট থাকব এইসব সাহিত্যিক, শিল্পী, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী এবং গণ-সংগঠনকর্মীদের চিন্তাকে আমাদের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে।

আমরা চাই আমাদের মতাদর্শের, আমাদের দর্শনের বিস্তার। আমরা শাখা বিস্তার করতে চাই সেখানেই—যেখানে রয়েছে মানুষ। আমরা মনে করি সাংস্কৃতিক ময়দানের লড়াইয়ে জয়লাভ করতে না পারলে, শোষিত মানুষদের মুক্তির লড়াইয়ে জয়লাভ অধরাই থেকে যাবে।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম—'বৈপ্লবিক সংস্কৃতি' গড়ার কাজে। যে কোনও ত্যাগ বা অত্যাচারের মুখোমুখি হব হাসিমুখে। আদর্শের প্রয়োজনে, সমিতির নেতৃত্বের নির্দেশে প্রাণ-বিসর্জন দিতে সব সময়ই প্রস্তুত থাকব।'

সমমনোভাবাপন্নদের এই আন্দোলনে শামিল করার চেষ্টা যখন চলছে, বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ করে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি, তখন ('৮৬-র জানুয়ারিতে) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ওরফে চেম্বার ওরফে পাভলভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল-এ অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া আলোচনায় 'উৎস মানুষ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবলতম সম্পাদক ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সমিতির কাজ-কর্ম চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন। এবং জানালেন ভারতবর্ষে যখন কোভুরের প্রতিষ্ঠিত র‍্যাশনালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব রয়েছে এবং

খোদ্ কলকাতাতেই রয়েছে কোভুর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদী সমিতির শাখা তখন যুক্তিবাদী আন্দোলনের নামে আর একটি সমিতির কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে কোনও চেষ্টার তিনি বিরোধিতাই করবেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন তিনটি। এক: আমরা কোভুরের দলের সঙ্গে আমাদের সমিতিকে মিশিয়ে দিই। দুই: আমরা উৎস মানুষের উইং বা শাখা হিসেবে কাজ করতে পারি। তিন: আমরা পাভলভ ইনস্টিটিউটের উইং হিসেবে কাজ করতে পারি।

এমন একটা প্রস্তাবে সায় দেওয়া আমাদের পক্ষে কখনওই সম্ভব ছিল না। যুক্তিবাদী সমিতিকে যাদের অভিভাবকত্ব মেনে নিতে বলা হয়েছিল তাদের অবস্থাটা একবার বিচার করে দেখা প্রয়োজন। যাদের অঙ্গুলি হেলনেই যুক্তিবাদী সমিতির যাবতীয় ভাবাদর্শ ও কর্মোদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত হবে—সেই তিন সংস্থা বিপ্লবী চিন্তার দ্বারা কতটুকু পরিচালিত হয়, তা নিশ্চয়ই বিচার করার পরেই যুক্তিবাদী সমিতি সিদ্ধান্ত নিতে পারে আমরা সমচিন্তার পথিক কি না।

ডঃ কোভুর প্রতিষ্ঠিত র‍্যাশনালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান অস্তিত্ব একটি মাত্র পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একই পরিবার থেকেই প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার উঠে এসেছেন—কারণ পরিবারের বাইরে সমিতি ব্যাপ্তিই পায়নি। কলকাতায় ওই অ্যাসোসিয়েশনের শাখা বলতে একটি মাত্র মানুষ যাঁর কর্মক্ষমতা বা মানুষকে আন্দোলনে শামিল করার ক্ষমতা একটি বিরাট শূন্য। এ-তো কোভুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের বর্তমান হাল হকিকত; এ-বার একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক ডঃ কোভুর কি দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তার দিকে।

ডঃ কোভুর সাহসিকতার সঙ্গে কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চানও নি— কুসংস্কার সৃষ্টি ও টিকে থাকার পিছনে রয়েছে অসম্পূর্ণ জ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অসাম্য ও সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। শোষক হুজুরের দল ও তাদের তল্পিবাহক রাষ্ট্রশক্তিই যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থেই জনচিত্তে কুসংস্কারকে বদ্ধমূল রাখতে প্রয়াসী—এই সত্য কোনও সময়ই ডঃ কোভুর বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের চেতনাকে সমাজ-সচেতন করার চেষ্টা না করে, অন্ধ-কুসংস্কারের মূল ধরে টান দেওয়ার চেষ্টা না করে দরিদ্র, বঞ্চিত অসহায় মানুষদেরই কুসংস্কারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে নিন্দা করেছেন।

ডঃ কোভুরের এমনতর ক্রিয়াকলাপের তিনটি কারণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এক : ডঃ কোভুরের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই এমনটা ঘটেছে। দুই : ডঃ কোভুর সাধারণ মানুষকে, শোষিত মানুষকে সমাজ সচেতন করতে চাননি। বরং চেয়েছিলেন গুটিকয়েক অবতারকে জোচ্চোর প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে জনগণকে উত্তেজনার আগুন পোহানোর ভাগীদার করে একটা মেকি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে। তিন : শোষক ও শাসকগোষ্ঠী ডঃ কোভুরকে দাবার ঘুঁটির মতো কাজে লাগিয়ে সমাজ সচেতন মানুষদের মগজে ঢোকাতে চাইছিল একটি ভ্রান্ত ধারণা— 'যুক্তিবাদী আন্দোলন ও অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য উদ্‌ঘাটন সমার্থক শব্দ'। যুক্তিবাদী চিন্তাকে প্রতিরোধ করতে এমন একটি ভ্রান্ত চিন্তার প্রসারের প্রয়াস হুজুরশ্রেণির পক্ষে একান্তই অনিবার্য ছিল।

'উৎস মানুষ' পত্রিকার কাজ-কর্ম একটি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার। পুলিশকর্তার নেতৃত্বে বিপ্লব হবে এরকম আহাম্মকের চিন্তা আমাদের মধ্যে ছিল না। পত্রিকা প্রকাশের বাইরে আর কোনও বৃহত্তর লক্ষ্য পত্রিকাগোষ্ঠীর ঘোষণায় নেই। আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য, নিবেদিত-প্রাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম সম্পর্ক নেই, তাঁদের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অন্দোলন গড়ে তোলা বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা বিপ্লবী সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। 'উৎস মানুষ' পত্রিকা গোষ্ঠী যে-ভাবে ডঃ কোভুরকে 'সুপার-হিরো' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, 'ব্যক্তি-পূজা'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে সেটা অন্ধ-স্তাবকতার নামান্তর বই কিছুই নয়— কারণ ডঃ কোভুর কখনওই একটা দর্শনের স্রষ্টা নন যাতে তাঁর প্রতি ব্যক্তি শ্রদ্ধা একটা আদর্শের প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধা হয়ে উঠতে পারে, একটা শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা হয়ে উঠতে পারে। ডঃ কোভুর বা উৎস মানুষ যুক্তিবাদ বলতে না বোঝেন সেটা আদৌ যুক্তিবাদই নয়, বরং প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। তা-ছাড়া যে সংস্থার সামনে মহৎ কোনও আদর্শ নেই, সেই সংস্থার আঙুলে গোনা কয়েকজন লেখক বা সংগঠক মহানগর থেকে পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার আগুন পোহাতে পারবেন, 'প্রগতিশীল'-'সমাজসচেতন'— 'যুক্তিবাদী' ইত্যাদি স্বঘোষিত তক্‌মা এঁটে সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের উচ্চতর শ্রেণির বিবেচনায় নাসিকা কুঞ্চন করতে পারবেন—কিন্তু কোনও

দিনই সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনার জন্য সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে পারবেন না।

'পাভলভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল' বাস্তবে কোনও শিক্ষাকেন্দ্র অথবা হাসপাতালও নয়—একটি ক্ষুদ্র চেম্বার মাত্র, যেখানে বসে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রোগী দেখেন। বিভিন্ন সরকারি সহযোগিতা সাহায্য নেওয়ার জন্যেই ব্যক্তিগত চেম্বারকে একটি কাগুজে নাম-ভারী প্রতিষ্ঠান সাজানো হয়েছে। এই সংস্থারও সমাজের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মতো কোনও আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে সামান্যতম আগ্রহী নয়—একথা চূড়ান্তভাবে সত্য। তিনি একটি পত্রিকা বের করতেন নাম 'মানবমন'। প্রচার সংখ্যা খুবই সামান্য। কমিউনিস্টদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। ডাক্তার গঙ্গোপাধ্যায় যে-ভাবে হুজুরদের অর্থে গদিতে বসা সরকারের ছত্রছায়ায় আন্দোলন গড়তে উৎসাহী, মন্ত্রীদের স্নেহধন্য হতে উৎসাহী, তাতে তাঁকে একজন আপসকামী সুবিধাবাদী, আত্মসমর্পণকারী বুদ্ধিজীবী ও লেখক ছাড়া আর কিছুই মনে হওয়ার মতো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখি না। এখন লেখক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে দাঁড়িয়ে, তাতে 'সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার', 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার'—এ পুরস্কৃত হওয়াই তো স্বাভাবিক, শাসকশ্রেণির কাছে প্রাপ্য। এমন এক ব্যক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানের শাখা হিসেবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব গড়ে তোলার চেষ্টা বিশ-শতকের অন্যতম সেরা মূর্খতা বই আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত সংগঠনগুলোর সীমিত সামাজিক অবদান ও তার কিছু সদস্যদের কর্মোদ্যোগ ও সৎ প্রচেষ্টাকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যেহেতু যুক্তিবাদী সমিতির কাজের ধারা সামগ্রিকভাবে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে একটি বিশাল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে, আর তুলে ধরছে একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন—তাই আমাদের সমিতির পক্ষে এইসব বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, ব্যক্তিনির্ভর সংগঠনগুলোর শাখা বা উইং হিসেবে এবং পুলিশ কর্তানির্ভর, সিপিএম পার্টিনির্ভর হিসেবে কাজ করা ব্যবহারিক ভাবেই অসম্ভব।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের নিয়ে, উৎস-মানুষ, পাভলভ ইনস্টিটিউট-এর মতো প্রতিষ্ঠানদের নিয়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা যায়, কিন্তু ওদের মতো অস্বচ্ছ দৃষ্টির অথবা সুবিধাবাদীদের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না—এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকার জন্যেই আমাদের সমিতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজির করা প্রতিটি

প্রস্তাবকেই আত্মহননকারী প্রস্তাব হিসেবে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৮৫-তেই আমাদের আন্দোলনে বাড়তি গতির সঞ্চার করেছিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটি বেতার অনুষ্ঠান। '৮৫-র ১৮ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত (যে সময়টা বেতার অনুষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত) আকাশবাণী কলকাতার 'ক' কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল 'জ্যোতিষ নিয়ে দু-চার কথা' শিরোনামে। অনুষ্ঠানটি শুনে মতামত জানানোর জন্য পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে চিঠি পাঠান আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের প্রযোজক অমিত চক্রবর্তী। চিঠিতে অবশ্য অনুষ্ঠানটিকে 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আলোচনায় জ্যোতিষী ও ভাগ্য-গণনাকারীদের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন নামী-দামি চার জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার। বিজ্ঞানের তরফে ছিলাম শুধু আমি একা। আলোচনায় চার জ্যোতিষী পদে পদে হোঁচট খেয়ে শেষ পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়েছিলেন (অলৌকিক নয়, লৌকিক-৩য় খণ্ডতে পুরো বেতার অনুষ্ঠানটি প্রকাশিত হয়েছে)। প্রচারিত অনুষ্ঠানটি জনমানসে এত বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল, যে বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা, চিঠি-পত্র, এমন কী সম্পাদকীয় পর্যন্ত। বেতার অনুষ্ঠানটির প্রায় পুরোটাই বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় প্রায় বছর দু'য়েক ধরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্টি সংসদ (সোনারপুর) তাঁদের নাটক 'ভাগ্যে ভূত ভগবান'-এ বেতার অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে এসেছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জ্যোতিষ সম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী তো এই দিয়ে একটা ঢাউস বইই লিখে ফেললেন, নাম— 'জ্যোতিষবিজ্ঞান কথা'। বেতার অনুষ্ঠানে প্রভাবিত জনতার অনেকেই যুক্তিবাদী আন্দোলন ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন, শ্রদ্ধা পোষণ করলেন, সমর্থন জানালেন, সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত হলেন।

১৯৮৬-র জানুয়ারিতে 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'য় 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'—বইটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমিতির কাজে যেন জোয়ার এল। অনেক মানুষ অনেক সংগঠন এগিয়ে এলেন। গড়ে উঠতে লাগল শাখা সংগঠন। অনেক সংগঠন নিজ সংগঠনের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী দেখে আমরা বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে শুরু

করলাম। নেতৃত্বে বহুজনকে তুলে আনতে আমরা শুরুতেই প্রতিমাসে অন্তত একটি করে 'শিক্ষণ-শিবির' পরিচালনা করতে শুরু করলাম। এইসব 'শিক্ষণ-শিবির' বসত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে। তারই সঙ্গে প্রতি সপ্তাহের শনি রবি ও ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন অঞ্চলে আমন্ত্রণে অথবা আমাদেরই উদ্যোগে বসতে লাগল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার-আসর।

১৯৮৬-র মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেজায় নামী যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা জেমস র‍্যান্ডি আমাকে একটি চিঠি দিয়ে আমাদের সমিতিকে C.S.I.C.O.P.-র সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। আমেরিকার যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব যে সংস্থাটির হাতে, তার নাম 'কমিটি ফর সাইন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন অফ ক্লেমস্ অফ দ্য প্যারানরমাল' সংক্ষেপে C.S.I.C.O.P.। এদের যুক্তিবাদী আন্দোলন যে শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা সংস্থার নামটি শুনলেই বুঝতে পারা যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে যুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, যুক্তিবাদী চিন্তা প্রসারের আন্দোলনকে ঠেকাতে মেকি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার অতি-প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল আমেরিকার ধনকুবের গোষ্ঠী। আর সেই অতিপ্রয়োজনীয়তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল C.S.I.C.O.P.নামক সংস্থাটির। এমন একটি সংস্থার নেতৃত্বে আমাদের সমিতি কাজে নামলে কিছু কিছু সুবিধে ও অসুবিধে দুইই আছে। সুবিধে অনেক—প্রচার, বিদেশ-ভ্রমণ, অর্থ, ইত্যাদি। অসুবিধে একটাই—সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে প্রতিহত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে বিবেকে পাষাণ চাপিয়ে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার যে অঙ্গীকার নিয়ে যুক্তিবাদী সমিতির জন্ম, সেই অঙ্গীকারেরই সম্পূর্ণ বিরোধী কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা একান্তই অসম্ভব বিবেচনায় জেমস্ র‍্যান্ডির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমরা।

কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিরাজমান যারা বিদেশি সাহায্য শিকারি এমনি এক বিদেশি সাহায্য শিকারি তামিলনাড়ুর জাদুকর বি. প্রেমানন্দ C.S.I.C.O.P.-র পরিকল্পনা মাফিক ধাঁচে এ-দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ঢেলে সাজাবার অঙ্গীকার করে C.S.I.C.O.P.-র সহযোগিতা পেলেন একটু বেশিই। '৮৮ সালের মধ্যে ভারতের পাঁচটি প্রদেশে 'স্টেট গ্রুপ' গঠন করতে সক্ষম হলেন প্রেমানন্দ। আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া

পেতে, বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা পেতে মুক্তকচ্ছ হয়ে এগিয়ে আসা কিছু সংস্থাকে নিয়ে গড়ে তোলা হলো 'স্টেট গ্রুপ'। এই সংস্থাগুলো হল : অন্ধ্রপ্রদেশ-সেন্টার ফর সেল্যুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি, হায়দ্রাবাদ, গুজরাট-সত্য শোধক সভা, অধ্যক্ষ, এম. বি. টি. আর্টস কলেজ, সুরাট। কর্নাটক (১) ব্যাঙ্গালোর সায়েন্স ফোরাম, ন্যাশনাল কলেজ বিল্ডিংস, ব্যাঙ্গালোর। (২) সাউথ কানাড়া র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, ম্যাঙ্গালোর। (৩) ন্যাশনাল ব্রাদারহুড ট্রাস্ট, মণিপাল। তামিলনাড়ু-তামিল র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, কোয়েম্বাটোর। পশ্চিমবঙ্গ-উৎস মানুষ, সল্টলেক, কলকাতা।

বর্তমানে Indian C.S.I.C.O.P.-র অবস্থানটা কেমন সেটা বিচার করতে গেলে প্রথমে তাদের অভিভাবক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের CSICOP-র অবস্থাটা বিচার করে দেখা একান্তই প্রয়োজনীয়, কারণ আমেরিকা CSICOP-র অঙ্গুলি হেলনেই ভারতীয় CSICOP-র কর্মোদ্যোগ ও ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয়। আজ বুঝে নিতে হবে বাস্তবিকই শোষণ মুক্তির জন্য যে বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন সেই আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা CSICOP আমেরিকান নেতৃত্বের নেই। শোষণ মুক্তির জন্য জনচেতনাকে সমাজসচেতন করতে কোন্ পথ ধরতে হবে তার হদিশ CSICOP-র কাজ-কর্মে অনুপস্থিত। কারণ বিপ্লব বিরোধী CSICOP-কখনওই শোষিত মানুষের চেতনাকে আদৌ অতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নয়, যাতে শোষিতরা বুঝতে পারে তাদের বঞ্চনার কারণ অ-সম সমাজ ব্যবস্থা। প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ঠেকাতেই মেকি যুক্তিবাদীদের সৃষ্টি—এই পরম সত্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলে, ওদেরকেও 'সমমনোভাবাপন্ন তবে একটু কট্টর কম' ধরে নিয়ে আন্দোলনে নামলে সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই মুহূর্তে প্লেটোর একটা কথা বড় বেশি রকম মনে পড়ছে। প্লেটো বলেছিলেন—"মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালানো যায় না।" এই 'মহান মিথ্যে' দিয়েই শোষিত মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের প্রয়াসকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে ধারাবাহিকভাবে।

এককালে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' মহান মিথ্যে হিসেবে রাষ্ট্রচালকদের পক্ষে যতখানি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল এখন আর ততখানি জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রশক্তির কাছে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে অবতারদের হাজির করার প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক কমেছে। রাষ্ট্রশক্তি এখন বিজ্ঞান বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানীদের উপরই বেশি

করে নির্ভর করছে। এসেছে প্যারাসাইকোলজিস্টের দল, যারা বিজ্ঞানের নামাবলি গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানেরই বিরোধিতা করতে চায়। উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান মনস্কতার ছোঁয়া থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখা।

আশির দশকের শেষ প্রান্তে এসে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা করেছিল, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়ে কুলাগিনা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়েছে। নিজের দেশে এবং বিদেশে দূরদর্শনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় কুলাগিনা সম্পর্কে বিজ্ঞান-আকাদেমির সিদ্ধান্তের কথা অতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অলৌকিক বিরোধী বক্তব্যের ক্ষেত্রে বহু মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যুক্তি, রুশ সায়েন্স আকাদেমি কি আর মিথ্যে বলেছে? ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'যুব সমীক্ষা'য় কুলাগিনাকে নিয়ে একটি বহু ছবি-সহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমির পরীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধান্তের কথা লেখা ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রধান সম্পাদক হিসাবে 'যুব সমীক্ষা'কে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি আমাদের সমিতির কর্মপদ্ধতি। জানিয়েছি, আমাদের সমিতির একটি দল কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। এও জানিয়েছি, কুলাগিনার ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপায়েই আমি ঘটাতে সক্ষম। শেষ পংক্তিতে ছিল—আপনাদের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেলে ধরে নিতে বাধ্য হব—আপনারা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং সেই সঙ্গে অন্ধ-বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। দূতাবাস আমাদের চিঠি পেয়েছে। আমাদের সমিতির কাজ-কর্ম সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অবহিত থাকা সত্ত্বেও তারা কুলাগিনাকে অলৌকিকতার ঘেরাটোপের মধ্যে রাখতে যে ভাবে আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে তাতে বুঝেছিলাম সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি আজ মানুষকে অতীন্দ্রিয়তার নেশায়, ধর্মের নেশায় ডুবিয়ে রাখতে, ভ্রান্ত-বিশ্বাস প্রোথিত করতে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছে।

এই ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায় ভূরি ভূরি। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রশক্তিই বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে সাধারণ মানুষকে

দূরে রাখতে বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগাচ্ছেন, প্যারাসাইকোলজি বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত করছেন। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়।

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে বহু ধরনের প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে সেই সব রাষ্ট্রশক্তি, যারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয় পায়, যারা জানে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাড়িত মানুষগুলোকে 'মহান মিথ্যে'র সাহায্যে অবহেলে শাসনে রাখা যাবে, শোষণ করা যাবে। এই পরিকল্পনারই অঙ্গ 'যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগিয়ে জনগণের চিন্তাকে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে চালিত করা।

এখন রাষ্ট্রশক্তিগুলি টিকে থাকার পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। যুক্তির বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তির আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি লড়াইতে নামার চেয়ে যুক্তিনির্ভর কোনও আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী যুক্তিনির্ভর সাজানো আন্দোলনকে গতিশীল করাকে অনেক বেশি কার্যকর মনে করছে।

তারই প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দিতে 'যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া যুক্তভাবে প্রচারে নেমেছিল নিউক্লিয়ার বোমের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষে অসমান বিকাশের ফলে কোনও অঞ্চলে পুরোহিত তন্ত্র প্রবল বিক্রমে বিরাজ করছে, কোথাও পরাবিদ্যা সে জায়গা দখল করতে হাজির করেছে কম্পিউটার জ্যোতিষ, অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্চার নানা প্রকরণ, আবার কোথাও যুক্তিবাদের সম্প্রসারণ ঠেকাতে মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের পথে নামিয়েছে হুজুরের দল। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবের সঙ্গে আসরে নামিয়েছে লটারি, জুয়া, টেলিভিশন স্ক্রিনে রামায়ণ, মহাভারত, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন যুগে 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, কারণ যুক্তিবাদ কখনওই একটা স্তরে স্থির থাকে না, স্থির থাকতে পারে না। প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, পাল্টায় কুসংস্কার।

আমাদের দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করতেই কোনও কোনও বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। কারণ যুক্তিবাদীদের আবির্ভাব রাষ্ট্রশক্তির কাছে এক বিপদ সংকেত। কুসংস্কার ও জাতপাতের বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, ততদিন শ্রেণি সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোতে পারবে না। শোষিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটি গোষ্ঠীর অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন তাদের মধ্যে শ্রেণি চেতনা, শ্রেণি সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না।

শ্রেণি চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মতো বিষয়গুলো দূরে সরে যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই শ্রেণি সংগ্রাম এবং শ্রেণি চেতনাই হিন্দু মুসলমানদের একসঙ্গে লড়াইতে নামিয়ে ছিল। মাও সে তুং-এর 'হোনান' রিপোর্টেও দেখি শ্রেণি চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকরা নিজেরাই বাড়ির ও থানের অধিষ্ঠিত কাঠের দেবমূর্তিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কারপ্রসূত জ্ঞান করে চ্যালা কাঠ করে জ্বালানি বানিয়েছিল।

আমাদের দেশে 'যুক্তিবাদ' এখন আন্দোলন গড়ার স্তরে। প্রতিরোধে স্বার্থান্বেষী মহল অতি সচেতন। 'যুক্তিবাদী আন্দোলন' থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। মেকি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা, রাষ্ট্রশক্তি। বিদেশি সাহায্যে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতায় শুরু হয়ে গেছে তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন।

১৯৮৬-তেই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান এতই জনপ্রিয়তা লাভ করল যে আমাদের সমিতির শাখা, সহযোগী সংস্থা ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাহায্যে আদিবাসী ঘরের নিরন্ন ছেলে-মেয়েরাও এগিয়ে এল। বাংলার মানুষ সবিস্ময়ে দেখল এইসব অবহেলিতরা কী আসাধারণ দক্ষতায়, প্রাণঢালা আন্তরিকতায় নিপীড়িত মানুষের ঘুম ভাঙার গান বেঁধেছে, গাইছে, নাটক করছে, আলোচনাচক্রে

অন্যদের বোঝাচ্ছে, হাতে-কলমে ঘটিয়ে দেখাচ্ছে বাবাজি-মাতাজিদের নানা অলৌকিক ক্ষমতার গোপন কৌশল, ওঝা-গুনিনদের চমৎকারী ক্ষমতার আসল রহস্য। সাধারণ মানুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যে কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা তারা দেবে, গ্রহণ করবে যে কোনও অবতার ও জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ। ওরা বোঝাচ্ছে আপনাদের দুঃখ বঞ্চনার কারণ কোনও কল্পনার দেবতা বা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নয়, পূর্বজন্মের কর্মফলও নয়। আপনাদের বঞ্চনার কারণ এই সমাজেরই কিছু লোভী মানুষ। লোভী মানুষদের ও তাদের দালালদের চিনে নিন আপনাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তারপর বঞ্চনার শিকল ভাঙার পালা। সে তো আপনাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভাঙতে হবে। শোষক আর তাদের দালালরা তো আপনাদের মুখের কথায় কুবেরের ঐশ্বর্য গড়ে তোলার মূলমন্ত্র 'শোষণ' ছেড়ে দেবে না। সংগ্রাম করেই আপনাদের অধিকার কায়েম করতে হবে।

এইসব নিবেদিতপ্রাণ ছেলে-মেয়েদের প্রতিটি ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মূল্য দিতে, রক্ষা করতে আমাদের সমিতি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-এই বিশ্বাসটুকু এইসব দামাল ছেলে-মেয়েদের মস্তিষ্কে গেঁথে দিতে পেরেছিলাম। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের নিয়ে স্টাডি ক্লাসও শুরু করে দিলাম-জ্ঞানকে পরিমার্জিত ও স্বচ্ছ করতে।

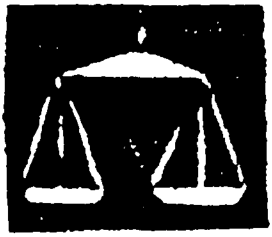

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ : ধর্মে আছ, জিরাফেও আছ

এই সময় পশ্চিমবাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল সিপিআইএম-এর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হল জনমানসে আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে, আমাদের কর্মধারা দেখে। সঙ্গে কিছু চিন্তারও উদয় হয়েছিল। কারণ যে সময়ে একটি ক্ষুদ্র স্কুল, ততোধিক ক্ষুদ্র পাঠাগারের কর্তৃত্ব দখল করতে রাজনৈতিক দলগুলো ছল-বল-কৌশল প্রয়োগ করে থাকে সর্বশক্তি দিয়ে, তখন এমন একটা সংগঠন কাদের পক্ষে কাজ করছে ও করবে এটা জানা অনেক

রাজনৈতিক দলের কাছেই একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। সিপিআইএম নেতৃত্বের বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের সংগঠন কাজ করছে অত্যাচারিত শোষিত মানুষদের পক্ষে, যুক্তিবাদ প্রসারের পক্ষে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পক্ষে। ওঁরা এও বুঝে নিয়েছিলেন—আমাদের সমিতির নেতৃত্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী অথবা সমর্থক, আবার অনেকেরই কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যের প্রাথমিক শর্ত হল—সে হবে যুক্তিবাদী। এমন একটা সমিতি যারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে কাজ করে চলেছে সিপিআইএম-এর নির্দেশ ছাড়া, যারা সিপিআইএম-এর সুরে সুর মিলিয়ে 'জল উঁচু' বললে 'জল উঁচু' বলতে এবং 'জল নিচু' বললে 'জল নিচু' বলতে রাজি নয়, তাদের কাজ-কর্ম বাড়তে দেওয়া পার্টির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পক্ষে ভালো নয় বিবেচনায় আমাদের আন্দোলন ঠেকাতে বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজের পার্টির একটি শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৬-র ২৯ নভেম্বরে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'। '৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রকাশ করল বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট পুস্তিকা, যাতে বিজ্ঞান মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক 'বিজ্ঞান আন্দোলনের ভূমিকা' বলতে গিয়ে বললেন, "*মানুষকে বোঝাতে হবে যে তাঁদের অনুভূত সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান। এই সমস্যাগুলি সাধারণত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। (১) ব্যবহারিক সমস্যা এবং (২) সামাজিক সমস্যা। সাধারণ মানুষকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক সমস্যা ও তার সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত উপায় সম্পর্কে বোঝাতে হবে। পরিবেশ দূষণ, রোগ প্রতিরোধ, জলসেচ, মৃত্তিকার পরীক্ষা, কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া, পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা, জ্বালানি ও শক্তির সমস্যা ইত্যাদি সময়োপযোগী সমস্যা বিষয়ে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালানো বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ। এইজন্য নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা, বিশেষজ্ঞের সহায়তায় মানুষকে বোঝানো, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষ থেকে মানুষকে হাতে-কলমে সাহায্য করা উচিত।*"

একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বিরোধিতা করল অবতার ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোকে। ওদের মতে এই পথ 'হঠকারী' পথ। এতে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান মঞ্চের নেতৃত্বের

চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ-বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন।

আমাদের সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সরকারের প্রশাসনের। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, ফোন, দূরদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়া যদি বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তবে তো আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকেই ভারতবর্ষের বিজ্ঞান আন্দোলনের সর্বকালের সেরা নেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

আমাদের সমিতির চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ-বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ার আন্দোলন, সাধারণ মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলার আন্দোলন।

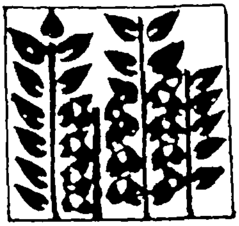

ফিরে আসি পুরোনো কথায়

১৯৮৭-এর ১ মার্চ ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি (Rationalists' Association of India) নামটির সামান্য পরিবর্তন করে ঘোষিত হল নতুন নাম-ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (Science and Rationalists' Association of India)।

এই বৃহৎ নামটির থেকে 'যুক্তিবাদী সমিতি' বা 'Rationalists Association' নামটি অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেল সাধারণ মানুষের কাছে, প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে, যেমন ভাবে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' অনেক বেশি পরিচিত হয়েছে 'কংগ্রেস' নামে, 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)' সমধিক পরিচিত 'সিপিআইএম' নামে অথবা আরও সংক্ষিপ্ত নাম 'সিপিএম'-এ।

ইতিমধ্যে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭-তে আমরা এমন দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী

ঘটনা ঘটিয়েছিলাম যা জনচিত্তে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। ’৮৬-তে আমরা ফিলিপিনের ফেইথ হিলার রোমিও পি. গ্যালার্ড-এর অলৌকিক অস্ত্রোপচার রহস্য উন্মোচিত করি। ইতিপূর্বে ফেইথ হিলারের ওপর বহু তথ্যচিত্র পরিবেশন করেছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশ। বি.বি.সি ও গ্রানাডা টেলিভিশন কোম্পানি ফেইথ হিলারের অলৌকিক রহস্যময়তার ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে লৌকিক ব্যাখ্যা হাজির করতে ব্যর্থ হয়। (CSIOP-এর বিশিষ্ট নেতা এবং অলৌকিক রহস্য ফাঁস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রচার পাওয়া ব্যক্তিত্ব জেমস র‍্যান্ডি-ও ফেইথ হিলারের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। ফেইথ হিলারদের বৈশিষ্ট্য ছিল—রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করতেন কোনও অস্ত্র ছাড়া, স্রেফ নিজের আঙুলগুলোকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রোগীকে অজ্ঞান করা হত না, তবু রোগী কোনও ব্যথা অনুভব করত না। অস্ত্রোপচার শেষে সামান্য মালিশ করতেই মিলিয়ে যেত অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। বহুক্ষেত্রেই রোগী রোগমুক্ত হতেন।

ফেইথ হিলারের অস্ত্রোপচারে রহস্য উন্মোচন এবং কী ভাবেই বা কিছু কিছু রোগী রোগমুক্ত হচ্ছেন তার ব্যাখ্যা হাজির করতেই এ-দেশের গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফিলিপিনস-এর বেতার ও দূরদর্শনেও এই রহস্য উন্মোচন নিয়ে প্রচারিত হয় অনুষ্ঠান (এই নিয়ে স-চিত্র বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ ২ খণ্ড গ্রন্থে)।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও ঘটেছিল আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী মানবী কম্পিউটার শকুন্তলাদেবীকে ঘিরে। শকুন্তলাদেবী ’৮৭-র কলকাতা পুস্তকমেলা চলাকালীন কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক ‘ইভিনিং ব্রিফ’-এর পাতা জুড়ে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ‘অ্যাস্ট্রোলজি ইজ অলসো এ পার্ট অফ ম্যাথামেটিক্স’ অর্থাৎ জ্যোতিষ অঙ্কেরই একটি শাখা। ওই সাক্ষাৎকারেই আর এক জায়গায় বলেছিলেন, ‘অ্যাস্ট্রোলজি ইজ দ্য কিং অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স’ অর্থাৎ কিনা জ্যোতিষশাস্ত্র হল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রাজা। শকুন্তলাদেবী সাক্ষাৎকারে এও জানিয়ে ছিলেন—‘তিনি কোনও অনুষ্ঠানে অঙ্ক কষায় কোনও ভুল করেননি।’

তারপর আমাদের সমিতির খোলা-মেলা চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলাদেবীর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে পলায়ন এবং তা নিয়ে ভারতবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লোমহর্ষক খবরগুলো মানুষের মনে প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যুক্তিবাদী সমিতি পারে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে জয়কে ছিনিয়ে আনতে; পারে যে কোনও তথাকথিত অলৌকিক রহস্যের ব্যাখ্যা

দিতে (শকুন্তলাদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে)।

'চ্যালেঞ্জ' আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের একটা পর্যায় মাত্র—তার বেশি কিছুই নয়। প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ' দোদুল্যমান, সুবিধাভোগীও ঈর্ষাকাতরদের কাছে এই 'চ্যালেঞ্জ' 'অশোভন' মনে হতেই পারে—কেন না চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি রকম স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা থাকবে কেন?

'চ্যালেঞ্জ' অক্ষমদের কাছে 'সস্তা চমক' অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের 'হাতিয়ার'।

'চ্যালেঞ্জ'কে যে সব ধাপ্পাবাজরা 'নেশা' বলে প্রচার করতে চান, তাদের উদ্দেশে জানাই—সাধারণ মানুষকে, শোষিত মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' মুক্ত করতেই আমাদের এই 'চ্যালেঞ্জ'। যতদিন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থাকবে, ততদিন 'নেশা' কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের 'নেশা'ও থাকবে।

এই কথাগুলো লিখলাম কিন্তু ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতে নয়। আমাদের সমিতির সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট দৃঢ় কার্যক্রমের ফলে পালে যে হাওয়া লেগেছে, তা কেড়ে নিতে জনসমক্ষে আমাদের সমিতির কাজকর্মকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে হাজির করতেই CSICOP এবং শাসকদলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা দুই মেকি বিজ্ঞান আন্দোলনের কুশলী নেতারা আমাদের চ্যালেঞ্জকে 'সস্তা চমক', 'অশোভন ব্যাপার', 'প্রচারসর্বস্ব চ্যালেঞ্জের নেশা' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছেন। লড়াই তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে।

অবতার ও জ্যোতিষীরা যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছেন হই-হই করে, তখন ভাববাদী দর্শনের ধারক-বাহক-পালকদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য প্রতিটি কৌশল এবং প্রতিটি পদক্ষেপই অতি-প্রয়োজনীয়।

এমতাবস্থায় আমরা বহুক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জকে ভাববাদী দর্শন বিরোধী, অলৌকিক বিশ্বাস বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী প্রচারের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি। যেহেতু প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকার কাছে 'অলৌকিকতা', 'চ্যালেঞ্জ' ইত্যাদির একটা 'নিউজ ভ্যালু' আছে, অর্থাৎ 'পাঠক-পাঠিকারা খায় ভাল' তাই 'চ্যালেঞ্জ' আমাদের অন্যান্য কাজ-কর্মের চেয়ে অনেক বেশি প্রচারের আলোয় এনেছে।

আরও একটি 'হাঁসজারু' মজার মার্কা বৈপরীত্য ভারতীয় CSICOP -র কাজকর্মে লক্ষ করলেন আন্দোলন সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। অতি বিপ্লবীর মুখোশের আড়ালে CSICOP -র ঠিকা নেওয়া প্রতিবিপ্লবী পত্রিকাগোষ্ঠী সোচ্চারে ঘোষণায় মাতলেন—জেমস র‍্যান্ডি, মার্ক প্লামার, বি. প্রেমানন্দের নেতৃত্বে তাঁরা ভারতবর্ষে বিপ্লব আনবেন। এরই পাশাপাশি আরও দুটি পরস্পরবিরোধী কথা ঘোষণা করলেন— অবতার ও জ্যোতিষীদের প্রতি কোভুরের জানানো চ্যালেঞ্জ 'মহান' এবং প্রবীর ঘোষের জানানো চ্যালেঞ্জ 'অশোভন', 'সস্তা চমক'। এঁদের এমন স্ববিরোধিতা ও যুক্তিহীনতার পিছনে দুটি সম্ভাবনা স্পষ্টতর। এক : তীব্র ঈর্ষাকাতরতা স্বাভাবিক যুক্তিকে গুলিয়ে দিয়েছে। দুই : বিদেশি সাহায্যকারীরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে যে যোগ্য ও অপরিহার্য মানুষদেরই বেছে নিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁরা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়েছে। এমনও হতে পারে, দুটো কারণই একই সঙ্গে কাজ করেছে।

আমরা মনে করি এক-তরফাভাবে যুক্তিবাদী আলোচনায় সাধারণ মানুষের ওপর যতটা প্রভাব ফেলা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা যায় জ্যোতিষী, অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারলে। আমরা তাই বার বার জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি বেতারে, জ্যোতিষ সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে। আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছি আলোচনায়, আমাদের সমিতির আয়োজিত বিতর্কসভায় ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রণ করে এনেছি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর মতো তাবড় ধর্মবেত্তাদের, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সামনে আনতে পেরেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের। এই সব বিতর্কগুলোতে বারবারই আমাদের দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি শত সহস্র দর্শকদের উপস্থিতিতে, সমাজপ্রতিষ্ঠিতদের উপস্থিতিতে। আমরা প্রতিটি অলৌকিক

ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে চাই। এ-পথে তাঁরা কিছুতেই এগোতে চাইবেন না, যাঁদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে, যাঁদের অনেক জায়গায়ই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের খামতিকে আড়াল করতে তাই গোয়েবেলসের কায়দায় প্রচারে নেমে পড়েন অক্ষমরা। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পাগল মেহের আলির মতোই রেকর্ড বাজিয়েই চলেন—'চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ সব ফালতু হ্যায়'।

এই সময়টা ছিল আমাদের গড়ে ওঠার সময়, আন্দোলনকে পরিকল্পিত রূপ দেবার লক্ষ্যে সংগঠনকে বার বার ঠিক-ঠাক্ করে গুছিয়ে নেওয়ার সময়। এই সময় বহু ব্যক্তি ও সংস্থা বিভিন্ন তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা পেতে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন, এবং আমরা আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁদের সাহায্য করেছি। যে ব্যক্তি ও সংস্থা আমাদের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছেন, তাঁরাও যখনই কোনও তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছেন অথবা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন—আমরা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছি। আমরা এইসময় বহু সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি অলৌকিক বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী ছোট ছোট নাটক তৈরি করতে। এর মধ্যে বেশ কিছু নাটক তৈরি হয়েছিল এমনভাবে যাতে প্রয়োজনে যেই অলৌকিক রহস্য উন্মোচন নিয়ে কাহিনি, সেই অলৌকিক রহস্যই পালটে দেওয়া যায়। পাল্টে দেওয়াও হত—যে অঞ্চলে নাটক করতে যাওয়া, সেই অঞ্চলের ওঝা-গুনিন, জানগুরু বা ভগবানের সাক্ষাৎ এজেন্টদের যে-সব চমৎকারিত্বের খবর পাওয়া যেত, সেইসব চমৎকারিত্বের রহস্য ফাঁস করার স্বার্থে। এমনই নাটক 'আগুনবাবা', 'চমৎকারবাবা', 'বাবা ঢপেশ্বরানন্দ', 'ডাইন', 'জান-ডান', 'জ্যোতিষী ঢপানন্দ', 'ঠগ', 'চিচিংফাঁক', 'টেলিপ্যাথি', আরও কত কী।

আমাদের সমিতি বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে হাজির হতে লাগল একটু নতুন ভাবে—এইসব গ্রামের মধ্যে আদিবাসীপল্লিও পড়ে। আমরা যখনই যাই তার বেশ কিছু দিন আগে থেকেই স্থানীয় অনেকটা অঞ্চল জুড়ে যত ভরাবিষ্ট, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার, ভবিষ্যৎবক্তা, জানগুরু, সখা, সৎসখা, দিখলি, ওঝা আছে তাদের বিষয়ে খবর নিই—তারা কী কী ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার (?) অধিকারী, অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। ফলে আশ-পাশের গাঁয়ের মানুষ নানা অলৌকিক ঘটনা দেখার উৎসাহে হাজির হন। স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতাবানদের এতদিন ধরে ঘটানো ঘটনাগুলোই আমাদের সমিতির সভ্য-সভ্যারা অনুষ্ঠানে ঘটিয়ে

দেখান। ঘটনাগুলো দেখাবার পর বোঝান—এগুলো ঘটাতে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা লাগে না, লাগে কৌশল। আমরা বলি—আপনারাও যে কেউ চেষ্টা করলেই এমনটা ঘটাতে পারবেন, তারপর দর্শকদের দিয়েও ঘটনাগুলো ঘটানো হতে থাকে। উৎসাহী পল্লিবাসীরা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে থাকেন। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যয় বহু মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—এতদিনকার দেখা তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা তাঁরাও ঘটাতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারেন ওইসব চমৎকারবাবাদের চমৎকারিত্ব।

আরও একটা কাজও আমরা করি। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা প্রকাশ্যে এবং ব্যাপক প্রচার চালিয়েই স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসেন। চ্যালেঞ্জের জবাবে কেউ হাজির হলে তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হন উপস্থিত দশ-বিশটা গাঁয়ের মানুষদের সামনেই। আর হাজির না হলে গ্রামবাসীদের ওপর অনুপস্থিত অলৌকিক ক্ষমতাধরদের প্রভাব প্রচণ্ড রকম ভাবে কমে যায়। ওঝা, জানগুরু, সখা জাতীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের বুজরুকি বন্ধ হলে ডাইনি চিহ্নিত করার কাজও বন্ধ হয়, কারণ এরাই ডাইনি চিহ্নিত করে।

এরই পাশাপাশি আমরা বোঝাতে থাকি ওদের ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ নিয়ে কী ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আমরা দেখলাম—আমরা যুক্তিবাদীরা বাড়ছি। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে বেড়েই চলেছি। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে সন্ধান পেলাম এক অমোঘ সত্যের—

অনুকূল পরিবেশের সাহায্য পেলে ইতিহাসের অনিবার্য গতি বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির অভিমুখে। অর্থাৎ মানুষের সামনে প্রকৃত সত্যকে জানানোর সুযোগ করে দিলে, সুযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে সাধারণভাবে মানুষ তা গ্রহণ করে। অতএব আমরা যদি আরও বেশি করে বিভিন্ন ভাবে সুযুক্তি সৃষ্টিতে এগিয়ে আসি, তার ফলশ্রুতিতে এক নতুন চিন্তাধারার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবেই।

মানুষকে নিয়েই সমাজ। একটি মানুষের চিন্তা, মনন, দর্শন, ভাবাদর্শ ইত্যাদি মানুষকে প্রভাবিত করে। ওই চিন্তাশীল মানুষটির মনন, দর্শন কথার মাধ্যমে অথবা গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকা মারফত, অথবা অন্য কোনও প্রচার মাধ্যম, গণমাধ্যম, গণসংগঠন ইত্যাদির দ্বারা প্রচারিত হলে বহু মানুষই প্রভাবিত, সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত হন। উজ্জীবিত মানুষদের ভাবাদর্শের সক্রিয়তা আনে সমাজের প্রগতি।

'অর্থনীতিই সমাজের একমাত্র নিয়ামক শক্তি'—এমন কথা কিছু কিছু মার্কসবাদী প্রচার করে থাকেন। এইসব তথাকথিত মার্কসবাদীদের জ্ঞানের অভাব, বোধশক্তির অভাব এবং না জেনে জ্ঞানী সাজার বিকট প্রবণতাই আজ মার্কসীয় চিন্তাধারা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অর্থনীতিতে এমন প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের প্রবণতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে স্বয়ং এঙ্গেলস আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, "তরুণরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি যে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছে, তার জন্য আংশিকভাবে মার্কস ও আমিই দায়ী। আমাদের শত্রুরা, যারা এই মূলনীতিকে অস্বীকার করেছিল, তাদের দিকে লক্ষ রেখে আমরা এই নীতির ওপর একটু বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাছাড়া আমাদের এমন সময় সুযোগ ও স্থান সব সময় ছিল না যে এই পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদানগুলিকে তাদের যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।" (এঙ্গেলস : সিলেকটেড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৩)।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করার স্বার্থেই আমাদের আজ বাস্তব সত্যকে অনুধাবন করতেই হবে। সত্যটা এই : শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, ধর্ম, দর্শন, সংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, জাত-পাত ও ভাষাভিত্তিক বিভেদ, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশধারা অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিকাশধারা ও অর্থনীতির বিকাশধারার উপরই যদিও ভিত্তিশীল, কিন্তু এরা সকলেই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে, প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। এটা কখনই ঠিক নয় যে—অর্থনৈতিক অবস্থাই সমাজের সাংস্কৃতিক ধারাগুলির একমাত্র নিয়ন্ত্রক, একমাত্র ভিত্তি এবং একাই সক্রিয়, আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি অর্থাৎ উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদানগুলো নিষ্ক্রিয়।

দর্শন, চিন্তা একদিকে যেমন সমাজের অগ্রগতি সাধন করে, আবার অনুরূপভাবে সমাজকে পশ্চাদগামীও করতে পারে। দর্শন বা চিন্তা কী ভূমিকা

নেবে তা নির্ভর করে ওই দর্শন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে কতটা সুরক্ষিত করে, কতটা প্রগতিশীল অথবা কতটা প্রতিক্রিয়াশীল করে, তার ওপরে।

আবার এও সত্যি—একটা দর্শন, একটা ভাবাদর্শ যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, একমাত্র প্রগতিশীলতার গুণদ্বারাই পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে সক্ষম হবে না। ভাবাদর্শ শুধুমাত্র তখনই সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পুরাতনের মলিনতাকে ভাসিয়ে নিয়ে সুন্দর কিছু সৃষ্টিতে সক্ষম হবে যখন সেই ভাবাদর্শ জনগণের মনকে আকর্ষণ করতে পারবে। অর্থাৎ প্রগতিশীল ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণই একটা সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে, একটা সুন্দর প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়তে পারে।

ভ্রান্ত-চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ, মুখোশধারী মানুষ যখন ব্যাপক প্রচারে প্রগতিশীল বলে প্রচারিত হন, তখন তাঁদের চিন্তা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে সমাজকে পশ্চাদগামীই করে। তাই সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থেই ভ্রান্ত-চিন্তা প্রভাবিত অথবা মুখোশআঁটা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের চিহ্নিত করা একান্তই প্রয়োজন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার স্বার্থে, যুক্তিবাদী দর্শন প্রচারের স্বার্থে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বার্থে, শোষিত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির স্বার্থে মেকী প্রগতিশীলদের চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার স্বার্থে মেকী প্রগতিশীলদের চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। কারণ চেনা শত্রুর চেয়ে এই মুখোশধারীদের শত্রুতা বহুগুণ বেশি ক্ষতিকারক। আমরা সরব হলাম ডাইনি প্রথা বিরোধী জনপ্রিয়তম সমাজ সচেতনতার দাবিদার বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, অসিতবরণ চৌধুরী, গুরুচরণ মুর্মু প্রমুখের বিরুদ্ধে যাঁরা বিশ্বাস করেন ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে; ডাইনিবিদ্যার অপকারিতা বিষয়ে ডাইনিদের সচেতন করা প্রয়োজন; জানগুরুদের অলৌকিক কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

বুঝুন সরকারি ছত্রছায়ায় ও বদান্যতায় প্রতিপালিত আদিবাসী অন্তপ্রাণ, ডাইনি বিরোধী প্রথার নেতাদের চিন্তা-চেতনা যদি এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়, তবে আদিবাসীরা তাদের রোগের ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাইনিদের অহিতকর অলৌকিক ক্ষমতাকে দায়ী করবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

'৮৭-তে ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে মাসাধিককালব্যাপী সারা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠার আয়োজন করেছিলেন। দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে

জনপ্রিয় করতে, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল সেগুলো হল : স্বনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য ও ঔষধ, পরিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তি।

না, মানুষের কুসংস্কার বিষয়ের কোনও স্থান ছিল না জাঠার বিষয়গুলোর মধ্যে। বিপুল অর্থব্যয়ের এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদের কাছে এগিয়ে আসা শোষিত অন্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক করার চেষ্টা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু জায়গায় অবতারদের কিছু কিছু কৌশল সাধারণ মানুষদের কাছে ফাঁস করার অনুষ্ঠান হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো হয়েছিল নেহাতই হালকা চালে, সাধারণ মানুষকে ম্যাজিক দেখাবার মতো করে, অবসর বিনোদনের অনুষ্ঠানের মতো করে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। ২ অক্টোবর মালদায় জাঠা উদ্বোধন করলেন এমন এক বিজ্ঞানী যাঁর নাম আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠের আসর, অবতারের জন্মদিন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে। ৭ অক্টোবর কলকাতার টালাপার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠার এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'শক্তি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই বললেন, 'যবে থেকে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি....।' বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই সভার গুঞ্জনে সচেতন হয়ে উঠলেন। বক্তব্য পাল্টে বললেন..., 'অবশ্য আমরা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন করে মানুষ এল...।' জাঠার উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি দাপটে বিজ্ঞান সভার পরিচালনা করলেন, দু'হাতের আঙুলে গোটা চার-পাঁচেক গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করে।

আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে একটি মুখপত্র প্রকাশ জরুরি বলে যখন প্রস্তাব এল, তখন আমরা সমস্যাটাকে একটু অন্য ভাবে চিন্তা করলাম। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এ-কথাই মনে হয়েছিল, আমরা প্রথম থেকেই আমাদের মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' প্রকাশ করতে থাকলে আমাদের সহযোগী সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা সংগঠন নিজের উদ্যোগে কোনও মুখপত্র প্রকাশ করার বিষয়ে উৎসাহ হারাবে এবং আমাদের পত্রিকার ও আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপরই বেশি রকম নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমরা 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিবর্তে আমরা উৎসাহিত করলাম বিভিন্ন সংগঠন, সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে

যাতে তাঁরা নিজেরাই যুক্তিবাদী চিন্তাধারা প্রসারে পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশে এগিয়ে আসেন। আমরা বিভিন্ন সংগঠনগুলোর সঙ্গে সরাসরি অথবা চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করে আমাদের বক্তব্য আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরলাম। বললাম, আমরা সকলেই একই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় যখন নিবেদিত প্রাণ, তখন আসুন, আমরা সকলেই একই সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার কাজে সম্মিলিত হই।

যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ব্যাপ্তি চাইলে ভাববাদী চিন্তার সমাপ্তি চাইতেই হবে। আজ বোঝার সময় এসেছে, শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার যুক্তিবাদী চিন্তার প্রবলতম শত্রু তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, বিশ্বাসবাদ ইত্যাদি অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে ভাববাদী দর্শন।

তথাকথিত ধর্মের যুক্তি-বিরোধী স্বরূপকে যুক্তিযুক্তভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারলে কুসংস্কার মুক্তির, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের কল্পনা শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যাবে। কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই অনেক কিছু করতে পারি।

আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে নিশ্চয়ই কুসংস্কারবিরোধী বুলেটিন, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করতেই পারি, তা সে যত কৃশ কলেবরের বা হাতে লেখাই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা চেষ্টা করলে কিছু লিখতে পারি, আসুন না তাঁরা সাধারণের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধরি সংস্কার মুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই জাতীয় লেখার বিষয়ের তো শেষ নেই। শেষ কথা তো কোনও দিনই বলা হবে না বা লেখা হবে না। যুক্তিবাদ এগোবে, প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি ভাববাদী দর্শনও যুক্তিবাদকে রোখার স্বার্থে পাল্টাবে; এগোবে নতুন নতুন রূপে।

শত-সহস্র বছর ধরে আমরা ভাববাদী সাহিত্য, নাটক, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বেড়ে উঠছি। সেই পরিমণ্ডলের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চাই যুক্তিবাদী মুক্ত-চিন্তার এক পরিমণ্ডল। এর জন্য সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তার বিরোধিতা, যুক্তিবাদী চিন্তার

প্রসার। এর জন্য চাই বেশি বেশি করে ভাববাদ বিরোধী বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, রচিত হোক সংগীত, নাটক শিল্প।

বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাধ্যমতো বিজ্ঞানমনস্ক বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পক্ষে বর্তমানের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎ-সামান্য। তবুও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড রকমের আশাব্যঞ্জক। আশা রাখি, নতুন চেতনার পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে আরও বেশি বেশি করে মানুষ ও সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের সাধ্যমতো নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন।

আমাদের সমিতি মনে করে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন এবং আন্দোলনকর্মীদের বিশ্লেষণ-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সঠিক নির্দেশ পাঠাচ্ছেন বলে অন্যান্য সহযোগী সংগঠন ও আন্দোলনকর্মীরা যদি নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা বা ব্যক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ শোষক ও শাসকদের স্বার্থরক্ষাকারী ভাববাদী দর্শনের ওপর সাংস্কৃতিককর্মীদের আক্রমণ যখন তীব্রতর হবে তখন শোষক শ্রেণি-স্বার্থ বা রাষ্ট্রশক্তি কঠিন প্রত্যাঘাত হানবে। এরা আন্দোলনের মূল উৎপাটন করতে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরই চিহ্নিত করে তাদের উপরও সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে। এই জাতীয় আক্রমণে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে না যায় তারই জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থার যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এমনকী হতে পারলে, শোষক শ্রেণি ও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ করে দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমরা চাইলাম, আন্তরিকভাবেই চাইলাম প্রতিটি আন্দোলনকর্মী এক একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেদের নিজেদের গড়ে তুলুন।

নেতা তিনি, যিনি নিজে যে কোনও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং আন্দোলনকর্মীদের বিশ্লেষণ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশ দিতে সক্ষম। এরই পাশাপাশি নেতাকে হতে হবে সৎ, আবেগহীন, আত্মবিশ্বাসী,

বিনয়ী, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে মিশতে সক্ষম, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন ও কৌশলগত বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে ভালো নেতার গুণগুলো জাগরিত হোক, নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বেশি বেশি করে মানুষ উঠে আসুক—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বার্থেই আমরা এমন প্রয়োজনীয়তার কথা ভীষণভাবে অনুভব করেছিলাম। তাই 'স্টাডি ক্লাস'-এর ওপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলাম। একই সঙ্গে আমরা আমাদের সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যদের সভায় খোলা-মেলা আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের চ্যুতি ভ্রান্তি বা বিপথগামিতার ক্ষেত্রে সদস্যদের মুখ খুলতে অনুপ্রাণিত করলাম। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের দেখে অন্যান্য গণসংগঠনের কর্মীরাও নেতাদের চ্যুতি, ভ্রান্তি বা বিপথগামিতার বিরুদ্ধে মুখ খুলুন। গণসংগঠনসর্বস্ব আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নেতারা লোভ বা ভয়ের কাছে বিক্রি করে দেন আদর্শ, আন্দোলন ও সংস্থাকে। আন্দোলনকর্মীরাই পারেন নেতৃত্বকে সঠিক পথে চলার জন্য বাধ্য করতে, আদর্শচ্যুত নেতাদের বিচ্ছিন্ন করতে।

নিজেদের সংগঠনের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস আমরা গ্রহণ করেছিলাম, যে দৃষ্টান্তের দ্বারা অন্যান্য আন্দোলনকারীদের প্রভাবিত করতে চেয়েছিলাম, সে প্রচেষ্টা বাস্তবিকই সার্থক রূপ পেয়েছিল। এমন শিক্ষণীয় পরিমণ্ডল প্রস্তুতির ফল পেয়েছিলাম হাতে-হাতে। প্রচুর নতুন নতুন ছেলে-মেয়েকে আমরা নেতা হিসেবে পেলাম। এ-বছরই কিছু সংগঠনকে আমরা সহযোগী হিসেবে, সংগ্রামের সাথী হিসেবে পেলাম, যাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হয়ে নেতাদের বাধ্য করেছেন CSICOP -অথবা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিত্যাগ করে আমাদের সমিতির সঙ্গে অর্থাৎ মূল যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নামতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেকি আন্দোলনের নেতাদের বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের সংগঠনকে আমাদের সংগ্রামের সাথী করেছেন আন্দোলনকর্মীরা—এও আমরা দেখলাম। শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলো যখন পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট লাইব্রেরি-ক্লাব-স্কুল-পুজোকমিটিগুলোকে যেন-তেন-প্রকারেণ দখলে আনতে

অতিমাত্রায় সচেষ্ট, তখন আমাদের মতো একটি জনপ্রভাবসৃষ্টিকারী সংগঠনকে দখলে আনতে চাইবেই—এটা আমাদের অজানা ছিল না। আমাদের সমিতির কয়েকজন নেতাকে এজেন্ট হিসেবে কাজেও লাগিয়ে দিল এক বিশাল রাজনৈতিক দল। পদ, চাকরি ও অর্থের লোভে ষড়যন্ত্র করলেন—আমাদের সমিতিকে ওই রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত করতে। ওইসব লোভী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নেতা ও রাজনৈতিক দলের যুক্ত ষড়যন্ত্র সে-দিন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন আমাদের সমিতির সচেতন কর্মীরাই। তাঁরা বিচ্যুত নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যেভাবে সমালোচনা করে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন তা এক ইতিহাস। যে দলের রাজনৈতিক থাবা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, আই.এফ.এ., ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কোনও কিছুই নিস্তার পায় না, সেখানে রাজনীতিকদের নখ-দন্তকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল আন্দোলনকর্মীদের সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনন্য মানসিকতা থেকে।

১৯৮৮-র ১১ ডিসেম্বর আমরা এক ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম, যার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সমগ্র দেশ জুড়ে। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে আহবান জানানো হয়েছিল ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী, 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যশনাল'—এর সাঁই শিষ্য উপাচার্য ও হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো'কে।

ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তীর নানা অলৌকিক ক্ষমতার পক্ষে ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রচার তখন তুঙ্গে। সে সময় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি প্রচার পাওয়া মানুষটি ছিলেন সম্ভবত এই ঈপ্সিতা। মন্ট্রিয়লে শিক্ষা ও ডাইনি হিসেবে দীক্ষা পাওয়ার পর 'ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডারেশন'—এর সর্বোচ্চ পদাধিকারী হয়ে বসেন। মারণ-উচাটন মন্ত্র, রোগ মুক্তি ও মানুষ দেখলেই তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানার মধ্যেই প্রধানত গণ্ডিবদ্ধ ছিল তার অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার। এই সময় ঈপ্সিতার সঙ্গে ভিন্ন পরিচয়ে তবে সাংবাদিক হিসেবেই দেখা করি। তাঁর অলৌকিক দু-টি ক্ষমতার সে পরিচয় বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছে হাজির করতেন, সে দুটি আমার কাছে হাজির করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তাঁর গোপন ক্ষমতার প্রকৃত রহস্য। '৮৮-র ১২ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকায় আধ-পাতা জুড়ে ছবিসহ ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পাঠক-পাঠিকারা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেলেও ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমরা সে আলোড়ন

সৃষ্টি করতে পারিনি। ঈপ্সিতার বিরুদ্ধে প্রচারের ঝড় তুলতেই আমরা পরিকল্পিতভাবে ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতা সাংবাদিকদের সামনে প্রমাণ করতে চ্যালেঞ্জ জানালাম। জানতাম, সাংবাদিকদের সামনে যে কৌশলের সাহায্য নেওয়া ডাইনি সম্রাজ্ঞীর পক্ষে সম্ভব ছিল, তা আমাদের সমিতির সামনে অসম্ভব।

উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সরাসরি আমাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করে চিঠি দিই ও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের ক্ষমতা প্রমাণের জন্য উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই।

উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতূহল জাগানো। তিনি জানিয়েছিলেন, স্রেফ সাঁইবাবার বিভূতি খাইয়ে সাঁইবাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন। বিভূতি খাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার পেটে তৈরি হবে ছয় থেকে এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা। চতুর্থদিন অপারেশন করলেই ওগুলো পেট থেকে হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্র মাহাতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন—তিনি প্রমাণ করে দেবেন হস্তরেখা-বিদ্যা বিজ্ঞান।

আমরা যুক্তিবাদী। কেউ তাঁর দাবির সপক্ষে প্রমাণ হাজির করলে নিশ্চয়ই মেনে নেব। অতএব ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে দাবি প্রমাণে উদ্যোগী হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম নরেন্দ্রনাথ মাহাতোকে।

এমন এক সাংবাদিক সম্মেলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে অনেক পত্রিকাই এই অভাবনীয় সাংবাদিক সম্মেলনের কথা প্রকাশ করছিলেন সম্মেলনের কয়েক দিন আগে বাড়তি গুরুত্ব সহকারে। সাংবাদিক সম্মেলনের দিন 'দ্য টেলিগ্রাফ' প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলম জুড়ে ছবি-সহ বিশাল করে এক সম্ভাব্য দারুণ লড়াইয়ের খবর ছাপল। ১১ তারিখ শেষ পর্যন্ত তিন অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারই হাজির হলেন না। ফলে যা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা হল, সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল। পরিবর্তে সেদিন সাংবাদিকদের সামনে ওই তিন অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার-সহ আরও অনেক বিখ্যাত তথাকথিত অবতারদের ঘটানো নানা বুজরুকি ম্যাজিক হাজির করলাম। আড়াই ঘণ্টার ম্যারাথন সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখলাম ভারতব্যাপী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচণ্ড গুরুত্ব সহকারে এবং বহু ক্ষেত্রেই ছবি সহ খবরটি পরিবেশিত হল। সম্পাদকীয় লিখলেন আনন্দবাজার ও বসুমতী। চিঠি-পত্রে এই নিয়ে বিতর্কও

চলল কয়েক মাস ধরে। জনগণকে উজ্জীবিত ও আন্দোলিত করার ক্ষেত্রে ঘটনাটি যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

সে দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। 'কিশোর যুক্তিবাদী' নামে একটি পত্রিকা সে-দিন প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর মনে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারকল্পে। সম্পাদনা করেছিল আমাদের সমিতির কিশোর সদস্য পিনাকী ঘোষ।

পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস : একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো

১৯৮৯-এর মার্চে দ্বিতীয় 'পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস'-এর অধিবেশন বসল কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপে গড়ে ওঠা এই পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কিছু আর্থিক দায়-দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ সরকারের পরিকল্পিত বিজ্ঞান আন্দোলন যেমনটি হওয়া উচিত 'পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস' ছিল তেমনটি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। যুক্তিবাদী আন্দোলন, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার যে আন্দোলন ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭'র মধ্যে ব্যাপকতা পেতে শুরু করেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যুক্তিবাদী সমিতির নেতৃত্বে বা সহযোগিতায়, সেই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে CSICOP-র বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ হল 'এই পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস'। এই সরকারি আন্দোলনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল-বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াকেই বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য বলে প্রতিষ্ঠা করা। তাই এমন এক বিজ্ঞান কংগ্রেসে আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশদূষণ জল সমস্যা, বাসগৃহ সমস্যা, ইত্যাদি থাকলেও 'বিজ্ঞানমনস্ক

মানুষ গড়া', 'যুক্তিবাদী মানুষ গড়া' ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছাড়পত্র পায়নি। অবশ্য না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। সরকারি পয়সায় সরকার নিজেদের ভিটে-মাটি ছাড়ার ব্যবস্থা করতে শোষিত মানুষদের বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে তুলবে— এমন আহাম্মক চিন্তা আমি বা কোনও যুক্তিবাদী মানুষই করবেন না।

দ্বিতীয় পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেসে আমাদের সমিতি আমন্ত্রণ পেয়েছিল। অধিবেশনে আমাদের সমিতির বক্তব্য ছিল অতি স্পষ্ট এবং সরকারি ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত আন্দোলনকারীদের মতের বিরোধী। আমাদের সমিতির বক্তব্য ছিল—বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ-দূষণ, জল সমস্যা, বাসগৃহ সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েই বলতে হচ্ছে, যে বিজ্ঞান আন্দোলনে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্থান নেই, সেটা আর যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয়। পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস বিজ্ঞান আন্দোলনের বিষয় হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গড়ার আন্দোলনকে পাশে সরিয়ে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা গড়ার আন্দোলন গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে সঞ্জীবিত করার ভণ্ড প্রয়াস ভিন্ন কিছু নয়। আমরা মনে করি বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলনকে বিজ্ঞান আন্দোলন বলে আপনারা যে সমবেত প্রচার চালাচ্ছেন, তা ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক। সরকারি প্রয়াসে এই আন্দোলন মেকী বিজ্ঞান আন্দোলন। বিজ্ঞান আন্দোলন রুখতেই এই সাজানো বিজ্ঞান আন্দোলন সরকার শুরু করেছেন। আজ যে সরকারি ও রাজনৈতিক দলের বিপুল অর্থানুকূল্যে আমাদের দেশের বড় বড় বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংস্থা কাজ-কর্ম করে চলেছে, কাল যদি সরকার গদি ওল্টায়, আপনারা কোথায় পাবেন সরকারি বিজ্ঞাপন, সরকারি অর্থসাহায্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনের অর্থ? বাস্তবিকই যদি আপনারা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মঙ্গলকামী হন, সমাজ-সচেতন হন, তবে আপনারা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণের স্বার্থে জন-আন্দোলন গড়ে তুলুন।

আমাদের বক্তব্যের জের টেনে বক্তব্য রাখলেন কেরলের 'শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ্'-এর প্রতিনিধি। কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ তখন কাগজে-কলমে ভারতের বৃহত্তম বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংগঠন। তাঁদের প্রতিনিধির কাছে

প্রত্যাশা রাখা অন্যায় ছিল না, অগ্রজ হিসেবে অনুজদের দিশা দেখাবেন। এই প্রত্যাশাটা বিশেষত পশ্চিমবাংলার কিছু বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংগঠনের একটু বেশিই ছিল, কারণ কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বের লাগামে ছিল সি.পি.আই.এম দলের হাতে, অতএব একটু বেশি রকমের প্রগতিশীল। তাঁদের প্রতিনিধি জানালেন—আমরা আপনাদের সমিতির কর্মধারা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি। আজ আপনাদের সমিতির বক্তব্যও শুনলাম। আপনারা কুসংস্কার মুক্ত করতে গিয়ে নিশ্চয়ই মানুষের নানা ধর্মীয় বিশ্বাসকেও আঘাত হানছেন? আপনারা কি এর ফলে সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না? সাধারণ মানুষই যদি আপনাদের সঙ্গে না থাকে, তবে কাদের নিয়ে আন্দোলন করবেন? কাদের জন্য আন্দোলন করবেন?

ওঁর বক্তব্যের মাঝখানেই বলেছিলাম, আপনার যুক্তিকে ভুল ও অসার প্রমাণ করে আমরা, যুক্তিবাদীরা কিন্তু প্রতিটি দিনই বেড়েই চলেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, মানুষ সাধারণভাবে যুক্তিকে গ্রহণ করতেই ভালোবাসে। তারা ভালো যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি বলেই খারাপ যুক্তিতেই আঁকড়ে আছে। ভাল যুক্তির সঙ্গে যখনই সাধারণ মানুষেরা পরিচিত হচ্ছে, তখনই তা গ্রহণ করছে। আমাদের কাজ সুযুক্তিগুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। মাত্র কয়েকটা দিন আগে এখনকার এক অতিক্ষমতাধর বলে পরিচিত অবতার গৌতম ভারতী আমাকে আক্রমণের হুমকি দেন। দুর্বার জনরোধ আক্রমণকারীকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেছে যে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে অবতার বাবা বোতল ভেঙে নিজের পেটে ঢুকিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এ-রকম বহু ঘটনার মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পেরেছি সঠিক যুক্তি থাকলে শেষ পর্যন্ত জন-সমর্থন আমাদের দিকে আসবেই। আর, বিচ্ছিন্নতার ভয়ে আপনি যে ভাবে পিছনে উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশ মান্য করে চললে রামমোহন সতীদার প্রধা বন্ধ করতে এগোতেন না, বিদ্যাসাগর এগোতেন না বিধবা বিহার প্রচলন করতে। পচন ধরা একটা সমাজে এই অগ্রগামী চিন্তার মানুষরা তো বিচ্ছিন্নই ছিলেন।

কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি বললেন — আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখানকার মানুষ চিন্তার দিক থেকে আমাদের কেরলের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন, অথবা আপনাদের যুক্তিবাদী সমিতি এখানকার মানুষদের চিন্তাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ওখানে আমরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা ভাবতেই পারি না। আমাদের

পরিষদকে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মের সভ্যদের নিয়েই চলতে হয় এবং হবে। আমাদের পক্ষে কারও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত হানা অচিন্ত্যনীয়। তবে হ্যাঁ, আমরা এটা সদস্যদের বলি — আপনারা পরিষদে ঢোকার আগে যার যার ধর্মীয় পতাকাগুলো বাইরে রেখে আসবেন। আমরা মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ার পক্ষে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী। আমাদের সমিতি তাই জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতিতে সাহায্য করে। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান, পরিবেশ দূষণ রোধ, শিক্ষা ইত্যাদি।

বলেছিলাম — আপনি এবং আপনার পরিষদ বাস্তবিকই কী মনে করেন সরকারি সহযোগিতায় বিজ্ঞান আন্দোলন করে শোষিত মানুষদের সার্বিক দাবি-খাদ্য, পানীয় জল, বস্ত্র ও বাসস্থানের দাবি মেটাতে পারবেন? বাস্তবিকই সরকার জনগণের এই সার্বিক দাবিগুলো মেনে নেবেন বলে আপনারা মনে করেন? কী যুক্তিতে এমন অদ্ভুতুড়ে কথাগুলো আপনাদের কাছে সত্যি বলে মনে হল? আপনি যুক্তি দিয়ে আপনাদের বক্তব্যের বাস্তবতা প্রমাণ করতে পারলে আমরাও নিশ্চয়ই আপনাদের নেতৃত্বে আপনাদের আন্দোলনেরই শরিক হব— কারণ নিপীড়িত মানুষদের অর্থনৈতিক মুক্তিও আমাদের কাছে বিশালভাবেই কাম্য।

না, পরিষদ প্রতিনিধি তার বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণে সামান্যতমও উৎসাহী ছিলেন না। এমন বক্তব্যে অস্বস্তিতে ছিলেন অনেকেই। তবু এরই মধ্যে বড় সংগঠনের বড় প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে অনেক কিছু করলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার বিষয়টা সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে চান।

এপ্রিলে অনুষ্ঠিত যুক্তিবাদী সমিতির কার্যনির্বাহীদের সভায় দ্বিতীয় পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করি। এই বিষয়ে আলোচনা শেষে কার্যনির্বাহীরা একমত হন — যুক্তিবাদী আন্দোলন আমাদের সমিতির নেতৃত্বে সঠিক পথে এগুচ্ছে। আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা জনগণকে নাড়া দিতে শুরু করছে, জনগণের চিন্তা-চেতনাকে এগয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ বুঝে নিতে শুরু করেছেন — তাঁদের বঞ্চনার কারণ স্বর্গের ঈশ্বরের কোপ, পূর্বজন্মের কর্মফল বা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নয়, কারণ এই সমজেরই কিছু মানুষ। এই বুঝে নেওয়া ও না নেওয়ার উপরই নির্ভর করে

জনবিক্ষোভ, জনসংগ্রাম, যা শেষ পর্যন্ত সরকারের গদিতে টান বসায়।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের চেয়ে অনেক কম নিপীড়িত মানুষরাও বহুদেশে শাসকদের গদি উল্টে দিয়েছে। সে-সব দেশের জনগণের চেয়ে বহুগুণ বেশি শোষণ ও বঞ্চনাকেও সংখ্যাগুরু ভারতীয়রা প্রতিবাদহীন ভাবেই সহ্য করে আসছেন ভাগ্য ও কর্মফলের দোহাই দিয়ে।

বঞ্চনার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অবহিত হলে, এবং সেই কারণ যেহেতু লৌকিক, অতএব প্রতিকারও সম্ভব- এই চেতনার উন্মেষ ঘটলে তার পরিণতিতে যে শাসকদের গদি উল্টোবেই, এই সত্যটা ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শাসককুলের অজানা নয়। আর তাই শাসক ও শোষকদের সম্মিলিত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনকে প্রতিহত করতেই বিপুল সরকারি সাহায্যে গড়ে তোলা হয়েছে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন। যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বার্থে, শোষিত জনগণের স্বার্থে এইসব স্বার্থান্বেষী, বহুরূপী শাসক ও শোষকদের দালাল মেকি বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের চিহ্নিত করা একান্তই প্রয়োজনীয়। এদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব নিতে হবে প্রতিটি সৎ বিজ্ঞান আন্দোলনকারীদের, সমাজ সচেতন সংস্থা ও ব্যক্তিদের। কারণ মুখোশধারীরা সব সময়ই মুখোশহীনদের চেয়ে অনেক বেশি বিপদ্‌জনক।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র : জলেতে ডোবানো আছে বারুদভর্তি সিন্দুক

সি.পি.এম. নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে নিজেদের দখলে আনার যখন চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন কিছু বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান পত্রিকাগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার তাগিদে নিজেদের মধ্যে

সমন্বয় গড়ার প্রয়োজনে সোদপুরে এক কনভেনশন ডাকলেন ১৯৮৯-এর ৮ জানুয়ারি। তারই সূত্র ধরে '৮৯-এর ২২ ও ২৩ জুলাই কল্যাণীতে প্রথম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঠিত হল 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র'। উপস্থিত ২৩ টি সংগঠনের ২৩ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হল সাধারণ পরিষদ। ঘোষিত কর্মসূচিতে বলা হল গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র চায়—**এক** : মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রসার। **দুই** : কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। **তিন** : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরদেশ-নির্ভরতা বন্ধের দাবি এবং জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগকে অগ্রাধিকার। **চার** : ভোগবাদী ক্রিয়াকর্মের সহায়ক রূপে বিজ্ঞানের ব্যবহারের বিরোধিতা করা। **পাঁচ** : গণস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা। **ছয়** : পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস। **সাত** : যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন, পরীক্ষা ও প্রয়োগের বিরোধিতা করা। **আট** : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যাপক মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো। **নয়**: বিজ্ঞান--প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জনগণকে নিয়মিত জানাতে হবে — এই দাবি তোলা। **দশ** : পরিবেশের পক্ষে নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। **এগারো** : কৃষি, পশু-পক্ষী পালন, বনসৃজন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তির বিরোধিতা করা। **বারো** : কোনও প্রযুক্তি সামাজিক বা পরিবেশের পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করলে তার বিরোধিতা করা। **তেরো** : উপরোক্ত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গান, নাটক, গল্প, পোস্টার, স্লাইড ইত্যাদি তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। **চোদ্দো** : সাধারণ মানুষকে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে শামিল করতে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ১৯৮৯-এর অক্টোবরে প্রকাশিত 'রিপোর্ট ও সিদ্ধান্তবলি'তে জানান-সম্মেলনে কিছু বিতর্কিত বিষয় হাজির হয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে কেন্দ্র সদস্য সংগঠনগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চালিয়ে ঐক্যবদ্ধ মতামত তৈরির ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাবে। এই বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে ছিল 'ধর্মাচরণ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্ক' এবং 'বিজ্ঞান আন্দোলনে অন্যান্য ধারার সাথে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা।'

সমন্বয় কেন্দ্র বিজ্ঞান আন্দোলনের সেই সময়কার প্রধান দু'টি ধারা থেকে নিজেদের পৃথক সত্তা ও দূরত্ব বজায় রাখতে চাইল। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির চোখে বিজ্ঞান আন্দোলন হল বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ

গড়ার আন্দোলন, চেতনা মুক্তির আন্দোলন, যার মধ্য দিয়ে বঞ্চিত মানুষরা বঞ্চনা মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। এ আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা সাবিক বিপ্লবের পক্ষে ভিত্তিভূমি এবং অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ চাইল 'সবার জন্য বিজ্ঞান' স্লোগানের মধ্য দিয়ে জন-মানসে প্রতিষ্ঠা করা-বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়াই বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র দু-নৌকায় পা দিয়ে চলতে চাইল।

আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কে শেষে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের নেতারা কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তারই সাক্ষ্য বহন করে ২৫.৩.৯০ তারিখে প্রচারিত সার্কুলার নম্বর ৮এ। এই সার্কুলার পাঠানো হল সদস্য সংগঠনগুলো ছাড়া কিছু সংগঠনকে।

সার্কুলারের শুরুতেই বলা হয়েছে কুসংস্কার ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে 'গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' এই বিষয়ে এতদিনকার কাজের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

কী সেই সিদ্ধান্ত? তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কিছুটা এখানে তুলে দিলাম: 'আন্দোলনের ক্ষেত্রে কুসংস্কারকে অন্তত দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা অবশ্যই প্রয়োজন। যথা-জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকারক ও তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকারক নয়। তাৎক্ষণিকভাবে যে-সব কুসংস্কার ক্ষতিকারক নয় সেগুলো মূলত বস্তুনিরপেক্ষ-বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর অনুশীলনমুখিতার চাইতে এগুলির তত্ত্বমুখীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি। কখনোই বলা যায় না যে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে না। অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু যেহেতু এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তার সাফল্য সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে তথা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক মানোন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত সেহেতু এ আন্দোলন এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকারক কুসংস্কারসমূহ প্রধানত মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবশালী। বলতে বাধা নেই এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন পূর্বোক্ত শ্রেণির কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অপেক্ষা জরুরি। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিকাশলাভ না করলে পূর্বোক্ত আন্দোলনও শক্তিশালী হতে পারে না।"

গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্র তাদের নবমূল্যায়নে কী কী সিদ্ধান্তে পৌঁছল একটু দেখা যাক।

১. কুসংস্কার অবশ্যই দুই প্রকার। এক : তাৎক্ষণিক ক্ষতিকারক নয় যেমন

অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাস ইত্যাদি সংক্রান্ত কুসংস্কার। দুই : তাৎক্ষণিক ক্ষতিকারক যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক কুসংস্কার।

২. স্বাস্থ্যবিষয়ক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই বেশি জরুরি।

৩. অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, ভূত বা ঈশ্বর বিশ্বাসজাতীয় কুসংস্কার দূর করা যেহেতু দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, তাই বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্ত করার আন্দোলনের এখন প্রয়োজন নেই।

৪. সমাজের বহু মানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, ঈশ্বরবাদ, অলৌকিক-বিরোধী কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলন ছড়িয়ে না পড়লে আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারবে না, এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন অলৌকিক-বিশ্বাসজাতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই।

৫. আগে অলৌকিকতা বিরোধী, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ-বিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে ভুল পথ নেওয়া হয়েছিল।

এবার দেখা গেল গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র যুক্তিবাদী সমিতির লাইনকে পুরোপুরি বর্জন করে সরাসরি বিজ্ঞান মঞ্চের লাইনকে সমর্থন করল। তারা প্রথম সম্মেলনে গৃহীত দলিলের দু'নম্বর কর্মসূচি কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকারকে লঙ্ঘন করল। অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য— এই সত্য ভুলে থেকে সমাজের অসুস্থতার মধ্যেই দলে ভারী হওয়াকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করল। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের কথা সমন্বয় কেন্দ্রের কর্মসূচিতে ঘোষিত হয়েছিল, সেই ঘোষণার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল বুদ্ধিমান, চতুর নেতারা। মৌলবাদ রুখতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আঘাত দিতেই হবে—এছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। কারণ বুঝতে মৌলবাদ শব্দটির অর্থ বুঝতে হবে। মৌলবাদ বা Fundamentalism শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো - 'ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাস।' অতএব মানুষের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে মৌলবাদী চিন্তাকে রোখার স্লোগান চূড়ান্ত ভণ্ডামি বই কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নয়া-ঔপনিবেশবাদীরা 'অস্ত্রযুদ্ধের' সঙ্গে সঙ্গে 'চিন্তার-যুদ্ধ' কেও আরও বেশি বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে— ইতিহাস তাই বলে। চিন্তার যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে প্রজা শোষণ প্রাচীন আমলেও ছিল। কিন্তু সেসময়ে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে শোষিত মানুষদের এককাট্টা হওয়ার চেষ্টাকে তছনছ করে দেওয়ার মত প্রচেষ্টা শাসক শ্রেণির মধ্যে দেখা যায়নি। যদিও প্রাচীনকালে বস্তুবাদী দর্শন বা নাস্তিক্য দর্শনকে প্রতিহত করতে বহুভাবেই সচেষ্ট ছিলেন ভাববাদী দর্শনের ধারকরা। চার্বাক দর্শন বা লোকায়ত দর্শন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সে সব কথাও টেনে এনেছি এই বইতে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা দেখেছি কী ভাবে ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে প্রজাকুলের অর্থ শোষণ করে রাজার অর্থভাণ্ডার স্ফীত করার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে)। কিন্তু ধর্মকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে সার্থকভাবে আমরা প্রয়োগ করতে দেখলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের। হেনরি এম ইলিয়ট যে চিন্তার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন ১৮৪৯ সালে, তারই সূত্র ধরে ব্রিটিশ শক্তি ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগিয়ে, প্রশাসনকে ব্যবহার করে এ-দেশে ধর্মের ভিত্তিতে শোষিত মানুষদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করেছিল সার্থকভাবে। উত্তরাধিকার সূত্রে কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনীতির ব্যাপারীরা এখনও ধর্মকে বিভেদ-সৃষ্টিকারী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেই চলেছে।

হেনরি এম ইলিয়ট ধর্মকে বিভেদ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে শিখিয়ে ছিলেন, শতবর্ষ পরে ১৯৫০ সালে সেই চিন্তাকেই একটা 'তাত্ত্বিক' রূপ দেন অ্যালেন ওয়েলস্ ডালেস।

ডালেস তত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিল : বস্তুবাদী দর্শন, যুক্তিবাদী দর্শনকে ঠেকাতে না পারলে শোষিত মানুষদের সম্মিলিত সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। আর কোনওভাবে সংগ্রামে শোষিত মানুষের জয় সূচিত হওয়ার অর্থ বর্তমান শোষণ প্রক্রিয়ার পরাজয়। শোষিত মানুষকে শোষণ করা যায় কারণ তাদের চেতনার স্তর শাসক ও পুঁজিবাদী শক্তির ধারক-বাহকদের তুলনায় বহু যোজন পিছিয়ে পড়া ততদিনই নিশ্চিন্তে শোষণ করা সম্ভব, যতদিন বঞ্চিত মানুষরা তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে অদৃষ্ট, ঈশ্বর ইত্যাদিকে চিহ্নিত করবে—দায়ী করবে না পুঁজিবাদকে। শোষিতদের সংগ্রামী করে যে চেতনা, সেই জনচেতনার উত্থানকে প্রতিহত করতে নিশ্চয়ই সেনা-পুলিশ-অস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও কার্যকর অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে।

ডালেস তাঁর পর্যবেক্ষণ বিষয়ে জানালেন : যে সব মানুষের মনের গভীরে ধর্ম-বিশ্বাসের শিকড় প্রোথিত রয়েছে, তারা কখনই যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তারা কখনওই আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্তিবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে গ্রহণ করতে পারে না। আস্তিক্যবাদের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের এই লড়াইকে পুঁজি করেই নাস্তিক্যবাদী চিন্তার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার মধ্য দিয়েই রক্ষা করা সম্ভব বর্তমান উৎপাদন ও শোষণ পদ্ধতিকে বজায় রাখা।

ডালেস শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পথ-নির্দেশ দিয়ে বললেন : আমাদের কর্তব্য হল অঞ্চলভেদে-বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ-বিরোধী ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে খুঁজে বের করা এবং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে বাড়িয়ে তোলা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজবাদের পক্ষ অবলম্বনকারী বস্তুবাদী চিন্তার পথ অনুসারীদের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, শোষণকারী শক্তিগুলো সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেল। তারা কোমর বেঁধে নেমে পড়ল নাস্তিক্যবাদী চিন্তার আক্রমণ থেকে পৃথিবীর বাকি জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টায় এবং নাস্তিক্যবাদীদের দুর্গে আঘাত করার পরিকল্পনায়। এই পথ অন্বেষণের একটা পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছল : আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও অর্থাৎ অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়েও চিন্তার যুদ্ধ অনেক বেশি কার্যকর। ওরা যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী চিন্তার আগ্রাসন থামাতে ও তাদের দুর্গে আঘাত হানতে শুরু করল 'চিন্তার যুদ্ধ (War of Ideas)'। এই যুদ্ধের সেনানীর ভূমিকায় এলেন মনোবিজ্ঞানীরা, সমাজবিজ্ঞানীরা, অর্থনীতিবিদরা। এই 'চিন্তার-যুদ্ধে' একটি আবশ্যিক হাতিয়ার হিসেবে রাখা হল ধর্ম-চিন্তাকে।

ভাববাদী চিন্তা ও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার একছত্র সম্রাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারপর থেকে নিখুঁতভাবে জনমনে ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস জাগরণের কাজ করেই চলেছে প্রধানত মনোবিজ্ঞানীদের নির্দেশিত পথকে অনুসরণ করে। এজন্য তারা বিভিন্ন দেশেই দালাল খুঁজে নিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ-প্রাচুর্যের বন্যা এনে ধর্ম প্রচারে তাদের উজ্জীবিত করেছে, কখনও বা ধর্ম বিষয়ে 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ' প্রকাশের মাধ্যমে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত মহলেও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলে 'ধর্ম-যুদ্ধ' চালিয়েছে, কখনও বা রাজনীতিকদের মধ্যে 'পুজো-কালচার' সৃষ্টি করার কাজে 'চিন্তার-যুদ্ধ'কে নিয়োজিত করেছে।

আবার কখনও ধর্মের পক্ষে মেকি মার্কসবাদীদের শামিল করছে। একই সঙ্গে 'ধর্মে আঘাত নয়' মার্কা মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন সৃষ্টি করে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই চিন্তার-যুদ্ধের পরিকল্পনা যে কী বিপুল সাফল্য লাভ করেছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ শুধুমাত্র পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ধস্ নামাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, চিনের জনগণের মগজ ধোলাই করে বস্তুবাদী চিন্তা সাফ করে ভাববাদী ও ভোগবাদী চিন্তা ঢোকানোর মধ্যেই এর শেষ নয়— আজ সারা পৃথিবীতে মার্কিন একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্যে অন্তর্নিহিত। এই একচেটিয়াপনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে চিন্তার-যুদ্ধ অনেক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা-যুদ্ধের কাছে, সাংস্কৃতিক চেতনার একচেটিয়াপনার কাছে সেইসব দেশকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, যাদের চিন্তা-যুদ্ধকে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে, অস্ত্র-যুদ্ধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝে ওঠার পক্ষে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিপক্কতার অভাব ছিল।

ভারত পৃথিবীর বাইরের কোনও দেশ নয়। সুতরাং এ-দেশের মাটিতে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাও তাদের দর্শনের, তাদের শোষণ প্রক্রিয়ার পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে—বুঝেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তারা এটাও বোঝে একের চিন্তা বহুতে সঞ্চারিত হয়। তাই ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনকে রুখতে তারা একদিকে যেমন দালাল খুঁজে নিয়ে আপন মর্জিতে সাজিয়ে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন শুরু করল যুক্তিবাদীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে, তেমনই মেকি বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাদের দিয়ে বারবার প্রচার রাখতে লাগল— ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির বিরোধিতা একটি হটকারী লাইন, আর এ-সবেরই ফসল গণ-বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের ওই সার্কুলার।

সার্কুলারটিতে এমন তালগোল পাকানো চিন্তার প্রকাশ ঘটায় এবং এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চের লাইনকে সমর্থন জানানোয় সভা সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সময় বিজ্ঞান মঞ্চ ও সমন্বয় কেন্দ্র আরও কাছাকাছি এসে পড়ে 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'কে বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে দুই পক্ষই বিবেচনা করায়। সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া এই 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' বিষয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা করা অতি জরুরি। আসুন আমরা 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' নিয়ে খোলা মনে একটু আলোচনা সেরে নিই।

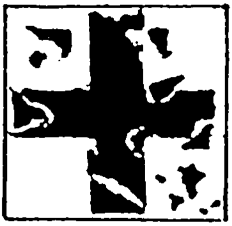

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন : একটি মহান, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মিথ্যা

‘২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য’ নামের শ্লোগান এবং ‘জনস্বাস্থ্য আন্দোলন’ -এ বর্তমানে বিভিন্ন চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়ক সংস্থা, সমাজসেবী এবং বিজ্ঞান ক্লাব শামিল হয়েছেন। শহরে আধা শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে সরকারি অর্থ ব্যয়ে অর্থাৎ আমাদেরই ট্যাক্সের টাকায় ‘সেমিনার’। বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী মানুষ গড়ার চেয়েও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে অবগাহন করার মধ্যে অনেক বেশি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন কোনও কোনও বিজ্ঞান সংস্থার চতুর নেতারা।

‘জনস্বাস্থ্য’ আন্দোলন নীতির গভীর রহস্য বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে ‘জনস্বাস্থ্য’ ও ‘চিকিৎসা’ শব্দ দু’টির অর্থ। কারো কারো ক্ষেত্রে শব্দ দু’টি আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও বাস্তবে তা নয়।

কারও রোগ নিরাময়ের জন্য যে ডাক্তারি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাকেই বলা হয় ‘চিকিৎসা’। যেসব কারণ ও উৎপাদন রোগ উৎপত্তি প্রতিরোধ করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতিতে সাহায্য করে, তাকেই বলে ‘জনস্বাস্থ্য’। ‘চিকিৎসা’ নামক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধপত্র, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ‘জনস্বাস্থ্য’ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান, আবর্জনা নিষ্কাশন, শিক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ, রোগ প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন, টিকা দান ইত্যাদি।

রোগ আক্রান্ত হলে রোগীর চাই চিকিৎসা। পরিবর্তে ‘জনস্বাস্থ্য’ বিষয়ক সাহায্য দিয়ে রোগীকে বাঁচানো যাবে না। নীরোগ ব্যক্তিকে রোগ থেকে দূরে রাখতে চাই ‘জনস্বাস্থ্য’ তখন ‘চিকিৎসা’ অপ্রয়োজনীয়।

১৯৮২ সালে ভারত সরকার তার লিখিত স্বাস্থ্যনীতিতে ঘোষণা করল, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যনীতি। এই নীতিতে বলা হল, চিকিৎসকের সাহায্যে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়, স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্ভব নয়। চিকিৎসার প্রতি মানুষের দৃষ্টি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকর্ষিত হওয়ার ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের মানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির স্বার্থেই চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে। অর্থাৎ 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য', 'সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ পরিবেশ', 'সস্তায় বাসগৃহ নির্মাণ', 'সস্তায় পায়খানা নির্মাণ', 'ধূমহীন চুল্লি', 'স্বনির্ভর প্রকল্প' ইত্যাদি বিষয়গুলিকে।

চিকিৎসায় গুরুত্ব দিলে জনস্বার্থের ক্ষতি হবে এ-জাতীয় সরকারি বক্তব্যের সমর্থনে অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংস্থা এগিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে যাঁরা বাম প্রগতিবাদী হিসেবে পরিচিত, তাঁদের মতে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিরোধের জন্যেই 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আন্দোলনে শামিল হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। এই আন্দোলন দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রকে প্রশস্ত ও উন্নত করার মধ্য দিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ রুখবে। জনগণের স্বাস্থ্যের স্বার্থেই চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে জনগণেরই হাতে। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিবেশ সমস্যার সমাধান ঘটবে। এ আন্দোলন জনগণের জন্য জনগণ দ্বারা আন্দোলন।

তথাকথিত প্রগতিবাদীদের বিপ্লবাত্মক বুকনির মোড়ক ছাড়িয়ে আসুন দেখা যাক আসল সত্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ রুখতে '২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য' শিরোনামে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে বলে যাঁরা সোচ্চারে দাবি করছেন, তাঁদেরকে আদ্যন্ত নির্ভেজাল মিথ্যাচারী বই আর কোনও উপযুক্ত শিরোপায় ভূষিত করার উপায় দেখি না। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বারাই ঘোষিত হয়েছিল '২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য নীতি' ভারতে প্রয়োগের কথা। রাষ্ট্রসংঘ চিকিৎসাক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ রুখতে এই জন স্বাস্থ্য নীতি ১৯৭৮ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের চাপে এই নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবং '৮২ সালে ভারত সরকার লিখিতভাবে ঘোষণা করে এই নীতি ঘোষণা করেছিল— এমনটা ভাবার মতো কোনও কারণ দেখি না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলতে যেসব দেশকে বোঝানো হয়, সেসব

দেশের প্রভাবই রাষ্ট্রসংঘে প্রবল। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত নীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধী না হওয়ার স্বার্থরক্ষাকারী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নয় কি? অন্তত আর যাই হোক,

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত '২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য' নীতি যেখানে সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত দেশগুলোর সক্রিয় সমর্থন পেয়েছে, সেখানে ওই নীতিকে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি' বলে প্রচারে সোচ্চার হওয়াটা সত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু নয়।

রাষ্ট্রসংঘ কেন 'জনস্বাস্থ্য' নীতি ঘোষণা করল এবং ভারত সরকারের কাছে কেন তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করল, এ বিষয়ে সম্ভাবনার দিকটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হল জনজীবনের মানোন্নয়ন, জনগণের জন্য খাদ্য, পানীয়-বাসস্থান ও পুষ্টির ব্যবস্থা এবং এসবের মধ্য দিয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি। ভারতীয় সংবিধানের ৪৭ নম্বর ধারা এর ২৪৬ নম্বর সম্পর্কিত ৭ নম্বর তপশিলের রাজ্যতালিকায় ৬ নম্বর সূত্রে আছে জনজীবনের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবে রাজ্য সরকারগুলি। সরকারের এই নীতি অনুসারে রাজ্য সরকারগুলো নিজ উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য কিছু হাসপাতাল স্থাপন করেছে। জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় এই সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই কম। জনগণ যখন বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণের সরকারি ব্যবস্থাকে আপন অধিকার হিসেবে ভাবতে শুরু করল, তখন দুর্নীতি ও ভুল অর্থনীতির জালে জড়িয়ে পড়া দেউলিয়া সরকার প্রমাদ গুনল। জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার দাবি করলে এই আর্থিক কাঠামোয় সে অধিকার দেওয়া যাবে না। কারণ, একদিকে অর্থ সংকট, আর এক দিকে শোষণ প্রক্রিয়াও কিছুটা ব্যাহত হয়। আবার জনগণ যেভাবে উত্তরোত্তর বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার দাবি করছে, সেই দাবিকে

পুরোপুরি অমর্যাদা করলে ভোট-নির্ভর রাজনীতিতে গদি বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই সংকট শুধু ভারতে নয়, ভারতের মতো অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই। এইসব দেশের শোষিত জনগণ যাতে চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার আদায়ের দাবিতে অতিমাত্রায় সোচ্চার না হয়ে ওঠে এবং সেই অধিকার আদায়ের লড়াই অন্যান্য অধিকার আদায়ের লড়াইতে নামতে যাতে উদ্বুদ্ধ না করে, সে দিকেই লক্ষ রেখে বিশ্বের শোষকদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী দেশগুলো (যারা সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত) নিপীড়িত জনগণের চেতনাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। আর চাওয়ার প্রয়োজনেই,

শোষিত জনগণের মগজ ধোলাইয়ের উদ্দেশে রচিত হল
চিকিৎসা নীতির বদলে সবার জন্য স্বাস্থ্য নীতি।
ঘোষিত হল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন
কর্মসূচি—"২০০০ সালে
সবার জন্য স্বাস্থ্য।"

ঘোষিত জনস্বাস্থ্য নীতি নিশ্চয়ই সুন্দর। ভারত সরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্য নীতি গ্রহণ করছেন এবং কার্যকর করতে চাইছেন — এ খুবই ভালো কথা। কিন্তু আশংকা থেকেই যায়, জনগণের দৃষ্টি চিকিৎসা গ্রহণের অধিকারের দিক থেকে ঘোরাতেই, চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড় থেকে কমাতেই স্লোগান-সর্বস্ব এই জনস্বাস্থ্য নীতি হাজির করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অবশ্যই স্বাগত জানাবার মতো—কারণ, শোষিত জনসাধারণের সার্বিক দাবি খাদ্য, পানীয় জল, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবি। কিন্তু একি বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য যে সরকার জনগণের এই সার্বিক দাবিগুলো মিটিয়ে দেবে? তাহলে তো শোষণের মজাটাই বিদায় নেবে। যুক্তি-তর্কের বাইরে যদি ধরেও নেওয়া যায় সরকার জনস্বাস্থ্যের নীতিকে সার্থকরূপ দেবে, তবুও কিন্তু এর ফলে সরকারের চিকিৎসা নীতি কখনই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না। কারণ, দেশে রোগী থাকবে, চিকিৎসার প্রয়োজনও থাকবে। রোগীকে রোগমুক্ত করতে চিকিৎসারই প্রয়োজন এবং 'জনস্বাস্থ্য' কখনই 'চিকিৎসা'র সমার্থক নয়।

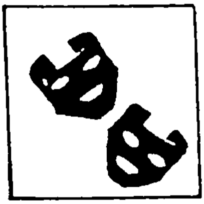

গণবিজ্ঞান ও জনবিজ্ঞানের আন্দোলন : জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র-র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্রীরামপুরে ৬ ও ৭ অক্টোবর ১৯৯১। সম্পাদক স্বপন শীলের স্বাক্ষরিত যে ছাপানো বক্তব্য প্রকাশিত হল তাতে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র গঠিত হওয়ার পর থেকে পথ চলার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। সম্পাদকের বক্তব্য ছিল, "আজকের দিনে কোনও পদ্ধতি রীতিনীতি বা ধারণাকে কুসংস্কার বললেও মনে রাখা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারটির জন্মলগ্নে অবশ্যই থাকবে এক অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি, হতে পারে তা অবৈজ্ঞানিক। এই সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আজকের সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্য মৌলিক। আজকের সমাজের সব কিছুরই ধারক রক্ষক সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা যা অতীতে ছিল না। অতএব আজকের দিনে সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হবে।"

বাঃ বাঃ সত্যিই বড় বিচিত্র এই প্রস্তাব।

এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞান-আন্দোলন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতারা আবিষ্কার করলেন, কুসংস্কারমুক্তির জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আমাদের আজকের সমাজে 'শূন্য'।

শোষিত মানুষদের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের দাবি রাখতে হবে শোষকশ্রেণির তল্পিবাহক রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থাৎ সরকারের কাছে। আমরা তেমন জোরালোভাবে দাবি রাখতে পারলে সরকার শোষিত মানুষগুলোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে শোষকদের সঙ্গে নিয়ে বানপ্রস্থে চলে যাবে।

এ কথা ভুলে থাকার কোনও অবকাশ নেই, যাঁরা নতুন সমাজ গড়ার

স্বপ্ন দেখেন, সেই সমাজের উপযুক্ত মানুষ গড়ার দায়িত্বও তাঁদেরই। আদর্শ সমাজ গড়তে আদর্শ মানুষ গড়া দরকার। নতুবা যে আদর্শের জন্য বহু ত্যাগের সংগ্রাম, তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একদিন সংগ্রামী মানুষগুলোই ক্ষমতার অপব্যবহারে রপ্ত হয়ে উঠবে। শুরু হবে নয়া শোষণ। তখন মনে হবে এত রক্তক্ষয়ের পর যা হল সে তো শুধুই ক্ষমতার হস্তান্তর, মহত্তর আদর্শ-সমাজ গড়ে উঠল কই?

গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্রের সম্পাদকের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলোতে সমাজ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও আনাড়িপনা ফুটে উঠেছে, তা কি না বোঝার মূর্খতা থেকে? না কি গুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত? এই সিদ্ধান্তগুলো যে শোষক ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বার্থ রক্ষাকারী এবং শোষিত মানুষদের শোষণমুক্তির চিন্তাধারার বিরোধী এটুকু বুঝে নেওয়া যেহেতু আকাট-মূর্খ ও বদ্ধ-উন্মাদ ছাড়া আর কারও পক্ষেই সামান্যতম কঠিন নয়, তাই এই বিষয় নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া একান্তই অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বিরত রইলাম। গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্রের নেতারা অনেকের দ্বারা নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হয়েছেন বছরের সেরা ডিগবাজি খেয়ে ভারতীয় রেকর্ড দখল করে। একটি বিনীত অনুরোধ জানাই, বর্ষশ্রেষ্ঠ চুটকি প্রতিযোগিতায় সম্পাদক সিদ্ধান্তটি পাঠান, পুরস্কার অবধারিত। তিন নম্বর সিদ্ধান্তটি কী অসাধারণ রসিকতার নিদর্শন বলুন তো— কুসংস্কার দূর করা যেহেতু দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, তাই এই প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত সবার আগের বদলে সবার পরে।

যাঁরা গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছেন, তাঁদের আরও একটু সতর্ক ও সচেষ্ট হতে অনুরোধ করব। তাহলেই দেখতে পাবেন সবের মধ্যেই এক যোগসূত্র। এই সমন্বয় কেন্দ্র সেই আমেরিকার কুখ্যাত CSICOP-র দালাল পত্রিকাগোষ্ঠী 'উৎস মানুষ'-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই কাজে নেমেছে, যে CSICOP-র কাজ হল পৃথিবীর যেসব দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকে বিনষ্ট করতে দালালদের সাহায্যে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলা।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের নেতৃত্বে 'গণবিজ্ঞান' আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নেতৃত্বে 'জনবিজ্ঞান' আন্দোলন (এই দুই সংস্থা জনগণের আন্দোলনকে এই দু'টি নামেই চিহ্নিত করে থাকেন) ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্ট, সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে

সামান্যতম প্রশ্ন না তুলে, আগ্রহ না প্রকাশ করে নিবিড় ধান চাষ, ব্যাঙের ছাতার উন্নত চাষ, পানের চাষের জমি পরীক্ষা পদ্ধতি, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সেই সঙ্গে সৌরশক্তির পারিবারিক ব্যবহার, ধূমহীন চুল্লি নির্মাণ, গোবর গ্যাসের উৎপাদন, জল ফুটিয়ে খাওয়ার উপকারিতা, খাবার ঢেকে রাখার উপকারিতা, মশারি টাঙিয়ে শোবার উপকারিতা, এড্স থেকে বাঁচতে জন্ম নিরোধক ক্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা জাতীয় সরকারি প্রচার মাধ্যম মারফত প্রচারিত বিষয়গুলো নিয়েই পুনঃসম্প্রচারণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস' উপলক্ষে বারো কিলোমিটার পদযাত্রা (আর আমাদের রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়া কর্মের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি না করা), 'জলা বাঁচাও দিবস' উপলক্ষে মাছ হাতে ছ'কিলোমিটার দৌড়, বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে গাছ হাতে কুড়ি কিলোমিটার দৌড় এবং 'হিরোসিমা দিবস' ও 'ভূপাল কমিটি' দিবসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মুণ্ডুপাত করে আগুন ঝরানো বক্তৃতা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদেধ প্রতিবাদ জানাতে ভাগলপুর থেকে নেপাল পথ-পরিক্রমা ইত্যাদি নিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে এদের কর্মকাণ্ড। কুসংস্কার বিরোধী, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী যে কোনও বক্তব্যকে এঁরা লেবেল এঁটে দেন 'হঠকারী' বলে।

আসলে এইসব নেতারা চতুর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুণে নয়, পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছেন। ফলে এঁরা সংখ্যাগুরু জনগণকে সঙ্গে পেতে তাদের চেতনার স্তরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। এঁরা ইচ্ছে করেই চাইছেন মানুষের চেতনার অগ্রগামিতা থামাতে। কারণ, এইসব পোড়খাওয়া চতুর নেতাদের মোটেই অজানা নেই—বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার আন্দোলন সমাজ ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনকারী আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি।

চলো যাই ফিরে : পুরোনো কথায়

১৯৯১-এর অক্টোবরে যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা আলোচনায় বসলেন— এবার আমরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সমিতির মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' প্রকাশ করতে শুরু করব কি না? একটি মাত্র কারণে আমরা এতদিন 'যুক্তিবাদী' প্রকাশে বিরত ছিলাম। জানতাম, আমরা প্রথম থেকেই আমাদের মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' প্রকাশ করতে থাকলে আমাদের সহযোগী সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা সংগঠন আমাদের উপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তাই এতদিন আমরা বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করেছি পত্র-পত্রিকা, বুলেটিন ও বই প্রকাশে। কারণ, আমরা মনে করি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যুক্তিবাদী চেতনা বিকাশের স্বপ্ন দেখলে তা কোনও দিনই বাস্তবায়িত হবে না। কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রতিহত না হয়, তার জন্যেই বেশি বেশি করে যুক্তিবাদী মানুষ ও সংস্থার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এর ফলে, শোষক ও শাসক শ্রেণির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বকে আঘাত করে আন্দোলন শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় আমাদের যে শ'তিনেক সহযোগী সংগঠন ও শাখা সংগঠন আছে তাদের মধ্যে থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে ষাটের ওপর যুক্তিনির্ভর, সমাজ-সচেতন পত্র-পত্রিকা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, 'যুক্তিবাদী' প্রথম প্রকাশ ঘটাব ১৯৯২-এর কলিকাতা পুস্তক মেলায় অর্থাৎ জানুয়ারির শেষে। ছ'জনের সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি করে কাজ শুরু হল। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হল তিন টাকা। ১৯৯২-এর পুস্তকমেলার মূল মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার প্রকাশ ঘটল। প্রথম সংখ্যাটি সমিতির সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি তুলে দিলেন সমিতির উপদেষ্টা পবিত্র সরকারের হাতে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের নতুন মাত্রা যুক্ত করল 'যুক্তিবাদী'।

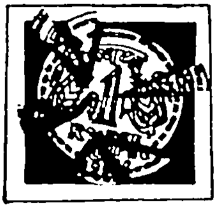

বিজ্ঞান জাঠা : বড় বেশি দেখা হল ধর্মত যা দেখা অপরাধ

'৯১-এই অতি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে নতুন ধারা যুক্তিবাদী সমিতি নিয়ে এসেছে, তাই মূল স্রোত হয়ে উঠেছে— অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, তাই বা বলি কী করে?) ভারতের প্রায় সাতশোটি গণ-সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠীর সমন্বয়কারী হিসেবে নিবিড় সম্পর্ক রাখার সুবাদে আমাদের চিন্তাধারা যে তাদেঁরকেও নাড়া দিতে শুরু করছে— এ খবর আমরা পাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চিঠিপত্র ও সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। বাংলাদেশের 'বাংলার বাণী'-সহ বহু পত্র-পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতেই লাগল আমাদের সমিতির কর্মকাণ্ডের কথা, যুক্তিবাদের কথা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা। দেখলাম যুক্তিবাদী আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাল্টে দেওয়ার আন্দোলন সত্যিই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকেই আন্দোলিত করছে। গ্রামগঞ্জের নিপীড়িত মানুষরা যেভাবে আন্দোলনের শরিক হচ্ছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং যে দ্রুততার সঙ্গে এই আন্দোলন ব্যাপকতা পাচ্ছে তাতে আন্দোলিত হুজুর শ্রেণি ও তাদের তল্পিবাহকরাও। হুজুরের থাবার ভেতর যেসব পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম রয়েছে তার সকলগুলোকেই কাজে লাগানো হয়েছে আন্দোলন রুখতে, সংস্কারের শিকল ভাঙার অভিযান রুখতে, নতুন চিন্তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ রুখতে।

আমাদের দেশের হুজুরের দল ও তাদের অর্থপুষ্টরা সাধারণ মানুষের চেতনা-মুক্তির এই আন্দোলনে দেখতে পেল অশনি সংকেত। তাইতেই তারা সাধারণ মানুষের চিন্তাকে নিজেদের পছন্দমতো ছাঁচে ঢালতে চাইল। চাইল বিভিন্নভাবে আক্রমণে আক্রমণে দানা বেঁধে ওঠা আন্দোলনকে ধ্বংস করতে। চাইল মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের বিভ্রান্ত

করে আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে। আর তাই নানাভাবে কাজে নেমে পড়ল আমাদের রাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের গোষ্ঠী, নানা প্রচার মাধ্যম এবং বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি। আমাদের মতো শোষণযুক্ত একটা বিশাল দেশের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক হতে বাধ্য। তাই ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভেবে-বসে থাকতে রাজি নন পৃথিবীর কিছু কিছু মোড়ল দেশ।

এইসব ধরাণা যে কোনও সন্দেহপ্রবণ মানুষের চিন্তার ফসল নয়, তারই উদাহরণ ছড়িয়ে আছে আপনার আমার দৃষ্টির সামনেই। একটু সজাগ থাকুন, অনেক-অনেক উদাহরণ নজরে পড়বে।

C.S.I.C.O.P. দোসর আমেরিকার The Nature পত্রিকার সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতে পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান জাঠা বা Science mission অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। এই বিজ্ঞান জাঠা বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করল 'নেচার' পত্রিকা। এই বিজ্ঞান জাঠার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির আহবানে ১৬ নভেম্বর '৯১ কিছু সায়েন্স ক্লাবকে নিয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায়। স্বপ্নময় প্রাসাদের এয়ারকন্ডিশনের মিঠে ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে রাজ্য সরকারের অতি স্নেহধন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কিছু নেতা ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের কিছু নেতা বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ২০ কোটি টাকা বাজেটের সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান জাঠার মহৎ তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন। রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির নেতারা জাঠা কমিটির একটি তালিকা পেশ করলেন ও পাশ করালেন। সভাপতি করা হল এক বিজ্ঞান পেশার অধ্যাত্মবাদে পরম বিশ্বাসীকে, যিনি একই সঙ্গে ধর্মগুরুর জন্মদিনে প্রণাম জানিয়ে বক্তৃতা দেন, গীতা, ভগবৎ পাঠের আসর মাতিয়ে রাখেন এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কার্য-নির্বাহী সভপতি করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি, দুর্গা পুজো কমিটির সভাপতির আসনেও জাঁকিয়ে বসেন। সম্পাদক করা হল বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার জনৈক প্রাক্তন ডিরেকটারকে। ইতিপূর্বে উনি বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সময় দিতে পারেননি বিড়লার চাপানো গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর উনি নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। জানি না, তাঁর এমন এক জনদরদি অসাধারণ সিদ্ধান্তর জন্যই প্রস্তুতি কমিটি তাঁর হাতে সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন কি না; না, বিড়লা গোষ্ঠীর নির্দেশেই

সম্পাদকের দায়িত্ব তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন? এমনটা ভাবার পেছনে অবশ্যই যুক্তি আছে। কারণ ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশনের সভাপতি ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল আমাকে সে রাতেই জানিয়েছিলেন জাঠার টাকার একটা মোটা অংশ জোগাচ্ছেন বিড়লা, টাটারা। (প্রত্যয় রাখি, ডাঃ শীল ভবিষ্যতে কারো চাপে পড়ে এমন কথা বলবেন না- "যা বলেছি, তা বলিনি"। তেমন চাপে যদিও বা বলেন, অবশ্যই প্রমাণ করতে সক্ষম হব-তিনি একথা বলেছিলেনই)। অবশ্য এ-সব টাকা নাকি ওঁরা জোগাচ্ছেন যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে। নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিকদলগুলোর নির্বাচনী তহবিলের কায়দায় জনগণের কাছ থেকে অবশ্য দু-পাঁচ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হবে এটা দেখাতে—মোরা তোমাদেরই লোক, বড়লোকদের দালাল নই। সভাপতি ও সম্পাদক-পদ ছাড়া বাকি পদগুলোর সাম্রাজ্য প্রায় সমান দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন গণবিজ্ঞান-সমন্বয় কেন্দ্রের কিছু নেতা এবং রাজ্য সরকারের অতি স্নেহধন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নেতারা। তবে মঞ্চের নেতারা সকলে এবার ওই সংস্থার নাম করে কমিটিতে ঢোকেননি, ঢুকেছেন অন্যান্য সংস্থার নাম করে। এমনটা করার কারণ প্রথম বিজ্ঞান জাঠার দায়িত্ব গতবার বিজ্ঞান মঞ্চ পেয়েছিল। এবং ওদের বিরুদ্ধে ভারতের একাধিক প্রদেশের বিজ্ঞান-প্রতিনিধিরা এমনকী পশ্চিমবাংলার কিছু বিজ্ঞান-ক্লাবও বহু অনিয়ম ও দাদাগিরির অভিযোগ এনেছিলেন দ্বিতীয় বিজ্ঞান-জাঠা বিষয়ক কনভেনশনে।

একবার সুস্থ মাথায় যুক্তি দিয়ে ভাবুন তো, বাস্তবিকই কি এমন ঘটতে পারে, বিড়লা টাটার মতো ধনিক গোষ্ঠী ও ধনিক গোষ্ঠীর অর্থে নির্বাচনে জিতে শাসন ক্ষমতায় বসা সরকার এবং আমেরিকার সুবিখ্যাত পত্রিকাগোষ্ঠী বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিজ্ঞান-জাঠার মধ্য দিয়ে শোষিত জনগণের ঘুম ভাঙাবার গান শোনাবেন, সংস্কারমুক্তি ঘটাবেন, জাতপাতের পাঁচিল ভেঙে ফেলবেন, বোঝাবেন : 'তোমাদের বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট নয়, পূর্বজন্মের কর্মফল নয়, ঈশ্বরের কোপ নয়, একদল অতিস্বার্থপর লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের শোষণের কারণেই তোমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বঞ্চনা, বঞ্চনা, এবং বঞ্চনা।"

হুজুরের দল ও তাঁদের তল্পিবাহকরা কি বাস্তবিকই পাগল হয়ে গেছে যে নিজ অর্থ ব্যয়ে বঞ্চিত মানুষদের বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী করে নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়বে?

উত্তর : না, না এবং না।

বিজ্ঞান-জাঠার অর্থ বিনিয়োগকারীরা চাইছিলেন ব্যাপক প্রচারের ঝড় তুলে, যুক্তিবাদী আন্দালন ও বিজ্ঞান আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য বিজ্ঞামনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ গড়ার আন্দোলন, সেই লক্ষ্যকে বিপথে পরিচালিত করতে ব্যাপক পাল্টা প্রচার রাখবেন, "বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।"

এসব কথা বিজ্ঞান-জাঠা শুরুর মাস আটেক আগেই প্রকাশিত 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' -এর ৩য় খণ্ডে লিখেছিলাম। সেই সঙ্গে আরও লিখেছিলাম, জাঠার চালিকাশক্তি চাইছে, আন্দোলনকর্মীদের একটা বিশাল অংশকে জনসেবার কাজে আটকে রেখে আন্দোলনকে ব্যাহত করতে। বিজ্ঞান-জাঠা কুসংস্কার-বিরোধিতায় নামবে কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই। অদৃষ্টবাদ, আত্মা, পূর্বজন্ম, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ইত্যাদি শোষক দলের শ্রেষ্ঠ হতিয়ারগুলোর বিরুদ্ধে 'জাঠার মাথা খাওয়া' নেতারা কখনই সামান্যতম আঘাত হানার চেষ্টা করবে না, করতে পারে না; যেমন হুজুরের অর্থে নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়া রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত অর্থে কখনই হুজুরের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ করতে পারে না। যা পারে, সেটা হল, শোষিত মানুষদের বিভ্রান্ত করতে, শোষিত মানুষদের বন্ধুর অভিনয় করতে। বিজ্ঞান-জাঠাও এর বাড়তি কিছুই করতে পারবে না। ওদের কুসংস্কারবিরোধিতা সীমাবদ্ধ থাকবে গুটিকতক ম্যাজিক ও অলৌকিক রহস্য ফাঁসের মধ্যেই। এই কলমচির প্রতিটি কথার সত্যতা আপনারা মিলিয়ে নেবেন আপনাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে। জানি এ-লেখা বিজ্ঞান-জাঠার ঠিকা পায়া নেতারা অনেকেই পড়বেন-বার বার পড়বেন, ওঁদের বুদ্ধিজীবীরা আবার মানুষের মগজ ধোলাই করে নিজেদের কার্যক্রমের মহত্ত্ব সাধারণকে বোঝাতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু যুক্তির কূট কচকচালি যতই সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন, বাস্তবে শাসক, শোষক ও বিদেশী শক্তির সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কখনই তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে না, হবে না। পরিচালিত হবে অবশ্যই তাদেরই স্বার্থ রক্ষার্থে।

বিশাল অর্থ ও বিশাল প্রচারের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞান-জাঠার ঝড় তুলে

এইসব বিজ্ঞান আন্দোলনের মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের দল শোষিত মানুষদের চেতনা-মুক্তির গতিকে হয়তো সামান্য সময়ের জন্য স্তিমিত করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই; জয় শোষিত মানুষদের হবেই।

সেদিনের বিজ্ঞান-জাঠা কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা বিপ্লব বসু দ্বিধাহীন ভাষায় জাঠায় টাকার উৎস জানতে চেয়ে বলেছিলেন, "টাকা খরচ না করলে আজকাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী জোটে না।" অর্থের বিনিময়ে কর্মী হয়তো জোটে, কিন্তু এইসব ভাড়াটে সেনা দিয়ে আদর্শ-সচেতন মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জেতা যায় না।

নিপীড়িত ভারতবাসীদের দিকে দিকে জেগে ওঠার খবরে শোষক ও শাসকরাও আজ উদ্বেল। তাই বিপুল অর্থের বিনিময়ে নেতা কিনতে নেমে পড়েছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া এইসব নেতাদের প্রত্যেককেই কলটেপা পুতুলের মতোই ব্যবহার করা শুরু করেছে ধনকুবের গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রশক্তি। একদা সংগ্রামী এইসব নেতাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হতে দেখে হৃদয় ব্যথিত হয়। এঁদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যাঁরা অনুরোধ জানান, তাদের জানাই এমন মুখোশধারী বন্ধুদের নিয়ে আন্দোলন গড়তে চাইলে আন্দোলন ধ্বংসের জন্য শত্রুর প্রয়োজন হয় না।

এমন অবক্ষয়, এমন দুর্নীতি, এমন নিলামের হাটে বিবেক কেনা-বেচা দেখার পরও আমরা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। আমরা স্বপ্ন দেখি তরতাজা আদর্শবাদী জীবন-পণ করা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা গোত্রান্তরিত তৃণভোজী এইসব নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে সংগঠনকে আবার করে তুলবে বঞ্চিত মানুষদের সংগ্রামের সাথী।

জানি এত দীর্ঘ আলোচনার পরও কিছু কিছু সংস্কৃতিক-আন্দোলন কর্মীদের মনে হবে যে সব বিজ্ঞান ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি, বিচ্যুতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হল, তাদের ভালো কি কিছুই নেই? সবই খারাপ? তারাও তো সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সমাজের জন্যে কিছু না কিছু করছে, তবে কেন তাদের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে না?

ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—এমনি কত প্রতিষ্ঠানই তো চালায় অনেক ভেজালদার, মুনাফাখোর শোষকরা। সমাজের জন্য ওরাও তো কিছু করেছে। তাই বলে আপনি আমি কী ওদের সঙ্গে নিয়ে ওদেরই বিরুদ্ধে (ওরাই শোষণের স্বার্থে সংস্কারগুলো চাপিয়ে রেখেছে) সংগ্রামে নামার কথা চিন্তা করব পাগলের মতো? একই কারণে রাষ্ট্রশক্তির দালাল মুখোশধারী এই সব আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামের চিন্তা একেবারেই পাগলামি। এইসব মুখোশধারীরা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার বা জ্যোতিষীদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ অন্তর্ঘাতের জন্যেই এইসব বিক্রি হয়ে যাওয়া নেতারা তাদের সংস্থাগুলোকে কাজে লাগায়। নিরপেক্ষতার নামাবলি চাপিয়ে যাঁরা শোষকশ্রেণির মুখোশধারী দালালদের এবং শোষিত শ্রেণির সংস্কারমুক্তি আন্দোলনে সংগ্রামরতদের একই পর্যায়ে ফেলেন, তাঁরা প্রকারান্তরে ওইসব দালালদেরই উৎসাহিত করেন। দালালরা উল্লসিত হয় এই ভেবে, কী অনায়াসে পঙ্গু করে দিয়েছি কিছু সম্ভাব্য সংস্কার-মুক্তির যোদ্ধাকে। ওইসব সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেদিনই সংগ্রামে নামা সম্ভব যে-দিন ওরা হুজুরের শিবির পরিত্যাগ করবে। আর এসবই নেতৃত্ব বদলের আগে কখনই সম্ভব নয়—মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ কি কখনও মানুষ মারা ছাড়ে, না মরা পর্যন্ত? ওইসব শোষকদের, দালালদের সঙ্গে যাঁরা শোষিত মানুষদের জন্য মিলিজুলি আন্দোলন চালাতে বলেন, তঁদের অনেকেরই অজানা, ওইসব দালালরাই ধনতন্ত্রের স্পর্ধিত পদচারণার প্রধান ভিত্তিমূল। অনেকে জানেন, তবু বলেন—আন্দোলনে ক্যানসারের বীজ ঢোকাতেই এমনটা বলেন।

'৯২-র জানুয়ারিতে কলিকাতা পুস্তকমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল 'অলৌকিক নয় লৌকিক'-এর তৃতীয় খণ্ড। বইটির 'কিছু কথা' দ্বিতীয় বিজ্ঞান জাঠা নিয়ে এ-সবই লেখায় যে ঝড় উঠেছিল, সে ঝড় সামাল দেবার সাধ্য ছিল না জাঠার নেতাদের ও নেপথ্যের রাজনৈতিক স্টার-সুপারস্টারদের। 'গণবিজ্ঞান' ও 'জনবিজ্ঞান' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু সংগঠনই জাঠা'র মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করে বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল স্রোতকে ধ্বংস করার এই প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করতে রাজি হলেন না। এমন এক অসহনীয় চাপ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে বিড়লার চাপিয়ে দেওয়া সম্পাদক পদত্যাগ করলেন। এই পদত্যাগের ঘটনাটি ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ বিজয়, ঐতিহাসিক বিজয়। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সম্মিলিত সংগ্রামের কাছে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি ও হুজুরের দলের সম্মিলিত বাহিনীকে।

সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। যতই দিন যাচ্ছিল ততই বেশি বেশি করে বিজ্ঞান সংস্থাগুলো 'জাঠা'র মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছিল এবং জাঠায় অংশগ্রহণ যে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনের, যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তা বুঝতে পেরে জাঠা-থেকে নিজেদের বি-যুক্ত করেছিল।

ইতিমধ্যে সর্ববৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী জাঠার পক্ষে হাওয়া তুলতে সর্বশক্তি নিয়ে আসরে নামল। ওদের দৈনিকের 'রবিবাসরীয়'র পাতায় জাঠার উদ্যোক্তা সংগঠনগুলোকে নিয়ে ব্যাপক ফোলানো-ফাঁপানো প্রচার চালানো শুরু হল। একাধিক রবিবারে ঘুরে-ফিরে যারা প্রচারের আলোয় এল, সে-সব সংস্থা একটি সরকারের বড় শরিকের আপন সংগঠন, অন্য সংস্থাগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাদের সক্রিয় সদস্য গুনতে খুব বেশি হলে দু'হাতের আঙুলগুলোই যথেষ্ট। তবু ওরা প্রচারের আলোয় এল, ব্যাপকভাবেই এল, শহর ছেড়ে গ্রামে কোনও দিনও আন্দোলনের জন্য পা না বাড়িয়েই এল, ওদের নেতারা বুদ্ধিজীবী বলেই এল, এক-পা সরকারি সাহায্যের দড়িতে, অন্য-পা দেশি-বিদেশি ধন-কুবেরদের দড়িতে রেখে ব্যালেন্সের খেলা দেখাবার যোগ্যতা নিয়ে এল। দেশপ্রেম যখন অট্টহাস্যের বস্তু, আন্দোলন যখন বাজারের পণ্য, বুদ্ধিজীবীরা যখন বুদ্ধিবেচা জীব তখন এমনটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ছিল না রাজ্যসরকারের পত্রিকা 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর জাঠাকে সার্থক করতে মাত্রাতিরিক্ত ছুট-ফটানি। কিন্তু যেটা অপ্রত্যাশিত ছিল তা হল সম্মিলিত জাঠা শক্তির সমস্ত পরিকল্পনাকে ওলট-পালট করে সম্পূর্ণ জাঠাকে ধসিয়ে দিয়ে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে উত্থান ঘটবে এক নতুন শক্তির। আশি বছরে কমিউনিস্টরা এবং পঁয়তাল্লিশ বছরে ভারতের কর্ণধাররা যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেনি, যে যুক্তি-সচেতনতা গড়ে তুলতে পারেনি, যে ব্যক্তিস্বার্থ-চিন্তার অবক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারেনি, কয়েক মাসের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা তাই করে দেখাল। 'সংগ্রাম' শব্দটি বইয়ের পাতা থেকে লাফিয়ে নেমে এল মাটিতে। বাবু নেতাদের হটিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল গ্রাম-গঞ্জের এতদিনকার পিছিয়ে থাকা হাজার-হাজার তরুণ। এরা মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন রুখতে যে ভাবে জাঠার সঙ্গে অসহযোগিতা করলো, সত্যি বলতে কি জাঠাকে ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করল তাতে এতদিনকার বিজ্ঞান

আন্দোলনের বাবু নেতারা বেকুব। বেকুব কলকাতা, দিল্লির রাজপুরুষেরা, প্রচার বিশেষজ্ঞ পত্রিকাগোষ্ঠী ও দেশি-বিদেশি ধনকুবেররা, যাঁরা মানুষের ভাগ্য বানাতেন, ধসাতেন। সংগ্রামে নামা নতুন নতুন মুখগুলোকে সামাল দেবার ক্ষমতা ছিল না বাবু নেতাদের। ঠান্ডা ঘরে বসে বিজ্ঞান আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, পত্রিকা প্রকাশ করা এক কথা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সার্থক রূপ দিতে দুর্নীতির অপসংস্কৃতির, শোষণের অপসংস্কৃতির, কুসংস্কারের অপসংস্কৃতির পালক শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-আধা শহরে সত্যিই সংগ্রামে নামা আর এক কথা। নতুন নতুন মুখের সঙ্গে হাজির হতে লাগল নতুন নতুন কর্মসূচি। কলকাতার রাষ্ট্রীয় শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে 'প্রতীচ্য জ্যোতিষ মহা সম্মেলন'-এ (১৫.২.৯২) যুক্তিবাদীরা বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করল। প্রতারক জ্যোতিষীরা বিক্ষোভ এড়াতে সাংবাদিকদের সামনেই ওই সম্মেলনে যুক্তিবাদীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিতর্কে নামবে কথা দিয়েও নিশ্চিত পরাজয় বুঝে শেষ পর্যন্ত পুলিশ পাহারায় রণে ভঙ্গ দিলেন। যুক্তিবাদীদের লাগাতার দাবি ও আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করে কর্নাটক সরকার ১ মার্চ '৯২ ঘোষণা করলেন শিমোগা জেলার দেবী শ্রীরেনুকাম্বা মন্দিরের যাত্রা মেলা নিষিদ্ধ। শ্রীরেনুকাম্বা যাত্রায় শত-শত ভক্ত নর-নারী সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মন্দিরে যেতেন পুজো দিতে। এমন এক অশ্লীল কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী দৃশ্য তারিয়ে-তারিয়ে, চেটে-পুটে উপভোগ করার মতো বিকৃতকাম দর্শকদের অভাব হত না। এমনকী, বিকৃত কামনা থেকেই নগ্ন-ভক্ত বনে যাওয়ার প্রবণতাও অনেকের মধ্যে অবশ্যই ছিল। ১৮ মার্চ '৯২ কলকাতা দূরদর্শন সমস্ত ন্যায়-নীতিকে সপাটে লাথি কষিয়ে প্রচার করল 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' শিরোনামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পক্ষে জনগণের পকেট কেটে পঞ্চাশ মিনিটের এক বিনে পয়সার বিজ্ঞাপন। জনগণকে অদৃষ্টবাদী করে তোলার এই ঘৃণ্য চেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা বিক্ষোভ জানিয়েছেন দূরদর্শন কেন্দ্রে। সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, সাংবাদিক, চিত্র-পরিচালক, গ্রাম-গঞ্জের তরুণ-তরুণী, কে না ছিলেন বিক্ষোভ সমাবেশে? দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কুশপুতুলে আগুন জ্বলে উঠল। জল গড়াল দিল্লি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটির প্রযোজিকার কাছে এই ব্যাপারে জবাব চেয়ে পাঠালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক—কেন এমন এক বিজ্ঞান বিরোধী প্রচারমূলক প্রোগ্রামটি দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হল? দীপঙ্কর দে পরিচালিত হিন্দি টেলিফিল্ম 'জ্যোতিষী' দূরদর্শন আটকে দিল। দূরদর্শনের মান্ডি হাউস কর্তৃপক্ষের বক্তব্য প্রকাশিত হল পত্র-পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ কারণ হিসেবে জানাল - "এ ছবিটি সম্প্রচার করা হলে কুসংস্কার এবং জ্যোতিষীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং বুদ্ধিজীবীরা সম্প্রচারের পর গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে পারেন।" এমন সম্ভাবনার কথা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর থেকেই পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। দেশের মানুষ দেখল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর যুক্তিবাদীদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে নজরে রাখছে। 'জ্যোতিষী' ছবিটি দেখাবার অনুমতি পাওয়া গেল অনেক বিযুক্তি ও সংযুক্তির পর।

২ মে '৯২ কেরলের কোচিনে শুরু হল পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞ। উদ্যোক্তা কোচিনের 'দি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোলজিকাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট', সংক্ষেপে 'CARD'। নিঃসন্তান হাজার হাজার দম্পতির মধ্য থেকে ১১০০ দম্পতিকে বেছে নিয়েছিল। যুক্তিবাদীদের সরাসরি অভিযোগ ছিল দম্পতি নির্বাচনের সময় CARD তাদেরকেই নির্বাচিত করেছিল, যাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল সন্তান না হওয়ার জন্য দায়ী পুরুষের জন্মদানে অক্ষমতা। CARD তাদের ২০০ কর্মীর সাহায্যে জীববিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই সন্তান উৎপাদন করতে সহায়তা করবে, এবং মা হওয়ার তীব্র আকুতি থেকেই মাতৃত্ব লাভের পর রমণী সত্য গোপন করবেন-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটাই স্বাভাবিক। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কে. করুণাকরণ এই মহাযজ্ঞ উদ্বোধন করবেন, এমনটাই কথা ছিল। কিন্তু করুণাকরণ কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলেন না যুক্তিবাদীদের তুমুল বিরোধিতায়।

'মিষ্টিবাবা'র বিপুল উত্থানে ভারত কেঁপে উঠল। তামাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার শহর বারামতির এক ধনী-কৃষক ভানুদাস গায়কোয়াড়ের কথা। একদিন স্বপ্নভঙ্গের পর ভানুদাস পেল এক অলৌকিক ক্ষমতা। ভানুদাসের সারা শরীর যেন মিষ্টি তৈরির কারখানা, যাতে হাত ছোঁয়ায় তাই মিষ্টি হয়ে যায়, তা সে স্টিলের কলম, মোটর-বাইকের হ্যান্ডেল, জল বা কাঁচালঙ্কা—যাই হোক না কেন। পুণে ও বোম্বের তা বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা ভানুদাসকে পরীক্ষা করে হতবাক। রক্ত, ঘাম, মূত্র-কোনওটাতেই বিশেষ কোনও নিঃসরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। সব স্বাভাবিক। রক্ত ঘাম, মূত্র, থুতুর ওপর বিশেষ পরীক্ষা চালিয়েও

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিকত্বের বাইরে কিছুই পাননি। অথচ সাবান বা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে হাত ভালো করে ধুইয়ে দিয়েও ভানুদাসের মিষ্টি তৈরির কর্মকাণ্ড বন্ধ করা যায়নি। এমন এক সারা জাগানো খবরকেও তাড়া করল যুক্তিবাদীরা। ভানুদাসকে ঘিরে গড়ে ওঠা ক্ষমতালোভীদের চক্রান্তকে ভেঙে মিষ্টি করার ক্ষমতাও হল অদৃশ্য।

হুজুর সাইদাবাদী বাংলাদেশের সবচেয়ে বাঘা প্রচার পাওয়া অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার। এ-দেশে এসে বে-আইনিভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে নানা রোগমুক্তির কথা ঘোষণা করত। প্রধান শক্তি অবশ্য ছিল নিঃসন্তান দম্পতিকে সন্তান দান। কলকাতায় হুজুর সাইদাবাদীর আনাগোনা শুরু হল। যুক্তিবাদীদের উৎপাত ঠেকাবার ভার সাইদাবাদী তুলে দিলেন স্থানীয় সমাজ-বিরোধী, খুনে ও মস্তানদের হাতে। রাত দুপুরে দামাল কিছু যুক্তিবাদী হুজুরের ভাড়াটে সেনাদের চোখের সামনে হুজুরের হোটেলের আশেপাশে হুজুরেরই বিরুদ্ধে এক গাদা পোস্টার সাঁটল। কলকাতার মস্তান রাতের শাসকরা সব কিছু দেখল, বুঝল তাদের সম্মানের কান-কাটা যাচ্ছে, তরতাজা বেপরোয়া যুক্তিবাদী ছেলেগুলোর মধ্যে তাদের সর্বনাশের যে ছায়া দেখেছিল, তাই বাচাল খুনেদেরও মূক করে রেখেছিল। যুক্তিবাদীরা হুজুরের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিল বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে, রাজ্য স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে। পুলিশ নড়ে-চড়ে বসল না। সাইদাবাদী আবার ঘুরে যেতে লাগল। চালিয়ে যেতে লাগল এ-দেশের আইন ভেঙে মন্তরে রোগমুক্তি ও সন্তানদানের পক্ষে প্রচার। যুক্তিবাদী সমিতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের ডি.জি ও পুলিশ কমিশনারকে জানাল, পুলিশ যদি হুজুরের এমন প্রতারণা বন্ধে সচেষ্ট না হয় তবে যুক্তিবাদী মানুষরাই নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হবে। এ-বার কাজ হল। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তকে লেখা এক গোপন বার্তায় আবেদন জানালেন বাংলাদেশের নাগরিক মোহম্মদ সইদুর রহমান ওরফে হুজুর সাইদাবাদী ও তাঁর তিন পার্শ্বচরের ভারতে ঢোক বন্ধ করা হোক। যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন পুলিশ কমিশনার। জানালেন আগামীবার যদি হুজুরের আগমন ঠেকাতে না পারি, ওকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তারের জন্য আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরামর্শ করব।

যুক্তিবাদীরা হুজুরের সমস্ত ব্যূহ ভেদ করে হুজুরের মুখোমুখি হয়েছে, নানা প্রতারণার প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। আকস্মিক হানায় হুজুরের ভাড়াটে সেনারা যুক্তিবাদীদের শক্তির পরিমাপ করতে করতে যুক্তিবাদীরা কাজ শেষ করে জলে মাছের মতোই মিশে গেছে।

যুক্তিবাদীরা লড়াই শুরু করল শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে। এ লড়াই কোনও আর্থিক দাবি আদায়ের লড়াই নয়। শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই। গণ-সংগীত, নাটক, মাইম, সাহিত্য—সব কিছুর সাহায্যেই সমাজ 'সাফাই' শুরু হল।

বুদ্ধদেব, সঞ্জীব, সিরাজ, নবনীতা, প্রফুল্ল, কিন্নর রায়, সুপ্রিয় সেন, প্রমুখ বহু লেখকের গল্পে উপন্যাসে দেখা গেল যুক্তিবাদী চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করা একটি চরিত্রকে। দূরদর্শনের পর্দায় যুক্তিবাদীরা হাজির হল 'টার্নিংপয়েন্ট', 'রজনী', 'ছোটো বড়ি বাতে', বাংলা সিরিয়াল 'প্রবাহ'-তে, সুমনের গানে, পত্র-পত্রিকার সংবাদে, সম্পাদকীয়তে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যুক্তিবাদীরা একটা বড় রকমের 'ফ্যাক্টর' হয়ে দাঁড়াল। বাম রাজনীতির বড় শরিক সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর কাছাকাছি আসার প্রচেষ্টা-আলোচনায় একাধিকবার উল্লেখ করলেন, জনগণের উপর যুক্তিবাদীদের দ্রুত-বর্ধমান প্রভাবের কথা। শহরে-আধাশহরে-গ্রামে-গঞ্জের সভায়, পথসভায় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রোতা ও দর্শকদের সংখ্যা যে কোনও সভা-পথসভাকে বার বারই টেক্কা দিতে লাগল। না, এ-সব দর্শকরা কলকাতা দর্শন করবার মানসিকতা নিয়ে আসে না, দল থেকে কিছু পাওয়ার ধান্দা নিয়ে আসে না। এরা যুক্তিবাদী চিন্তাধারার আকর্ষণে আসে, আদর্শবাদী দামাল প্রাণতুচ্ছ করা যুক্তিবাদী আন্দোলনের মানুষগুলোর কাজ-কর্মে শ্রদ্ধা রেখে আসে। সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ পুলিশ সবাই অবাক। এরা চায় কী? সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রে যে ঘুম ভাঙার গান গাইছে, ঘর ভাঙার গান গাইছে, তাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংকেত নেই তো? উদ্বিগ্ন পুলিশের ও গোয়েন্দা দপ্তরের কাজ বাড়ল। যুক্তিবাদীদের বিরোধিতার ও জন-সচেতনতা মুখে বাম রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা পুজো উদ্বোধন ও জ্যোতিষ সম্মেলন উদ্বোধনের প্রচলিত ধারা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা ভাগ হল, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা ভাগ হল, ছাত্র-ছাত্রীরা ভাগ হল, বুদ্ধিজীবীরা ভাগ হল, রাজনীতি ভাগ হল, সমাজ ভাগ হল, যুক্তিবাদী বাম রাজনীতিকরাই

অ-যুক্তিবাদী বাম রাজনীতিকদের পুজো-কালচার, জ্যোতিষ কালচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। যুগটাই কেমন যেন পাল্টে গেল। স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদীরা বাসা বাঁধল। সায়েন্স কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সর্বত্রই যুক্তিবাদীরা দ্রুত বংশ বিস্তার করল। পশ্চিমবঙ্গের বড় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় মুখপত্রে যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতার চরিত্র হনন করে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ধসাতে চাইল। পুরো পাতা জুড়ে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতাকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও নেতার চরিত্র হনন করা। প্রত্যাশা পূরণ তো হলই না বরং ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করল। তাদের দলেরই ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন, লেখক ও শিল্পী সংগঠন ও শ্রমিক পত্রিকার এমন মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল। নিজেদের দলীয় কর্মী ও নেতাদের সোচ্চার প্রতিবাদে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করল 'সত্যিই যুক্তিবাদীরা একটা ফ্যাক্টর'। গোয়েন্দারা কোন্ যুক্তিবাদীদের উপর নজর রাখবে—এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ওরা দেখল পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারের ছেলে যুক্তিবাদী, ভাববাদে নিবেদিত প্রাণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তীর ছেলে যুক্তিবাদী, মার্কসবাদী মন্ত্রী গৌতম দেবের স্ত্রী যুক্তিবাদী, বরেণ্য চিকিৎসক ডাক্তার আবিরলাল মুখার্জি যুক্তবাদী, বিশ্ববরেণ্য চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ যুক্তিবাদী, রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের ডিরেক্টর দিলীপ বসু যুক্তিবাদী, সাংবাদিক খুশবন্ত সিং, জ্যোতির্ময় দত্ত যুক্তিবাদী। সাহিত্যিক ডঃ পবিত্র সরকার, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ সান্যাল, আবদুল জব্বার যুক্তিবাদী, প্রতুল মুখার্জি যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদীরা যেন এল, দেখল জয় করল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব যুক্তিবাদীদের কাছে যেন একটা উৎসব। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে দলে দলে যুবক-যুবতীরা গ্রামে-গঞ্জে সংগঠিত করতে লাগল আন্দোলন, সংগ্রাম। যুক্তিবাদী চিন্তাধারা যে আন্দোলন সৃষ্টি করল তা স্বতঃস্ফূর্ত। যতবার যুক্তিবাদীরা আক্রান্ত হয়েছে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আক্রমণকারীদের ততবারই প্রবল তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যুক্তিবাদী আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছে সংসদীয় প্রণালীর সমস্ত দুর্নীতি ও ভণ্ডামিকে। বিধানসভায়, লোকসভায় যুক্তিবাদীদের কোনও নিজস্ব

প্রতিনিধি নেই। তবু লোকসভা ও বিধানসভাকে অনেক সময়ই অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হয়েছে যুক্তিবাদীদের নিয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলোর প্রচার মাধ্যমগুলোতেও বার বার উঠে আসতে লাগল ভারতের যুক্তিবাদী আন্দেলনের কথা। বাংলাদেশের প্রাচার মাধ্যমগুলোতেও আলোড়ন তুলল যুক্তিবাদীরা।

'৯২-এর ১ মার্চ 'যুক্তিবাদী দিবস' পালন করল পৃথিবীর ২৭টি দেশ। পৃথিবীর কট্টরতম মৌলবাদী দেশ হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের বাহারিন ও রিয়াধ থেকেও যুক্তিবাদীরা চিঠি দিয়ে 'যুক্তিবাদী দিবস' উদযাপনের কথা জানাল। ভারতের যুক্তিবাদীরা যে ১ মার্চকে 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালন করা শুরু করেছিল, তাই স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে হয়ে দাঁড়াল বাস্তবিকই 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস'।

যুক্তিবাদের বিশাল উত্থানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে শাসকের ভূমিকায় থাকা দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের দর্শনের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে '৯২-এর শেষ ভাগে এককাট্টা হল। যুক্তিবাদী দর্শনের বিজয়-রথের গতি প্রতিহত করতে ভাববাদী দর্শনের ব্যাপক প্রচারের জন্য বিবেকানন্দকে সামনে রেখে 'রাষ্ট্রীয় চেতনা বর্ষ' পালনের পরিকল্পনা নিল কংগ্রেস, বি. জে. পি, সি. পি. এম, সি. পি. আই, জনতা দল-সহ তথাকথিত বিপরীত মেরুর দলগুলো। সঙ্গে যোগ দিলেন বিপানচন্দ্র, হাবিব তন্‌বির প্রমুখ তথাকথিত প্রগতিশীলতার সিলমোহর দাগা বুদ্ধি বেচে খাওয়া বুদ্ধিজীবীরা। যুক্তিবাদী আদর্শের সর্বগ্রাসিতা থেকে দলের ক্যাডার বাঁচাতে বড় মার্কসবাদী দলের দৈনিক পত্রিকায় '৯২-এর শেষ অর্ধে পুস্তক সমালোচনার নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফেঁদে বোঝানো হল— মার্কসবাদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধ আছে বলে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তা একান্তই ভুল। ধর্মের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনও বিরোধ নেই।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে এলেন খ্রিস্টান জগতের বিশাল অলৌকিকবাবা মরিস সেরুলো। স্টার টিভি'র এক ইন্টারভিউতে সেরুলো জানিয়েছিলেন, "না, এখনও পর্যন্ত ভারতের যুক্তিবাদী সমিতির মুখোমুখি হইনি"। '৯২-এর ১৩, ১৪, ১৫ অক্টোবর জনপ্রিয় বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় যথাক্রমে সিকি পাতা, আধ পাতা ও এক পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেরুলো জানালেন ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে সেরুলো

অলৌকিক উপায়ে রোগীদের রোগ আরোগ্য করবেন, অন্ধকে দেবেন দৃষ্টি, বোবাকে দেবেন স্বর, বধিরকে দেবেন শ্রুতিশক্তি, খঞ্জকে চলার শক্তি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টান মিশনারিরা এ-নিয়ে লিফ্লেট বিলোলেন। সেরুলোর অলৌকিক ক্ষমতার জ্বরে গোটা পশ্চিমবঙ্গ থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। এমন অলৌকিক রোগমুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ যদিও The drug and magic remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 অনুসারে বে-আইনি তবু পুলিশ ও প্রশাসন আইনের লঙ্ঘন দেখেও নীরব রইলেন। এমন অলৌকিক চিকিৎসা যদিও বে-আইনি তবু এই প্রকাশ্য সমাবেশে পুলিশ সরবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল। সেরুলোর হয়ে লিফলেট বিলোল পুলিশ। দু-হাজার স্বেচ্ছাসেবক, একশো নিজস্ব দেহরক্ষী ও বিশাল পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে সুসজ্জিত মঞ্চে সেরুলো এলেন। মঞ্চে হাজির ছিলেন সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল চার্চের বিশপ গড়াই ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁদের মধ্যে আছেন সরকারি পদাধিকারীরাও। অন্তত তিরিশ হাজার দর্শকের ভিড়। ভিড়ের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগই অন্ধ, মূক, বধির খঞ্জ, মানসিক প্রতিবন্ধী। শয্যাশায়ী রোগীও এসেছেন টেম্পো, মোটর, বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বর্ধমান, বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি থেকেও। যাত্রার অভিনেতার মতোই চড়া সুরের অনেক নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেরুলো এক সময় জনতার মধ্যে এনে দিলেন গণ-উন্মাদনা। উন্মত্ত জনতা দু-হাত তুলে আবেগমথিত স্বরে আওয়াজ তুলল, 'হালে লুইয়া'। সেরুলো জানালেন ঈশ্বরের দূতরা এই মুহূর্তে এই ময়দানে নেমে এসেছেন, প্রত্যেককে রোগমুক্ত করছেন। সেরুলোর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে স্বেচ্ছাসেবকরা এরপর এক এক করে রোগী তুলতে লাগল মঞ্চে। এরা প্রত্যেকেই রোগমুক্তির কথা বলতে লাগল। এক যুক্তিবাদী তামাম সাংবাদিক ও দর্শকদের সামনে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল, মঞ্চের রোগীরা প্রত্যেকেই সেরুলোর সাজানো রোগী, অর্থাৎ প্রতারক। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সেরুলো গর্জালেন, গর্জাল সেরুলোর দেহরক্ষীরা ও সেরুলোর পৃষ্ঠপোষক পুলিশ। অভিমন্যুর মতোই আটকা পড়ল মঞ্চের যুক্তিবাদী। দেহরক্ষীরা যুক্তিবাদীকে মঞ্চের মধ্যেই ঘিরে ফেলতে চাইল, একটু আড়াল, পেট ফেড়ে ফেল বা গলায় একটা পোঁচ—শব্দহীন মৃত্যু—গোলেমালে জনবিক্ষোভে মৃত্যু—বেনিফিট অফ ডাউট—হত্যাকারী কেউ নয়।

দর্শকদের মধ্যে রোগীদের মধ্যে মিশে থাকা যুক্তিবাদীদের হাতগুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিল প্রচারপত্র। মাঠ জুড়ে উড়তে লাগল প্রচারপত্র। পুলিশের ঢালের দেওয়াল ভেদ করে, স্বেচ্ছসেবক ও দেহরক্ষীদের প্রতিরোধের পাঁচিল চুরমার করে মঞ্চে উঠে আসতে লাগল যুক্তিবাদী তরুণরা। পুলিশের লাঠি নির্দয়ভাবে এসে আছড়ে পড়ছে যুক্তিবাদীদের শরীরে। যুক্তিবাদী কণ্ঠ মঞ্চের মাউথপিস ছিনিয়ে নিয়ে দাবিতে সোচ্চার হল—এই বুজরুকি পুলিশকেই বন্ধ করতে হবে, সেরুলোকে সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে, সেরুলোকে ও তার দলবলকে প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার করতে হবে। যুক্তিবাদীর সুরে সুর মিলিয়ে মঞ্চের ঠিক নিচে দাঁড়ানো সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকরা সোচ্চার হলেন। জনতা ক্ষুব্ধ উত্তাল। গোটা ময়দান যেন শুধু যুক্তিবাদী, যুক্তিবাদী আর যুক্তিবাদীতে ভরা। জনা পঞ্চাশ যুক্তিবাদী হত। তবু মঞ্চের দখল নিল ওরা। মঞ্চ থেকে সেরুলোর ভাড়াটে সেনারা বুকের ব্যাজ পকেটে পুরে দ্রুত জনতার মধ্যে মিশে যেতে তৎপর হল। যুক্তিবাদীদের প্রতিজ্ঞা কঠোর মুখগুলোর দিকে চেয়ে এ-ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ওদের। যুক্তিবাদী, সাংবাদিক ও জনতার মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া দাবিকে নত-মস্তকে মেনে নিয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মাইকে ঘোষণা করলেন—সেরুলোর বুজরুকি ধরা পড়েছে। আমরা ওকে আর বুজরুকি চালাতে দিতে পারি না। এখানেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, পুলিশরা হতবাক্ হল, এত বিশাল মাপের একটা সভা বন্ধ করতে যুক্তিবাদীরা না ছুড়ল বোমা, না চালাল গুলি। এল, বিশাল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জনগণ ও সাংবাদিকদের শক্তিকে নিজেদের সঙ্গে যূথবদ্ধ করল এবং সেরুলো ও পুলিশ বাহিনীর সম্মিলিত বিশাল শক্তিকে, বিরাট প্রতিরোধকে ভেঙে চুরমার করে জয় ছিনিয়ে আনল।

সে রাতেই উদ্বাস্ত খোদ লালবাজার পুলিশ বাহিনী খুঁজে বের করলেন যুক্তিবাদীদের নেতাদের। লালবাজারেই আলোচনায় বসলেন পুলিশের বড়-মেজ কর্তারা। যুক্তিবাদীদের দাবি মেনে নিয়ে গ্রেপ্তার করা হল সেরুলোর দুই সঙ্গীকে। সেরুলোকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হল। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখল সেরুলোকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করার জন্য। খোদ পুলিশ কমিশনার সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করলেন— এ'বার থেকে ভাগ্য পরিবর্তন বা অলৌকিক চিকিৎসার দাবিদাররা প্রকাশ্য-সমাবেশ

করতে চাইলে তাদের ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে যুক্তিবাদী সমিতির সামনে।

সেরুলোবাবার বিজয়রথের চাকা পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে, ভারতের মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এ-খবর গোটা দেশের প্রতিটি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হল, বিদেশেও পৌঁছে গেল। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার, স্টেটস্‌ম্যান, আজকাল ও সংবাদ প্রতিদিন-এ যুক্তিবাদীদের এই বিজয় নিয়ে সম্পাদকীয় পর্যন্ত প্রকাশিত হল।

সেদিনের আন্দোলন যুক্তিবাদীদের সামনে আরও একটি বিজয় এনে দিয়েছিল। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের নেতাদের হুইপ অমান্য করে সেরুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সেদিন ময়দানে যুক্তিবাদী সমিতির পাশে সমিতির আরও বহু সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন গণবিজ্ঞান সমন্বয়কেন্দ্রের কিছু সদস্য। হতে পারেন তাঁরা মুষ্টিমেয়, তবু গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের নেতারা এই খবর কাগজে পড়ে অবশ্যই হতচকিত হয়েছিলেন। যে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রকে আমরা চিঠিতে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েও পাইনি জ্যোতিষীদের বেআইনি সম্মেলনের বিক্ষোভে, হুজুর সাইদাবাদীর অলৌকিক রোগ নিরাময় ও মাতৃত্ব দানের দাবির বিরুদ্ধে আন্দোলনে, দূরদর্শন হুজুর সাইদাবাদীর অলৌকিক রোগ নিরাময় ও মাতৃত্ব দানের দাবির বিরুদ্ধে আন্দোলনে, দূরদর্শন কেন্দ্রের 'দ্যা ড্রাগ ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট' ভঙ্গ করে গ্রহরত্নে রোগমুক্তির পক্ষে প্রচার চালানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে। যে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের নেতারা কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই সমন্বয় কেন্দ্রের ব্যানার নিয়ে সেদিন কিছু ছেলে আন্দোলনে শামিল হয়ে নেতৃত্বের মেকি আন্দোলনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বেশ কিছু দিন ধরে পত্র-পত্রিকাগুলো যেভাবে সেরুলো নিয়ে প্রচুর নিউজ প্রিন্ট খরচ করলেন, প্রচুর কিছু লিখলেন তাতে গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের নেতারা জনগণ ও সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে অথবা জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাতে নিজেদের লাইন থেকে সরে এসে সেরুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে বাধ্য হলেন।

চার নভেম্বর '৯২ নতুন দিল্লি তোলপাড় করে পাইলটবাবা পাঁচ দিনের জল-সমাধি নিলেন একটি চৌবাচ্চায়। উদ্দেশ্য—বিশ্বশান্তি। বিহারের সাসারামের এই যোগী '৫৬ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ন্যাট ও হান্টার চালিয়েছিলেন। '৬৫-তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

দাবি করেন, ব্রহ্মের প্রথম দর্শন পান আকাশে বিমান চালানোর সময়। তারপর একাধিকবার ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। '৭৩ থেকে হিমালয়ে সাধনা করে '৮০-তে সিদ্ধিলাভ। এখন জীবন উৎসর্গ করেছেন বিশ্বশান্তির কাজে। '৮৪-তে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে ছিলেন সারা পৃথিবীতে শিষ্য সংখ্যা ১০ কোটি। আশা করা যায় এখন সংখ্যাটা আরও একটু বাড়িয়েই বলবেন। বর্তমান নিবাস বিকাশপুরী। বহু মন্ত্রী, রাজনীতিকরা তাঁর আশীর্বাদ নিতে ঘোরাঘুরি করেন। প্রধানত হিন্দি পত্র-পত্রিকায় পাইলটবাবা প্রচুর প্রচার পেয়ে সুপার স্টারের মর্যাদা অর্জন করেছেন। এমন এক বাবাজিও ছাড়া পেলেন না যুক্তিবাদীদের হাত থেকে। নতুন দিল্লির যুক্তিবাদীরাই চ্যালেঞ্জ জানাল পাইলটবাবাকে। বলল, চৌবাচ্চায় কৌশল রয়েছে, আর পাইলটবাবার রয়েছে বুজরুকি। কাচের চেম্বারে জলের নিচে দু-ঘণ্টা থেকে ক্ষমতার প্রমাণ দিতে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল যুক্তিবাদীরা। কাগজে-কাগজে বিশাল হইচই। পাইলটবাবা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসার মতো বোকা সাহস না দেখিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ধরে নিলেন। দেশের পত্রিকাগুলো সে খবরও প্রকাশ করল।

বাঘ, সিংহ জ্যোতিষীরা প্রকাশ্য সভায়, সম্মেলনে, লিখিতভাবে স্বীকার করতে শুরু করে দিলেন— 'জ্যোতিষ শাস্ত্র অবশ্যই বিজ্ঞান নয়, এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বলে প্রমাণিত হতে পারে, আবার নাও পারে।' যুক্তিবাদীদের কঠিন কঠোর আক্রমণের মুখে মান বাঁচানোর মতো এ-ছাড়া আর কোনও পথই ছিল না জ্যোতিষী চূড়ামণিদের। বারাসাতের তাবিজ বেচা ফকির, কৃষ্ণনগরের বিষ পাথরের পাদ্রি চিকিৎসক, মুর্শিদাবাদের ওঝা, ঝাড়গ্রামের গুণিন, কুইলনের ভরবিষ্ট মাধবী, কাঞ্চিপুরমের অলৌকিকবাবা, শিলচরের পির, কামরূপের তান্ত্রিক, কামাখ্যার ভৈরবী, আগরতলার ফুলবাবা, পুরুলিয়ার অবাক মেয়ে মৌসুমি, এমনি শত-শত বাবা-মা-ওঝা-ফকির-পাদ্রিদের বুজরুকি বন্ধ হয়েছে—হচ্ছে হবে যুক্তিবাদীদের হাতে। পৃথিবীতে আর কোনও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আন্দোলনের উপর বার বার আঘাত এসেছে নানা ভাবে। আর প্রতিবারই যুক্তিবাদীরা জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে কোয়ার্টার চান্সকেও কাজে লাগিয়ে এই আঘাত এসেছে অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের কাছ থেকে, জ্যোতিষীদের

তরফ থেকে, ধর্মোন্মাদদের কাছ থেকে, রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে, শাসক দলের কাছ থেকে, শোষক দলের কাছ থেকে, শাসক ও শোষক দলের দালাল পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছ থেকে, দালাল মেকি আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে। এই আক্রমণ কখনও এসেছে সরাসরি নেতাকে হত্যার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এক একটি লোমহর্ষক, পরিকল্পিত হত্যার প্রচেষ্টা এবং তাকে ব্যর্থ করা নিয়েই লেখা যেতে পারে কল্পনার চেয়েও আকর্ষণীয় উপন্যাস। কখনও বা চেষ্টা চালানো হয়েছে নেতার চরিত্র হননের। গল্পে, উপন্যাসে চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রবন্ধের নামে তথ্যের পরিবর্তে চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে সাহায্য করতে কোনও কোনও সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। একটি মনোরোগ চিকিৎসার ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে যুক্তিবাদী সমিতির বিশিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, ওই নেতা মাঝেমধ্যে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে ডিগ্রিটি ব্যবহার করেন তা জাল। ডিগ্রি ব্যবহার করা বা না করা যে ডিগ্রির অধিকারীর ইচ্ছাধীন এবং অতি-প্রয়োজনে ছাড়া কোনও ডিগ্রি ব্যবহার না করার অর্থ অনেক সময় যে 'অবৈধ' নয়, আন্দোলনের স্বার্থেই নিজেকে 'গুটিয়ে রাখার প্রচেষ্টা' বা 'বিনয়', এমন কথাটা আখের গোছানো মানুষদের কাছে মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়ার পর কলকাতা পুলিশের বড় কর্তা নিজেও কম বিস্মিত হননি ঈর্ষার এমন রূপ দর্শনে। ব্যক্তি ঈর্ষা থেকে, না হুজুরদের গোলামি করার মানসিকতা থেকে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করতেই এমন অভিযোগ আনা—কে জানে? অথচ বর্তমান সমাজে এত প্রতারণা, এত দুর্নীতি দেখেও সোচ্চার হতে, আন্দোলন করতে তো ওই ইনস্টিটিউটটিকে বা ইনস্টিটিউটটির প্রাণপুরুষটিকে দেখলাম না? দেখলাম না শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে একবারের জন্যেও সোচ্চার হতে! যা দেখেছি, সে তো প্রগতিশীলতার মুখোশের আড়ালে শাসকদলের চাটুকারিতা করে সরকারি সাহায্য আদায় করতে ও সরকারি পুরস্কার পেতে। একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে এ খবরও পেয়েছি ওই পত্রিকায় নাকি পত্র দিয়ে ওই ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ওই নির্দিষ্ট যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা জনৈকার শ্লীলতাহানিও করেছেন। কার শ্লীলতাহানি করা হল? তেমন কোনও নির্দিষ্টভাবে কারও নাম নাকি ছিল না। অভিযোগটি খাড়া করার মতো কোনও 'হাফ-গেরস্ত' এখনও পাওয়া যায়নি বলেই বোধহয় এখনও ওঁরা

কেসটা নিয়ে কোর্টে যাননি। দোসর হিসেবে বাজারে শ্লীলতাহানির গুজব ছড়াতে ওই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে হাতে হাত মেলাল আমেরিকা থেকে কল টিপে চালানো স্বঘোষিত বিজ্ঞানমনস্ক মাসিক পত্রিকা গোষ্ঠী। ওই মাসিক পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রাণ-পুরুষটি শুধুমাত্র হুজুরদের দালাল শ্রেণির লোক নন, পুলিশ বিভাগের পদস্থ অফিসারও। তবুও বেচারার ক্ষমতা হল না গুজবকে আইনের দরবারে হাজির করে চক্রান্তকে সার্থক রূপ দেওয়ার। সত্যিই, এদের বিরুদ্ধে কোনও ঘৃণাই উপযুক্ত নয়। সমাজের উপরতলায় বসে থাকা এই সমাজ-বিরোধীদের ভূমিকা ভাড়াটে খুনের চেয়েও ঘৃণ্য। এরা শুধু একজন ব্যক্তিকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মাতেনি, মেতেছে একটা আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে। ওই আন্দোলন ছেড়ে দিলে নিশ্চিতভাবেই এইসব আঘাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। আন্দোলন সঠিক পথে থাকলে নেতার উপর এই আঘাত অনিবার্য—এই কথাগুলো যুক্তিবাদীদের অজানা নয়। এ কথাও তাদের কাছে অজানা নয়— যে নেতা অর্থ, ভয় বা নারীদেহের কাছে নিজের আদর্শকে বিক্রি করে দিতে পারে, সেই নেতাকে কিনে আন্দোলনকে নিজেদের লেজুড় করতে শাসক ও শোষকদের তো কোনও অসুবিধে হওয়ার কথাই নয়? তবে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে লাগাম পরাতে বার বার শাসক-শোষক জুটি কেন ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়ে চলেছে? যুক্তিবাদী আন্দোলনের গতিই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব আপসহীন, নির্ভীক, সৎ সম্মিলিত বিশাল বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ শক্তি নিলেও লাগাতার জয় আনতে সক্ষম এবং এ লড়াই প্রতিটি সাধারণ মানুষের হক্ আদায় করার লড়াই—এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। এই সক্ষমতাই বিরোধী শিবিরে কাঁপন ধরিয়েছে। তাই নেতাকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করতেই চরিত্র হননের সেই পুরোনো খেলায় মেতেছে ওরা।

এই যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে দালাল শ্রেণির কয়েকজন তথাকথিত বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা গুজব ছড়াতেও সচেষ্ট হয়েছে— "উনি ভাববাদের পক্ষেও লেখেন, বিপক্ষেও লেখেন।" অথচ গুজব রটনাকারীরা খুব ভালোরকমভাবেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—ওই নেতা কোনও লোভ বা ভয়ের কাছে আদর্শ বেচেন না, অতএব ভাববাদী শিবিরের কাছে আদর্শ বেচারও প্রশ্নই ওঠে না। তবু ওঁরা গুজব ছড়ালেন, যদিও ওদের এও ভালোমতোই জানা,

ওই একই নামের আর এক স্বল্প-পরিচিত লেখকের অস্তিত্বের কথা—যিনি রামকৃষ্ণ মিশন (নরেন্দ্রপুর) থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত এবং মাঝে-মধ্যে অন্য পত্রিকায়ও ভাববাদী বিষয় নিয়ে অল্প-স্বল্প লেখা-লেখি করে থাকেন। ঘৃণ্য এই মিথ্যা গুজব ছড়াবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা সচেষ্ট হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ঘৃণায় গুজব রটনাকারীদের পক্ষ থেকে প্রমাণ হাজির করতে না পারার অপরাধে—এও আমরা দেখলাম। এটা 'গুজব-সংস্কৃতির' বিরুদ্ধে যুক্তিবাদেরই বিজয়।

যুক্তিবাদী আন্দোলন আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে, পেয়েছে নতুন গতিবেগ। এতাবৎকালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের থেকে ভিন্ন চরিত্রের এই আন্দোলনের নাম আমরা দিতেই পারি 'তৃতীয় আন্দোলন'। এতাবৎকালের প্রচলিত দুটি আন্দোলন ধারার একটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং অপরটি তথাকথিত প্রগতিশীল। এই দুই ধারার থেকে ভিন্নতর এই 'তৃতীয় আন্দোলন' ধারার মধ্যে রয়েছে একটি সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যা সরাসরি রাজনীতি, ভোট ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত নয়, কিন্তু রাজনীতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতাধারী।

প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত এবং প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত এই 'তৃতীয় আন্দোলন' আজ একই সঙ্গে আলোড়ন, বিস্ফোরণ এবং সংগ্রাম। এই আন্দোলনে যে স্বতঃস্ফূর্ততার জোয়ার এসেছে সেই জেয়ারের ঢেউ তীব্র আঘাত হেনেছে বর্তমান পচন ধরা সমাজের ভারসাম্যে।

দেশে যখন বিপ্লবের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে, তখন বিচ্ছিন্নতাবাদকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে যা অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয়, তা হল চেতনার অগ্রগতি, শোষণমুক্তির পথ খুঁজে পাওয়ার মতো চিন্তার স্বচ্ছতা—যা দিতে পারে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, যুক্তিবাদী আন্দোলন, তৃতীয় আন্দোলন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

অধ্যায় : সাত

'যুক্তিবাদ' একটা সম্পূর্ণ দর্শন, একটা বস্তুবাদী বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি : কুয়াশা কাটে, কাটে নেশা, আকাশের ঘষা-সূর্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়

আমার সম্পাদিত 'যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম' বইটির যে সমালোচনা 'দেশ' পত্রিকায় ৩ অক্টোবর '৯২ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বহু প্রশংসা অবিরল ধারায় বর্ষিত হলেও শুরুতে একটা খোঁচা ছিল। শিকড় সমেত 'যুক্তিবাদ'কেই লোপাট করতে চাওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল;

'বাদ' শব্দটা আমরা সাধারণত ইংরেজি 'ইজমে'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। 'ইজম' বলতে বোঝায় বিশেষ কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। যুক্তি কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না, হতে পারে কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছনোর একটা সোপান মাত্র। অবশ্য যুক্তিবাদ বলতে যদি এই বোঝায় যে, যে-কোনো চিন্তা, পথ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রথা, পদ্ধতিতে একমাত্র যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করেই গ্রহণ করতে হবে, তাহলে যুক্তিকে ধরে নিতে হবে (absolute), *অনপেক্ষ কিছু। কিন্তু দার্শনিক বিচারে তেমন কোনো পরম যুক্তি (গণিত এবং জামিতিক চিত্রের কথা বাদ দিলে) আছে কিনা সন্দেহ।'*

'যুক্তিবাদ' নিয়ে বাদানুবাদের এই জটটা ছড়িয়ে নিয়ে তারপর বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকব। প্রথমে দেখা যাক, 'বাদ' বা 'ism' ব্যাপারটা ঠিক কী? প্রথমত, জীবন ও জগৎ ঠিক কী রকম, সে-প্রসঙ্গে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতকে 'বাদ' বা 'ism' বলা হয়ে থাকে, যেমন বার্কলের 'Solipsism', হিউমের 'Agnosticism'। দ্বিতীয়ত, কোনও দার্শনিক মতের ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গিকেও 'ism' বলা হয়, যেমন 'Idealism', 'Realism' ইত্যাদি। আবার তৃতীয়ত, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জ্ঞানতত্ত্বগত উপায়কেও অর্থাৎ সোপানকেও 'ism' বলা হয়,

যেমন 'Empiricism', 'Criticism', 'Secpticism', দেকার্তের 'Rationalism' ইত্যাদি। এ-ছাড়াও আরও অস্ংখ্য অর্থে 'Ism' বা 'বাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সে-সব খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা এ-ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ 'যুক্তিবাদ কোনও স্বতন্ত্র বাদ নয়' বলে যাঁরা প্রচার করতে চান, তারাও তাঁদের কুযুক্তির অবতারণা করতে ওইসব খুঁটিনাটিকে ধর্তব্যে আনে না। অতএব 'যুক্তিবাদ' যে একটা 'বাদ' এটা প্রমাণ করতে আমরাও ও-সব খুঁটিনাটিকে আলোচনার বাইরে রাখছি।

'বাদ' বা 'ism' বলতে গিয়ে 'তৃতীয়ত' বলে যে 'বাদ'—এর ব্যাখ্যা হাজির করেছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপানকেও 'বাদ' বা 'ism' বলা হয়। যুক্তি যেহেতু কোনও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপান, অতএব 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'ism' । কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ 'যুক্তিবাদ' কে একটি 'বাদ' বলে চালাতে পারাটাই বড় কথা নয়। বরঞ্চ আমরা দেখাতে চাই 'বাদ' বা 'ism' বলতে 'প্রথমত' ও 'দ্বিতীয়ত' বলে যে ব্যাখ্যা দুটি হাজির করেছি সেই দুই অর্থেও 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'ism'। অর্থাৎ

'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়, 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

কেন? কী ভাবে? উদাহরণ দিই।

লজিক বা তর্কশাস্ত্র আজ বহুদূর এগিয়েছে। একে এখন প্রায় বিশুদ্ধ গণিতের মতোই একটি আলাদা বিষয় বলে ধরা যায়। জটিলতাও এখন বহুদূর বিস্তৃত। তবু আমাদের আলোচনায় সরলতম উদাহরণটি নিলেই যথেষ্ট। তর্কশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কায়দা-কানুনকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হল ডিডাকশন বা অবরোহ, আর একটা ইন্ডাকশন বা আরোহ। এ সমস্তই একেবারে টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার, অনেকে হয়তো জানেনও। তবু যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য যেটুকু না বললে নয়, সেটুকু আলোচনাই করছি।

অবরোহ হল কোনও ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছনোর কায়দা। ধরুন, বলা হল "সব মানুষই মরণশীল"। তারপর বলা

হলো "রামবাবু একজন মানুষ।" এই দুটো বাক্য থেকে কী বেরিয়ে আসে? অনিবার্যভাবে, "রামবাবু মরণশীল"।

সিদ্ধান্তটি সঠিকই হয়েছে। এ-বার পদ্ধতিটা বিশ্লষণ করি আসুন। কী পাচ্ছি? রামবাবু একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যে কোনও একটা তাঁকে হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্যের বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ রামবাবু মানুষ নন। কিন্তু রামবাবু মানুষ হলে তার মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক্ষেত্রে "সব মানুষ মরণশীল" —এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। অতএব এটা বহুর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে একের সিদ্ধান্তে নেমে আসছি, এটা অবরোহমূলক যুক্তি।

তাহলে উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, অবরোহ যুক্তির পিছনে আছে আত্মবিরোধিতা বা স্ববিরোধিতা না করার নীতি (Law of non-selfcontradiction)। আর তারও পিছনে আছে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি— "জগৎ-সংসার স্ব-বিরোধী নয়'। কারণ, তা না হলে স্ব-বিরোধিতা করলেও যুক্তি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

এই গোড়ার কথাটা মাথায় রেখে আরোহমূলক যুক্তির আলোচনায় আসুন। নিচের কয়েকটা বাক্য মন দিয়ে লক্ষ করা যাক:

'ক' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'খ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'গ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'ঘ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

এমনি করে শ'খানেক পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া বাবুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল তাঁরাও পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। সুতরাং এই একশো জনের উপর চালানো পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা চলে, "সম্ভবত, যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায় সেই মরে"।

যত বেশি লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হবে, ততই সিদ্ধান্তটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

এই যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলাম? এখানে আমরা অবরোহ যুক্তির উল্টোভাবে কিছু বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কে পাওয়া কিছু তথ্য থেকে একটা সাধারণ বা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। এটাই হল আরোহমূলক যুক্তি।

বিশ্লেষণ করা দরকার একেও। কী বেরিয়ে আসে বিশ্লেষণে? সব ঘটনারই কারণ থাকে, এবং কারণটি অবশ্যই ঘটনার আগে ঘটবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পটাশিয়াম সায়ানাইডকে মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত করা হল। গোটা পদ্ধতিটার পিছনে রয়েছে কয়েকটি মৌলিক বিষয়। প্রথমত, প্রত্যেক ঘটনার একটি কারণ রয়েছে (Law of causation), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে মৃত্যুর আদৌ কোনও কারণ আছে কি না তাই নিয়ে ধন্ধে পড়তে হত এবং তার পূর্ববর্তী কোনও ঘটনার মধ্যে কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসত না।

দ্বিতীয়ত, একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে (Law of uniformity of nature), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে গাদা গাদা লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও একই পরিস্থিতিতে অন্য লোক মরবে কি না সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া যেত না।

এবং তৃতীয়ত, অনুসন্ধান করলে প্রতিটি ঘটনার কারণই সম্পূর্ণ বোধগম্য হতে বাধ্য, এই প্রত্যয়। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্য-কারণে বিশ্বাস করলেও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক পা'ও এগোনো সম্ভব হবে না। আপনি যদি ভাবতে থাকেন, যে মৃত্যুর কারণ থাকলেও তা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে বিষ বা ওই জাতীয় কোনও বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খুঁজে বেড়ানোর কথা মাথাতেই আসা উচিত নয়।

সবচেয়ে গোঁড়া ভাববাদীও এ-সব মেনে না চললে কোনও কাজই করতে পারবেন না। সুতরাং মুখে অন্য কথা বললেও বাস্তব জীবনে তাকে এ-সবই মাথায় রাখতেই হয়।

তাহলে এ-বার আলোচনাটা গুটিয়ে নিই। আরোহ বা অবরোহ—যে ধরনের যুক্তিই আমরা প্রয়োগ করি না কেন, কতকগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়—যেমন, স্ব-বিরোধিতা চলবে না, প্রতিটি ঘটনার কারণ খুঁজতে হবে, কারণগুলো সর্বজনীন হবে এবং তাকে বোঝাও যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন—কার স্ব-বিরোধিতা করা বা না করা? কীসের ঘটনা? কীসেরই বা কারণ? একই কারণ একই ফল দেবে, এটা কার সম্পর্কে, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে? কার্য-কারণ, তার সর্বজনীনতা, তার বোধগম্যতা কি শূন্যে দাঁড়িয়ে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ছে? তা হতে পারে না। বরঞ্চ এইসব সম্পূর্ণ তাৎপর্য তখনই পায়, যখন এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ-গুলো চিন্তা করি। এবং যে কোনও সফল, সার্থক, ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকাল তাইই করে আসছে। যুক্তিবাদ তাই আসলে বস্তুবাদই।

বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া লজিক একেবারেই দাঁড়ায় না। সেই জন্যেই ভাববাদী চিন্তা-ভাবনায় নিখুঁতভাবে লজিকের পদ্ধতি-প্রকরণ প্রয়োগ করলেও স্ব-বিরোধিতা এড়ানো যায় না, যায় না জীবনের সমস্ত দিকের সঙ্গে তার সমন্বয়-সাধন করা। তাই বস্তু-পরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একমাত্র বিমূর্ত চিন্তায় ছাড়া অন্য কোথাও আমরা তাকে অবহেলা করতে পারি না।

যুক্তিবাদ তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মমগ্নতা ও বহির্মুখিনতা উভয়েরই সঙ্গী। **'যুক্তিবাদ' মানে একটা গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একমাত্র স্ব-বিরোধিতাহীন জীবন-দর্শন।**

'যুক্তিবাদ' শব্দটি যখন যে কোনও যুক্তির নিরিখে সুচিন্তিতভাবে একটি 'ism' বা 'বাদ' তখন 'দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচক শ্রীসমীর চৌধুরী কেন এমন কিছু কথা লিখলেন যার দ্বারা তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্তিই প্রকট হয়ে উঠল? এমন চূড়ান্ত ভ্রান্ত বক্তব্য কেমনভাবে সম্পাদক দ্বারা প্রকাশের ছাড়পত্র পেল? তবে কি জন-মানসে যুক্তিবাদের প্রভাব দ্রুত-বর্ধমান দেখে এই 'বাদ'কে ঠেকাতে শঙ্কিত যন্ত্রীরা সমালোচককে যন্ত্রের মতোই কাছে লাগিয়েছেন, এবং এ-ক্ষেত্রে সমালোচকের ভ্রান্তিগুলো নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক? আর সর্বশেষ সম্ভাবনাই অত্যধিক, কারণ **'যুক্তিবাদ' হল সেই সামগ্রিক জীবনদর্শন যার সাহায্যে বঞ্চিত মানুষরাও তাদের বঞ্চনার কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে, আর এর মধ্যেই তো রয়েছে শোষক শ্রেণির সর্বনাশের বীজ।**

'যুক্তির দ্বারা বিচার' বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' বলতে আমরা সাধারণত পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোকে বুঝি। কিন্তু বাস্তবে জিজ্ঞাসু মনের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের আগে বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করার একটু আগে থেকেই অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ, অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে আমরা একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মনে মনে খাড়া করি। এবং এই আনুমানিক সিদ্ধান্তই আমাদের পথ বাতলে দেয়, আমরা বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে অবতীর্ণ হব কি না, বা হলে কী ভাবে? কোনও পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে নামার আগের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়কে Logic বা ন্যায়শাস্ত্রে বলে হাইপোথিসিস্ (Hypothesis) বা প্রকল্প। অনুসন্ধানের এই পর্যায়টির কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। বরং বলা চলে এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত আসে অনেকটাই পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যা অনেকটাই ইনট্যুইটিভ

(intutive) বা স্বজ্ঞাত, অর্থাৎ সচেতন বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে জানা। এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের পিছনকার প্রক্রিয়াটি এমনই দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্ত ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক যে প্রায়ই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এই হাইপোথিসিস্-এর গুরুত্ব যুক্তি বিচার ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে হাইথিসিসের পর্যায়কে বাদ দিলে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সতর্কতা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও তার পরিণতি হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টা পরিষ্কার করতে একটা উদাহরণ হাজির করতে পারি। আমার বন্ধুর একটি লেখার উদাহরণ এখানে দিলাম, উদাহরণটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। কিন্তু আমি নিশ্চিত—একটু ধৈর্য ধরে পুরোটা পড়ে ফেললে যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় পর্যায় 'হাইপোথিসিস্' বা 'প্রকল্প' বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"মনে করুন, কোনও এক 'ক' মশায়ের হঠাৎ মনে হল যে তাঁর পাশের ফাঁকা চেয়ারটিতে একজন মানুষ বসে রয়েছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না, যেহেতু তার শরীর একেবারে স্বচ্ছ কোনো অজানা পদার্থ দিয়ে তৈরি। যেহেতু 'ক' বাবু বিজ্ঞানের খোঁজ খবর রাখেন না, তিনি দারুণ সংশয়াকুলভাবে কথাটা তাঁর বন্ধু 'খ' বাবুকে বললেন, যিনি কি না বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু 'খ' বাবুও এমন কোনো বস্তুর কথা ছাত্রজীবনে পড়েছিলেন বলে মনে করতে পারলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের (এবং সামগ্রিকভাবে মনুষ্যজাতির) জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ, সুতরাং তিনি স্থির করলেন যে এবিষয়ে চটজলদি কিছু বলাটা ঠিক হবে না। তিনি আরও ভাবলেন যে, লোকটি নিশ্চয় একদম চুপচাপ বসে আছে এবং তার দেহযন্ত্র এমনভাবে তৈরি যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের দরকার হয় না, কারণ তা নাহলে নাড়াচাড়া শ্বাসক্রিয়ার শব্দ পাওয়া যেত। প্রচণ্ড বিভ্রান্ত হয়ে 'খ' বাবু তাঁর এক ফিজিক্সে পি-এইচ-ডি করা এবং গবেষণারত আত্মীয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা সবিস্তার বর্ণনা করলেন। সেই আত্মীয় একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিজ্ঞানী, তিনি নিজের চোখে না দেখে কিচ্ছুটি বিশ্বাস করেন না। তিনি সরেজমিন তদন্তে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন যে, যা বলা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাবরেটরি থেকে জিনিসপত্র আনিয়ে, প্রচণ্ড সতর্কভাবে, একজন সত্যিকারের সিরিয়াস ও নিরলস বিজ্ঞান কর্মীর মতো দু'টি এক্সপেরিমেন্ট করলেন। প্রথমত, চেয়ারের ধার কাছ থেকে মেঝের কাছ ঘেঁষে কিছু বায়ু সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখলেন তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অনুপাত একেবারে

স্বাভাবিক, অর্থাৎ চেয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে শ্বাসপ্রক্রিয়া ঘটেছিল বা ঘটছে এমন প্রমাণ নেই। এই ফলাফল 'খ' বাবুর অনুমানকে সমর্থন করে, কারণ 'খ' বাবু সন্দেহ করেছিলেন অদৃশ্য লোকটির শ্বাসক্রিয়া হয় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি ঐ গোটা চেয়ারটিকে বিদেশ থেকে আনানো উঁচুমানের নিখুঁত স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে ওজন করলেন; ফলাফল দেখে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। কী আশ্চর্য? ওই চেয়ারটির ওজন একেবারে একটি চেয়ারের ওজন যা উচিত, ঠিক তাই— একচুল বেশি বা কম নয়। তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে হয় লোকটির ভর শূন্য বা প্রায় শূন্য, অথবা তার শরীর এমন কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি যার ওপর মাধ্যাকর্ষণের কোনো ক্রিয়া নেই। এবং শীঘ্রই যে বিজ্ঞানের জগতে একটি বিপুল আলোড়ন ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করে তিনি যারপরনাই রোমাঞ্চিত হলেন। আর, প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতো উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলো বার বার করে নিঃসংশয় হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। পরবর্তী ঘটনাবলি আরও সুদূরপ্রসারী। সেই ভদ্রলোক এক স্বনামধন্য প্রফেসরের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বললেন। প্রোফেসর নিজে গিয়ে সবকিছু দেখে শুনে ইন্টারন্যাশনাল বায়োফিজিসিস্ট ও বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টদের দু'খানা চিঠি লিখলেন। তখন পাঁচজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি হল। তাঁরা এসে অতি সূক্ষ্ম এক্সরে স্ক্যানার ও কম্পিউটার চালিত স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে কোনও সজীব কোষ-কলা বা অস্থি-মজ্জার সন্ধান পেলেন না। শেষ পর্যন্ত এক যুগান্তকারী রিপোর্টে যা লেখা হল তার সারমর্ম এই : "যদিও আমাদের বর্তমানে সংগৃহীত জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে এমন কথা বলা যাচ্ছে না যে, সাধারণ আলোক ও এক্সরে-র সাপেক্ষে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং প্রায় ভরশূন্য কোন সজীব অস্তিত্ব সম্ভবপর (বিশেষত এমনকী শ্বাসক্রিয়াও যেখানে অনুপস্থিত), তবু আমরা মনে করছি যে এ সম্পর্কে শেষ কথা বলতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধানের দরকার আছে। সঠিকতম সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য আমরা অসীম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি, এবং প্রত্যেক বিজ্ঞানমনস্ক লোকই তাই, আমরা আশা করি। আমরা এব্যাপারে পৃথিবী-ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।" এনিয়ে পৃথিবীর সমস্ত নামী কাগজেই লেখালেখি হল, শুধু দু'একটি ভারতীয় কাগজ দুঃখ প্রকাশ করল যে, প্রথম থেকেই এব্যাপারে একাধিক ভারতীয়ের নাম জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কৃতিত্বটাই পেলেন বিদেশি বিজ্ঞানীরা।

আমার একান্ত ধারণা, যে উপরিউক্ত উদাহরণটি পড়ে যে কোনও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই বলবে যে, গুণমানের দিক থেকে উল্লেখিত গবেষণাটি অতিশয় ওঁচা ধরনের। কিন্তু কথা হল, এখানে ক্রুটিটা কোথায়? প্রত্যেকেই জ্ঞানীগুণী, বিনয়ী ও পরিশ্রমী, যে ক'টি এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে প্রতিটাই প্রাসঙ্গিক, পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উঁচুমানের এবং সেগুলো ঠিকই ফলাফল দিয়েছে, এমনকী, ফলাফল থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোও সবই যুক্তিসম্মত ও সম্ভাব্য।"

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলতেই পারেন—চেয়ারে একটি অদৃশ্য মানুষ বসে আছে এরকম সন্দেহ করা হল কেন? সেই এইচ জি ওয়েলস্-এর 'দি ইন্‌ভিজিবল ম্যান' উপন্যাসে যে ধরনের অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটেছিল, তা যদি না ঘটে তাহলে একজন সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, স্বাভাবিক মানুষ এই ধরনের বিদ্‌ঘুটে সন্দেহ শুধু শুধু করতে যাবে কেন? এই প্রশ্নের উদয় হলেই অমন নিরলস গবেষণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গবেষকের চিন্তায় এই প্রশ্নটিই গবেষণায় নামার আগে খোঁচা দেয়, এটাই হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তিসম্মত অনুসন্ধানের প্রথমতম পর্যায়—হাইপোথিসিস্ বা প্রকল্প। হাইপোথিসিস্ বা প্রকল্পটি যদি ভুল বা ভিত্তিহীন হয় তবে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পথ ধরে এগুলোও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাস্যকর পরিণতি ঘটতে পারে। এতক্ষণ যে কাল্পনিক উদাহরণটি আপনাদের কাছে হাজির করলাম, তাতে গবেষক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেও সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছে, কারণ হাইপোথিসিস্‌টাই ছিল ভিত্তিহীন।

এতক্ষণ আলোচনার পর তাহলে আমরা কী পেলাম? সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম— বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেমন হাইপোথিসিসস্ বা প্রকল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনই যুক্তির আগেও অত্যন্ত মৌলিক ধরনের কিছু হাইপোথিসিসের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে আনলে পাচ্ছি যুক্তি মানে কেবলমাত্র লজিক বা তর্কশাস্ত্র নয়। যুক্তি মানে লজিক এবং সেই বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি যা লজিককে সম্ভবপর করে তোলে। এই অর্থে যুক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ logic হবে না, হবে reason বা rationality। সুতরাং যুক্তির সঙ্গে বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি বা বস্তুবাদের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

যদি আমরা ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও সমস্তরকম চেতনার আবির্ভাব এবং বিকাশের বিষয়টা ভেবে দেখি, দেখতে পাব, যখন আমরা যুক্তি প্রয়োগ করি, তখন একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই করি। অর্থাৎ, যুক্তি মেনে চললে অবস্তুবাদী হওয়া যায় না।

সেই আদিম যুগে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যখনই আমরা হাতিয়ার ব্যবহার করেছি, সেই হাতিয়ার গাছের ডাল হলেও তাকে আমরা ঘষে ছুঁচোলো করেছি, পাথর ঘষে ধারালো অস্ত্রের রূপ দিয়েছি। প্রয়োজনের তাগিদে এই অস্ত্রকে আরও উন্নততর করতে চেয়েছি। যতই পরিবেশকে বেশি বেশি করে বুঝেছি, বেশি বেশি করে চিনেছি, ততই সচেষ্ট হয়েছি প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করতে, সামাজিক পরিবেশকে পাল্টাতে। পরিবেশকে যেমন আমরা পরিবর্তন করেছি, একই সঙ্গে পরিবেশও আমাদের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাস্তবকে যত ভলোভাবে চিনতে পারছি, বুঝতে পারছি ততই আমাদের পরিবেশকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা যাচ্ছে বেড়ে, এবং প্রকৃতিকে আরও বেশি পরিবর্তিত করলে প্রকৃতিকে আরও বেশি নিখুঁত ভাবে চেনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। আরও বেশি করে চেনা ও বোঝার জন্য ক্রমশ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজন হল শ্রেণি বিভাজনের। এখানেই বস্তু থেকে ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনে সৃষ্টি হল বিমূর্ত চিন্তনের। এইভাবে বিমূর্ত চিন্তনের সাহায্যে সৈন্য-সামন্ত ও সম্পদ গণনার জন্য সৃষ্টি হল পাটিগণিতের, জমির মাপ-জোকের জন্য জ্যামিতি ও শস্য উৎপাদনের স্বার্থে ঋতু পরিবর্তনের হিসেব রাখতে গিয়ে সৃষ্টি করা হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। সুতরাং যুক্তি-গণিত-বিজ্ঞান আসলে আমাদের লড়াই করে বেঁচে থাকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে।

এরপরেও অবশ্য একটা গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। যুক্তি মেনে চললে যদি বস্তুবাদী হতেই হয়, তবে যুক্তি মেনেও এত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা ভাববাদী হন কী করে? ভাববাদী দার্শনিকেরাও তো কাঁটায় কাঁটায় যুক্তি মেনেই আলোচনা চালান! ভাববাদী দার্শনিকদের যুক্তিগুলো কেমন, একটু দেখা যাক। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো মত প্রকাশ করেছিলেন—আমরা যে জগৎটা দেখছি যে বস্তু সকল দেখছি বলে মনে করি, তা সবই বাস্তবতাহীন, নকল বিমূর্ত ধারণার জগৎই আসল এবং চিরন্তন। আঁরি বের্গ্সঁ, ব্রাডলের মতো বিশ্ববিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকরা মনে করতেন— জগতের স্বরূপ যুক্তিসিদ্ধ বিচার

বিশ্লেষণের দ্বারা পাওয়া বা বোঝা সম্ভব নয়। তাঁদের বক্তব্য—যুক্তি ব্যাপারটাই কোনও কাজের নয়। যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ কোনও পথ দেখাতে পারে না। যুক্তির যুক্তিহীনতা এবং যুক্তির বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বোঝাতে গিয়ে এইসব প্রচারে অতিবিখ্যাত দার্শনিকেরা অসহায়ভাবে যুক্তি-তর্কেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা দার্শনিক আলোচনায় এক আলো-আঁধারি, আধা-মিস্টিক রহস্যে ঘেরা পরিবেশ তৈরি করেন। অনেকে লজিকের সাহায্য নিয়ে জগতের এক অবাস্তব মডেল তৈরি করেন। যেমন ভাববাদী দর্শনের এক কর্ণধার বার্কলে বলেছিলেন, এই জগৎ সংসারে বস্তু-টস্তু কিছু নেই, সবই আমাদের নিজেদেরই মনের ধারণা। বস্তুর যে স্বরূপ তাঁর অজানা, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অজানা ঈশ্বরেরও আমদানি করেছিলেন। অজানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিসকে ব্যাখ্যার চেষ্টা অর্থহীন এবং হাস্যকর।

অন্যদিকে আর এক দল আছেন, যাঁরা নিজেদের সোচ্চারে যুক্তিবাদী বলে ঘোষণা করেন, যুক্তির গুরুত্ব বোঝেন এবং প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকে মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু যুক্তি বলতে এঁরা শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রকেই বোঝেন, বোঝেন যুক্তি-তর্কের কিছু প্যাঁচ-পায়জার। ফলে এই শ্রেণির যুক্তিবাদীরা আকারগত তর্কশাস্ত্রের কিছু উন্নতি ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করেন না। যেহেতু বস্তুর গুণ বা ধর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, সেহেতু তাঁরা। কেবলমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য সমূহের খোঁজে জীবন কাটিয়ে দেন।

'গুণ ও ধর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়' শব্দ'কটির অর্থ কারো কারো কাছে কঠিন ঠেকতে পারে বিবেচনায় দু-কথায় কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। ধরা গেল একটা ছোট রবারের বল আপনার হাতে তুলে দেওয়া হল। আপনি বলটা টিপে অনুভব করলেন না নরম, না শক্ত। আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী একটি মানুষের হাতে বলটি তুলে দিলে সে বলটিকে আপনার অনুভূতির তুলনায় অনেক বেশি নরম অনুভব করবে। আবার একটি শিশুর হাতে বলটি তুলে দিলে তার মনে হবে বলটা যথেষ্টই শক্ত। অভিনেতা হিসেবে মিঠুনকে যেমন মিঠুন-ফ্যানরা দুরন্ত ভালোবাসে, তেমনি অনেকের কাছেই মিঠুনের অভিনয় অসহ্য ঠেকে। মাধুরী দীক্ষিতকে অনেকে সৌন্দর্যের রানি বলে প্রচণ্ড রকম মাতামাতি করলেও আমিই তো মাধুরীর সৌন্দর্যে তেমন কিছুই খুঁজে পাই না। এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পেলাম—কোনও কিছুর গুণ বা ধর্ম ব্যক্তি বিশেষে ভিন্নতর, অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। ভাববাদীরা এই সুযোগে সিদ্ধান্ত নেন যে-বস্তুর অস্তিত্বটাই মনের ধারণার উপর নির্ভরশীল। আবার সেই জায়গায় যান্ত্রিক-বস্তুবাদীরা বস্তুর ব্যক্তিসাপেক্ষ

বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনও কিছুর তল্লাশে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। আসলে আপনি আমি যেটাকে দেখছি, শুনছি বা যার ঘ্রাণ নিচ্ছি, অথবা যাকে স্পর্শ করছি সেটা আসলে আপনার আমার সঙ্গে বস্তুর একটা পরিবর্তনশীল বাস্তব সম্পর্ক। আমি একটা পাতার রং যে ভাবে দেখছি, সেটা যেমন বাস্তব, একজন বর্ণান্ধ যখন পাতাটার রংটিকে ভিন্নতর ভাবে দেখছে, সেটাও সমানভাবেই বাস্তব। আবার বিশুদ্ধ জল পান করার পর যে আমি কোনও স্বাদ পাচ্ছি না সেটা যেমন বাস্তব, তেমনি খানিকটা খয়ের বা আমলকী চিবোনোর পর সেই আমার কাছেই জল মিষ্টিমিষ্টি লাগছে এও কিন্তু বাস্তব।

আমার সঙ্গে একজন বর্ণান্ধের যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই আমলকী খাওয়ার আগের আমির সঙ্গে পরের আমিরও পার্থক্য আছে। সুতরাং একই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে। কোনওটার থেকে কোনওটা কম বা বেশি বাস্তব নয়। সুতরাং পার্থক্য আছে বলে বাস্তব অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া যেমন পাগলামি, তেমনই অর্থহীন হল শুধুমাত্র ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করার চেষ্টা, কারণ ওইরকম কোনও কিছু আসলে নেই। একই লোক যেমন একই সঙ্গে একই সময়ে কারুর বাবা, কারুর ভাই, কারুর ছেলে, কারুর জামাই, কারুর মেসোমশাই হতে পারে, তেমনই একই বস্তু একই সময়ে কারুর কাছে শক্ত, কারুর কাছে নরম, কারুর কাছে উজ্জ্বল, কারুর কাছে অনুজ্জ্বল ইত্যাদি হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সবই যদি এইভাবে বাস্তব হয় তাহলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তি কী হবে? একটু ভাবলেই বোঝা যায়, "অমুক বস্তুর অমুক ধর্ম শাশ্বত ও চিরন্তন"—এই লাইনে যে কোনও অনুসন্ধান মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। বরঞ্চ বলতে হবে—"অমুক পরিস্থিতিতে অমুক বস্তু অমুক ধর্ম দেখাবে", কারণ ধর্ম (Properties) ব্যাপারটা আসলে একটি সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। এই সম্পর্কে পরিবর্তন সমূহের মধ্যেকার খুঁটিনাটি নিয়মকানুন অধ্যয়ন করা, তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র খুঁজে বার করা এবং তার দ্বারা অজানা পরিস্থিতিতে কী বস্তুধর্ম দেখা যাবে তা আঁচ করা— এই হল বিজ্ঞানের কাজ। আর এ-ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জুগিয়ে বিজ্ঞানকে বিপথগামী না হতে দেওয়া এবং সৌন্দর্যবোধ ও নীতিবোধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপন করা—এই হল দর্শনের কাজ। এ-ছাড়া আর কোনও কাজ তাদের নেই।

কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার ফলে যান্ত্রিক-বস্তুবাদীরা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বা সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু-ধর্ম খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে

থাকেন। অথচ এই শ্রেণির যুক্তিবাদী পণ্ডিতরা সাধারণভাবে যেহেতু বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে সবিশেষ উৎসাহী, ফলে এঁদের কাছে বস্তু হয়ে দাঁড়ায় কিছু গাণিতিক সমীকরণমাত্র। ফলে শ্রোয়েডিঙ্গারের "Mind and Matter" —এর মতো ভাববাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় প্রাগ্‌মাটিক দর্শনের। এই দর্শনের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল, এই দর্শনে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা বুঝে উঠতে পারেন না, এই নৈর্ব্যক্তিক, খণ্ডিত বিশ্ব নিরীক্ষণ পদ্ধতি তাঁরা সমাজজীবনে কীভাবে কাজে লাগাবেন, কী ভাবেই বা তা দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলোর। ফলে এই ধরনের দর্শনে বিশ্বাসী মানুষরা হয় তাত্ত্বিকভাবেই ভাববাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, আর না হয় ব্যক্তিগত জীবনে সুবিধাবাদের আশ্রয় নেন। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ তথাকথিত বিশিষ্ট 'বস্তুবাদী' ইংরেজ দার্শনিক—ডেভিড হিউম। তাঁর দার্শনিক আলোচনায় তিনি আত্ম ও ঈশ্বরের ধারণাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশী হিউমকে বলেন, হিউম যদি বিশ্বাস করতেন যে আত্মা অবিনশ্বর, তাহলে হয়তো তাঁর মায়ের দেহ শেষ হয়ে গেলেও আসলে এখনও মায়ের অস্তিত্ব আছে— এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেতে পারতেন। কিন্তু অবিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সে সান্ত্বনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।

তখন শোকাভিভূত হিউম মন্তব্য করেন, দার্শনিক আলোচনায় তিনি হয়তো অনেক কিছুই প্রমাণ করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস সাধারণ মানুষের থেকে এমন কিছু আলাদা নয়। আত্মার অবিনশ্বরতায় তিনিও বিশ্বাসী।

যেহেতু ভুল বোঝার কোনও সুযোগই রাখতে চাই না, অতএব আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা কিন্তু হিউমের ব্যক্তিগত স্ববিরোধিতা বলে আমরা মনে করি না। বরঞ্চ ঘটনা হল, যে এটা তাঁর দর্শনের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসছে। রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ প্রমুখ ধর্মীয় প্রবক্তাদেরও অনেকে দার্শনিক বলে থাকেন। কেন বলেন তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে চূড়ান্ত অযৌক্তিক এবং কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এর বিরোধিতায় কিছু জায়গা এবং সময় খরচ করতেই হচ্ছে, যেহেতু এ ব্যাপারে প্রচারটা বেশ শক্তিশালী, তাই মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাও যথেষ্টই বেশি। নামীদামি লোক থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা,

পানের দোকানের মালিক-কাম-দোকানদার পর্যন্ত হরেক কিসিমের লোককে চোখ উল্টে বলতে শুনেছি—রামকৃষ্ণ? বাপ্‌রে বাপ্‌! দার্শনিকের বাবা!

কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, ভাববাদী বা যান্ত্রিক বস্তুবাদী দার্শনিকরা যে অর্থে সফল দার্শনিক (তাঁদের মতামত গ্রহণ করছি কি না সেটা অন্য প্রসঙ্গ), এই অধ্যাত্মিক প্রবক্তারা সেই অর্থেও দার্শনিক নন। এঁরা আদৌ কোনও স্বতন্ত্র, স্পষ্ট, সুষ্ঠু চিন্তাতন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন না, কোনও রকম প্রমাণ, ব্যাখ্যা, যুক্তিতর্কের ধারকাছ দিয়েও হাঁটেন না। এঁদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে ভিত্তি করে 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু', 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা', 'উক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠমার্গ', 'আত্মাই সত্য', ইত্যাদি অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচিত্র ঢঙে ও ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ভঙ্গিতে বলা। এসব 'গোলা' কথার বিরুদ্ধে নানা বইতে, নানা আলোচনায়, সমিতির নিয়মিত শিক্ষাচক্রে বারবার আমরা যুক্তির আক্রমণ চালিয়েছি, কিন্তু আপাতত বলার কথা শুধু এইটা যে, এঁরা দার্শনিক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্যই নন; মতামতের মূল্যায়ন তো পরের কথা। তবে আলোচনার পদ্ধতির দিক থেকে না হলেও দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের দিক থেকে এঁরা ভাববাদী দার্শনিকদের মনের মানুষ। এখানে একটা কথা বলে নিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতি সাম্প্রতিক কালের 'ভাষা-দার্শনিক' নামক পাশ্চাত্য দার্শনিকগোষ্ঠীর মতে পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বই নাকি আসলে ভাষার মার-প্যাঁচ, এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের দ্বারা আলোচিত নানা সমস্যাবলি আসলে দর্শনের সমস্যাই নয়, ব্যাকরণের সমস্যা। তর্কবিশারদ দার্শনিকদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ দাঁড়াবেন কোথায় সেটা ভাববার বিষয়।

সে যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে অধ্যাত্মবাদী নেতারা কিন্তু যাকে বলে 'রাইজিং টু দি ওকেশন্‌' তাই করে দেখাচ্ছেন। তাঁরা যান্ত্রিক বস্তুবাদের নানা ফাঁকফোকরকে কাজে লাগাচ্ছেন ভাববাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। আর এছাড়াও আধুনিক পদার্থবিদ্যার নানা জটিল, বিতর্কিত বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পরিভাষা চয়ন করে ধোঁয়াশায় ভরা সস্তা ধরনের দাশনিক ব্যাখ্যা আরোপ করে দাবি করছেন, আধুনিক বিজ্ঞান ভাববাদেরই সমর্থক। এ ব্যাপারে মদত দিচ্ছেন কতিপয় অ্যানিমিয়াগ্রস্ত মূল্যবোধহীন পেশাদার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। এঁরা হাতে গ্রহরত্নের আংটি পরেন, নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক-পুজো-আর্চা করেন এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরীক্ষা যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য সদলবলে পুজো চড়ান। অনেকে বলেন, তাঁরা এছাড়া আরও অনেক কিছুই করেন।

যথা— মৌলিক গবেষণা বাদ দিয়ে আমলাতান্ত্রিক পদ লাভ করার জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি (ও বসের পায়ে তৈলমর্দন)।

একটা মজার ঘটনা বলি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে একদিন দেখলাম এক আজগুবি জিনিস। আমার একজন পরিচিত ভেতরে গেছেন স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ফর্ম আনতে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি—প্রবেশ দ্বারের সামনে ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা—'আজকের বিষয় : কোয়ান্টাম ফিজিক্সের চোখে বেদান্ত দর্শন'! বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত জনৈক বাঙালি অধ্যাপকের নাম বক্তা হিসেবে ছিল। দেখেই ঝট করে আমার সেই ভয়ংকর আঁতেল পাগলাটে বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। ভর দুপুরে কফি হাউস থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী রে? তুই সেই কী যেন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছিলি?" সে অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলল, "যাচ্চলে! এও জানিস না? আমার লেটেস্ট বিষয় হলো—তেলাপোকার চোখে প্লেটোনিক প্রেম এবং বাজার অর্থনীতির সম্পর্ক!"

স্পষ্টতই এইসব ধান্দাবাজ ব্যক্তিরা যথার্থ সুবিধেবাদী প্র্যাগম্যান্টিক্সের মতনই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুযোগসুবিধে ভোগ করতে পিছপা নন, শুধু বিচার বিশ্লেষণকে গুলিয়ে দিতে চান। দেবতা ধ্বংস হওয়ার বদলে তাঁরা চান, যে দেবতার প্রণামী গোনবার জন্য মন্দিরে-মন্দিরে কম্পিউটার সিস্টেম বসুক।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাপ্-খাইয়ে টিকে থাকার জন্য অনেক অধ্যাত্মবাদী নেতারাই অধ্যাত্মবাদী কথার ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞানের কথাকেও গুঁজে দিচ্ছেন। ওদের এমন গজ-কচ্ছপমার্কা অধ্যাত্মবাদী কথা-বার্তা বলার অর্থ—সাধারণ মানুষের মগজ-ধোলাই করে এমন চিন্তা ঢোকান যাতে তারা মনে করে অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞান বিরোধী নয়, বরং অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ-ই নেই, অধ্যাত্মবাদ হল চূড়ান্ত বিজ্ঞান।

এইসব যান্ত্রিক বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের ভ্রান্ত, অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারা থেকে উঠে আসা ভাসা-ভাসা কথাগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে অবুঝ মানুষরা ধরে নেন—এ সবই গভীর জ্ঞানময় কথা, যার অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা তাঁদের মতো সাধারণ মানুষের নেই। ফলে ভ্রান্ত, অজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তার স্রষ্টা অধ্যাত্মিক নেতারা দার্শনিক আখ্যায় ভূষিত হন, পূজিত হন।

এ-ভাবেই আমরা দেখেছি ভাববাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদকে প্রকাশিত হতে—যে দুই দর্শনের মধ্যেই বিশ্ব নিরীক্ষণ পদ্ধতির নাম-গন্ধের দেখা মেলে না।

আসলে এই দুই দর্শনের সাহায্যে কোনও দিনই আমাদের বাস্তব-সামাজিক-মূল্যবোধ এবং বাস্তব-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে একটি মাত্র দার্শনিক সূত্র দিয়ে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তার বাস্তব প্রয়োগও। সেটা সম্ভব একমাত্র বস্তুবাদী বিশ্ব নিরীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারাই। একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই পারে নীতিবোধের যৌক্তিকতা এবং যুক্তির নৈতিকতা প্রমাণ করতে।

এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তাকে বিদেশের দৃষ্টান্ত বেশি টানায় কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। এমনকী, এও মনে করতে পারেন-তর্কবিদ্যা-অর্থাৎ ন্যায়দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধান গৌরব বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল কাঁটায় কাঁটায় যুক্তি-তর্কের পথ ধরেই। ভারতীয় দর্শনের ভাববাদ যদি যুক্তিবাদের বিরোধীই হবে, তবে কেন তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়দর্শনের এমন গৌরবময় ভূমিকা ইতিহাসের স্বীকৃতি পেল?

বিষয়টা পরিষ্কার না করলে বিভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যে প্রচলিত যুক্তিবাদী বলতে যে যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তাকে বোঝানো হয়, ভ্রান্তিকে বুঝতে না পারলে সঠিক যুক্তিবাদের অর্থাৎ বস্তুবাদের সঙ্গে যান্ত্রিক বস্তুবাদ নির্ভর যুক্তিবাদের পার্থক্য বোঝা যাবে না। দু'য়ের পার্থক্য না বুঝলে সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এবার আসা যাক পরবর্তী প্রসঙ্গে। ভারতীয় ভাববাদীরা, ভারতীয় তর্কবিদ্যা ও ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা, পালক ও পুষ্টকারীরা যুক্তি-তর্কের লড়াইকে পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেও যেখানে যুক্তি-তর্কের কূট কচকচালি চালিয়ে যাওয়া যায়। (২) যুক্তি-তর্ক যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অভ্রান্ত বলে মানতে নারাজ— এমনকী, তা বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র হলেও।

ধর্মশাস্ত্রকার মনুর বিধান হল, বেদকে 'শ্রুতি' এবং 'ধর্মশাস্ত্রকে' স্মৃতি বলে মানবে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রই হল সব ধর্মের মূল। এ-নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কোনও বিতর্ক চলবে না। কোনও তার্কিক দ্বিজ যদি তর্কবিদ্যার সাহায্য নিয়ে 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি' অবমাননা করে তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে সমাজ থেকে দূর করে দেবে।

মনু বেদ নিয়ে তর্ককে প্রশংসা করেছেন। তবে সে তর্ককে এগোতে হবে অবশ্যই বেদের অভ্রান্ততাকে মেনে নিয়ে। বেদের প্রামাণ্যকে শিরোধার্য করে

জটিল প্রশ্ন তুলে তর্ক চালিয়ে গেলে সাধারণের মধ্যে বেদভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস আরও প্রবল হবে— এটাই ছিল মনুর ধারণা।

কথা উঠতেই পারে, হঠাৎ মনুকে এতটা গুরুত্ব দিলাম কেন? মনু কে? দু-চার কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দু ভাববাদীদের বিশ্বাস মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। এই হেতু তাঁর আর এক নাম 'স্বয়ম্ভূ' মনু। মনুর স্ত্রী শতরূপা, ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। এঁদের ছেলে-মেয়েদের থেকেই নাকি মানুষ বা মনুষ্যজাতির বিস্তার। ব্রহ্মার কাছ থেকে মনু স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র বা প্রাচীন আইনের বিধান। আইন কর্তা মনু এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন যার প্রধান শর্ত হল অন্ধ শাস্ত্র-বিশ্বাস।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয় বোঝা গেল ভারতীয় তর্কবিদ্যা বা ন্যায়দর্শন নিয়ে যত বেশি বেশি করে অগ্রগতির প্রচার হয়েছে তত বেশি বেশি করে মানবসভ্যতার চিন্তাশীলতা পিছু হটেছে।

ভারতীয় তর্কবিদ্যা ও ন্যায়দর্শনের যে পণ্ডিতকে যত বড় দার্শনিক বলে প্রচার চালানো হয়েছে তিনি তত বড়ই ভ্রান্ত-দর্শনের পণ্ডিত। এ যেন ঘোড়ার ডিম নিয়ে গবেষণা করা এক উন্মাদকে 'পণ্ডিত' বলে প্রচার করার মতোই হাস্যকর।

ভ্রান্ত-চিন্তার, ভ্রান্ত-দর্শনের বড় মাপের পণ্ডিত মানেই, বড় মাপের মূর্খ; এ সেই - যে যত বড় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও যত বড় জ্যোতিষী, সে তত বড় প্রতারক—কথাটির মতোই পরম সত্য।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, যাঁকে অনেকে দার্শনিক বলেই মনে-টনে করেন, আমাকে বলেছিলেন, "মানছি ঈশ্বরের অস্তিত্ব এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, মানছি মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গোলমালের ফলে অনেক মানসিক রোগী যেমন বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতির শিকার হন, তেমনি ভ্রান্ত অনুভূতির ফলে ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বরের কথা শোনাও সম্ভব। কিন্তু এ-কথাও মানতেই হবে, 'ঈশ্বর নেই' এমন কথাও কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এমন তো বহুবারই ঘটেছে অতীতে যা প্রমাণিত সত্য ছিল না বর্তমানে তা প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে

এই মুহূর্তে অস্বীকার করলেও ভবিষ্যতে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না— এমন গ্যারান্টি দেওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? যুক্তিবাদিতায় নিষ্ঠা রাখার পর আমার এই যুক্তিকে অস্বীকার করবেন কী করে?"

এ প্রশ্ন শুধু ওই ভাববাদী দার্শনিকের প্রশ্ন নয়। বহু ভাববাদী দার্শনিক, অধ্যাত্মবাদী নেতা এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ-প্রশ্ন উঠে আসতে দেখেছি। আর বারবার এই উত্তর হাজির করেছি।

প্রমাণ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা মানতে চাইছি কেন? দ্বীপ-দেশ-পরমাণু-রোগ জীবাণু-ব্ল্যাকহোল এসবের অস্তিত্ব তো আমরা বিনা প্রমাণে মেনে নিইনি।

অমনি ভাববাদীদের তরফ থেকে যে প্রশ্নটা লাফিয়ে এসে পড়ে তা হল, "আমরা বায়ু দেখিনি, বিদ্যুৎ দেখিনি, সম্রাট অশোককে দেখিনি, এমনকী নিজের প্রপিতামহকেও দেখিনি। এত কিছু না দেখেও যদি এদের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারি, তবে ঈশ্বরের বেলায় অসুবিধেটা কোথায়?" কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব আছে বোঝা সম্ভব। চোখে না দেখলেও বায়ুর স্পর্শ আমরা পাই, বায়ুকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড মিল হচ্ছে, পতাকা উড়ছে, বায়ু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যুৎ তামার তারে দৃশ্যমান না হলেও আলোয়, পাখায়, টেপ রেকর্ডারে, টিভিতে, নানা যন্ত্রপাতি চালাতে বিদ্যুৎ তার অস্তিত্বকে সোচ্চারেই ঘোষণা করে। সম্রাট অশোকের কথা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলে পাই বলেই মানি। প্রপিতামহের অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব, তাই আমার অস্তিত্বই আমার প্রপিতামহের অস্তিত্বের প্রমাণ। এর পরে এমন প্রশ্ন ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী নেতাদের কাছ থেকে এসেছে, "আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন আপনি যাকে বাবা বলছেন, তিনিই আপনার জন্মদাতা?" আমাদের সমাজের সাধারণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে মায়ের বিবাহিত পুরুষ সঙ্গীকেই ('স্বামী' কথাটি ব্যবহার করতে চাইলাম না। কারণ, এই শব্দটির মধ্য দিয়ে স্ত্রীর ওপর বিবাহিত পুরুষ সঙ্গীর স্বত্বাধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়) আমরা বাবা বলে থাকি। বাবাই আমার জন্মদাতা কি না, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়াটা একান্তই অবান্তর মনে করি। তবে আমার আপনার জন্ম যখন হয়েছে, তখন জন্মদাতা কোনও পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন, নতুবা তাত্ত্বিকভাবেই আপনার আমার জন্ম অসম্ভব। তবে প্রয়োজনে ডি এন এ টেস্ট করে নিশ্চিত হতে পারেন। এখন লাখো কথার এক কথা হল, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে

এ-ধরনের কোনও পরোক্ষ প্রমাণ আছে কি? উত্তর একটাই —নেই।

যাঁরা এমন যুক্তি হাজির করেন— "ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজ প্রমাণিত না হলেও ভবিষ্যতে প্রমাণিত হতেই পারে", অথবা 'এমন উদাহরণ তো বহু আছে, অতীতে যা অপ্রমাণিত ছিল, বর্তমানে তা প্রমাণিত, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তো তেমনটা ঘটতেই পারে', কিংবা "আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন, ঈশ্বর নেই", তাঁদের এই জাতীয় যুক্তিগুলিকে লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র মতে বলা হয় 'প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি' বা 'fallacious reasoning' । এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে যে কোনও কিছুর অস্তিত্বই প্রমাণ করা সম্ভব। আমি যদি বলি, 'ঘোড়ায় ডিম পাড়ে', আপনি কোনওভাবেই প্রমাণ করতে পারছেন না ঘোড়ায় ডিম পাড়ে না। কারণ আপনি যদি বলেন, "আজ পর্যন্ত কেউ কখনই ঘোড়াকে ডিম পাড়তে দেখেনি", আমি বলব, "পৃথিবীর প্রতিটি ঘোড়াকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কি নজরে রেখে দেখার পর এ কথা বলা হচ্ছে? যেহেতু তেমনভাবে বাস্তবে নজর রাখা সম্ভব নয়, তাই যখন কোনও ঘোড়া ডিম পাড়ে, তখন তা মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। আর তা ছাড়া ঘোড়ারও একটা প্রবণতা আছে, মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে ডিম পাড়া। যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি গতকাল যা প্রমাণিত নয়, আজ তা প্রমাণিত, তাই ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্বের ব্যাপারটাও এই মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।" আমার এ-কথার জবাবে আপনি কী বলবেন? আপনি যেহেতু এই যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তাই ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানো-গজকচ্ছপ ইত্যাদি সব কিছুর অস্তিত্বকেই আপনাকে মানতে হবে। আসলে অস্তিত্ব প্রমাণের দায়িত্ব সব সময়ই দাবিদারের। যুক্তিবাদীরা দাবির যৌক্তিকতাকে চুলচেরা বিচারের পরই গ্রহণ করবে, অথবা বর্জন করবে।

এই প্রতারণাপূর্ণ যুক্তির গলদটা কোথায়, আপনারা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ, পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে ঠিকই ধরে ফেলেছেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আগে বা যুক্তি বিচারের আগে যে অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ তা তথ্য থেকে আনুমানিক একটি সিদ্ধান্ত মনে মনে খাড়া করি, যাকে বলা হয় প্রকল্প বা হাইপোথিসিস্। সেই প্রকল্পেই রয়ে গেছে গোলমাল।

ইতিহাস বলে, যে দেশে বা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বেশি সংখ্যক মানুষ সুস্থভাবে জীবনধারণের সুযোগ পেয়েছে সেই দেশের বা সম্প্রদায়ের মানুষের অগ্রগামিতার হার ততই বেড়ে গেছে। এই অগ্রগামিতা শিল্পে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে, সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের যুক্তিমনস্কতা এ কথাই ভাবাচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার প্রয়োজন আছে, আর তাহলেই আমরা সবাই মিলে সবচেয়ে ভালোভাবে বাঁচতে পারব।

হাতুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ছোট-খাটো পরিবেশ পরিবর্তনের যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেক দিন। আজ আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এতটাই উঁচুমানে পৌঁছেছে যে, আমরা পূর্বপরিকল্পনামাফিক বিরাট ধরনের পরিবেশীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখি।

এগিয়েছে সমাজ। সমাজের এই অগ্রগতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি কিছু নিয়ম-ধারাকে। সমাজের এই নিয়মধারা যত বেশি বেশি করে বুঝতে শিখেছি, ততই এগিয়েছে সমাজ-বিজ্ঞান। আমরা দেখেছি, নানা মূল্যবোধ পাল্টে যেতে। আমরা শিখেছি, ত্রুটিপূর্ণ নীতিবোধ ও মূল্যবোধ পাল্টাবার উপায়। পাশাপাশি আমরা দেখেছি কীভাবে বিভিন্ন নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয় শাসক ও শোষকশ্রেণির যৌথ উদ্যোগে। আমরা পরিচিত হয়েছি নব মগজ ধোলাই পদ্ধতির সাহায্যে, যেগুলোর প্রয়োগ-কর্তা শাসক ও শোষক শ্রেণি। আমরা জেনেছি সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শোষক ও শাসকশ্রেণি তাদের মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি পাল্টায়, তাদের শোষণের হাতিয়ার ভাববাদী দর্শন পাল্টায়—ওরা কখনই একটা স্তরে থমকে থাকে না। এই জানা থেকে সমাজ-বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, বস্তুবাদী যুক্তিবাদকে মানব-সমাজের অগ্রগামিতার কাজে লাগাতে চাইলে বস্তুবাদী যুক্তিবাদকে কখনই একটা স্তরে অনড় করে রাখা চলবে না। প্রতিটি স্তরে শাসক ও শোষক শ্রেণির শোষণ কৌশল পাল্টাবার পাশাপাশি যুক্তিবাদ পাল্টায়, আবার যুক্তিবাদ পাল্টাবার পাশাপাশি শোষণ পদ্ধতিও পাল্টে ফেলে শোষকরা। আমরা এও দেখেছি সাধারণ মানুষের দুঃখ বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের তীব্র আকুতি থেকে কিছু মানুষ উত্তরণের পথ খুঁজছে। এই উত্তরণের পথ খোঁজার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে মহৎ আদর্শ, নতুন মূল্যবোধ। মানুষের এই সংগ্রাম কখনও জয়ী হয়েছে, জয়ী হয়েছে কোনও আদর্শবাদ।

এই জয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে আদর্শবাদী কিছু মানুষ। সমাজ-বিজ্ঞানই শিখিয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতায় বসা সংগ্রামী ও আদর্শের প্রতীক মানুষগুলো আদর্শবোধের অন্তর্গত ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিবর্তে কী ভাবে ধীরে ধীরে ভোগ-লালসার শিকার হয়েছে, নতজানু হয়েছে ক্ষমতার কাছে, দুর্নীতির কাছে। বঞ্চিত মানুষের, আদর্শবান মানুষের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভুল থেকেই আবার আদর্শবাদীরা শিক্ষা নিয়েছে— রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই শেষ কথা নয়, এভাবে আদর্শবাদকে লোভের ঘুণ পোকার হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। আদর্শবাদকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অগ্রগামিতা বজায় রাখতেই হবে। এই অগ্রগামিতাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যুক্তির মাধ্যমেই আমরা বুঝতে শিখেছি, পরিকল্পনামাফিক অসাম্যের শিকড়-বর্জিত নীতিবোধ তৈরি করা যায়। আর সেদিকে পদযাত্রা করতেই যুক্তিবাদী দর্শন প্রস্তুত।

**এই আমাদের নীতিবোধের বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞানমনস্কতার নীতি।
এই আমাদের আপ্লুত বাঁচার লড়াই, আমাদের উত্থানময় অস্তিত্ব,
যার এক পিঠে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সাহিত্য, অন্যপিঠে নীতি
ও মূল্যবোধ। আর এই আমাদের যুক্তিবাদী দর্শন,
যার সাহায্যে আমরা নিজেকে পাল্টাতে
পাল্টাতে বুঝি, আর বুঝতে
বুঝতে পাল্টাই।**

অধ্যায় : আট

যুক্তির পথচলা :
লোভের অন্ধকারে ঢোকে না দিনের আলো

কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তির চেয়ে আবেগকে মূল্য দেয় বেশি। সেই সময় একটি মানুষ কোন্ যুক্তিকে গ্রহণ করবে এবং কোন্ যুক্তিকে বর্জন করবে— এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠীস্বার্থ ইত্যাদি। এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই শোষিত মানুষদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বপনে পরিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্রেণি। এই পরিকল্পনা শোষিতদের উন্মাদনার নেশায় ভুলিয়ে রাখার স্বার্থে, শোষকদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। আর তাইতেই জন্ম নেয় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ সমস্যা, চাকরি ক্ষেত্রের সংরক্ষণ সমস্যার মতো সমস্যাগুলো। শোষক নিজ স্বার্থেই চায় সাধারণ মানুষ যুক্তির দ্বারা নয়, আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হোক।

শোষক শ্রেণি কখনওই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর-পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে।

এর বাইরেও আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে অনেক সময় হৃদয়াবেগে আপ্লুত হয়ে যুক্তিছাড়া যুক্তিকে অর্থাৎ কুযুক্তিকে সমর্থন করি। যখন আমি একজন বাসকর্মী, তখন অপর কোনও বাসকর্মীর প্রতি যে কোনও কারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই— তা সেই আইন ভাঙার জন্যে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলেও। যখন আমি ছাত্র, তখন আমারই সহপাঠী বিনা টিকিটে, ট্রেনে কলেজে আসার সময় গ্রেপ্তার হলেও রেলকর্মীদের হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত করতে স্টেশনে হামলা চালাই। আমি কখনও প্রতিবেশীর মৃত্যুতে

ডাক্তারের দায়িত্বহীনতার দাবি তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ি। আমিই আবার হাসপাতাল-কর্মী হিসেবে ওই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতালের কাজকর্মকে অচল করে দিই। এই ব্যক্তিস্বার্থে বা গোষ্ঠীস্বার্থে পরিচালিত হয়ে কখনও আমরা বাঙালি, কখনও বিহারি, কখনও আসামি, কখনও অন্য কিছু। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অনধর্মী। কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন ধর্মী হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন রাজনৈতিকি বিশ্বাস পোষণ করায় একে অপরের জীবনধারণের অধিকার কেড়ে নিতেও দ্বিধা করি না। যুক্তিহীন আবেগই আমাকে হত্যাকারী, অত্যাচারী করে তোলে। কুযুক্তির দাস করে তোলে।

ব্যক্তি-শ্রদ্ধা থেকে বা অন্ধ-শ্রদ্ধা থেকে আমরা অনেকেই প্রশ্ন তুলি, "আমার মা নিজের চোখে অমুক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। তিনি কি তবে মিথ্যে বলেছেন?" কখনও এই প্রশ্নটাই আমরা তুলি মা-এর পরিবর্তে বাবা বা অন্য কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে খাড়া করে। সেই সময় প্রশ্ন কর্তা আমরা মা-বাবার মতো আবেগ-আপ্লুত সম্পর্ককে টেনে এনে যে প্রশ্ন হাজির করি, প্রকারান্তরে সেগুলো অলৌকিকতাকে প্রতিষ্ঠা করারই চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, উত্তরদাতা যে আমাদের মা-বাবার মতো আবেগ-আপ্লুত সম্পর্ককে আঘাত হানবার জন্য একশো বার ভাববেন, এ ব্যাপারটা আমরা বেশ ভালো রকমই বুঝি। কিন্তু আমরা যেটা বুঝি না সেটা হল, মিথ্যাচারী, অসৎ, মানুষগুলোও কারো না কারো মা-বাবা-ভাই-বোন-কাকা-জেঠা ইত্যাদি। আসলে মা-বাবা হলেই শ্রদ্ধা করতে হবে— এমন আরোপিত মূল্যবোধের পিছনে বাস্তবিকই কোনও যুক্তি দেখি না। মা বা বাবা যদি দুর্নীতিপরায়ণ, ভেজালদার, শোষক, লম্পট, সমাজ-বিরোধী-রাজনীতিক ইত্যাদি হন, তবে আদর্শবান যে কোনও সন্তানই এমন মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, বরং এমন মা-বাবার বিরোধিতা করাটাই সুস্থ চেতনাসম্পন্ন সন্তানের কাছে প্রত্যাশিত। আমরা আদর্শের পক্ষে। ব্যক্তি সম্পর্কের চেয়ে আদর্শ আমাদের কাছে অনেক বড়।

মানুষ যে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠীস্বার্থ ইত্যাদি দ্বারাই প্রধানত পরিচালিত হয়, তার কারণ খুঁজতে যুক্তি হাতড়ালে দেখতে পাব মানুষের সামাজিক পরিবেশই তাকে এমনভাবে পরিচালিত হতে শিখিয়েছে। সমাজ আমাদের পরিচালিত করে, প্রভাবিত করে, আবার আমরা সমাজকে পরিচালিত করি, প্রভাবিত করি।

মানবজীবনে দোষ-গুণ প্রকাশে পরিবেশের প্রভাব

উন্নততর দেশগুলির মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের ওপর দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বর্তমান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন— মানুষের বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতো জিভ দিয়ে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি— এসবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলো আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হওয়ার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রতিবেশী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষরা, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

আপনার আমার পরিবারের কোনও শিশু সভ্যতার আলো না দেখা আন্দামানের আদিবাসী জারোয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠলে তার আচার-আচরণে, মেধায় জারোয়াদেরই গড় প্রতিফলন দেখতে পাব।

আবার একটি জারোয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদের সমাজের আর দশটা ছেলে-মেয়ের গড় বিদ্যেবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন, বিগত বহু বছরের মধ্যে মানুষের শারীরবৃত্তির কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানব শিশুর সঙ্গে বিশ হাজার বছর আগের ভাষাহীন, কাঁচামাংসভোজী সমাজের মানব শিশুর মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই আদিম যুগের শিশুকে এ-যুগের অতি উন্নততর বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজের পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে পারলে ওই আদিম যুগের শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজের গড় মানুষদের মতোই বিদ্যে-বুদ্ধির অধিকারী হত।

একই সঙ্গে বিজ্ঞান একথাও অবশ্যই স্বীকার করে, কোনও অনুকূল পরিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকানদের নিরন্ন, হতদরিদ্র মূর্খ মানুষগুলোও হতে পারত ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই থাকত যেমনটি এখনও আছে একই দেশের একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের মধ্যে।

কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে—বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ প্রভাবিত। আর তাই মানুষের পরিবর্তে একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতোই তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না। কারণ, ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভেতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্র থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলাম, এক : মানবগুণ-বিকাশে জিনের প্রভাব বিদ্যমান। দুই: মানুষের জিনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

পরিবেশকে আমরা অবশ্যই দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : প্রাকৃতিক পরিবেশ। দুই : সামাজিক পরিবেশ।

সামাজিক পরিবেশকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক : আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) এবং দুই : সমাজ-সাংস্কৃতিক (Socio-cultural)।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বিশিষ্টতা দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, নদী, সমুদ্র, পাহাড় বা মরুভূমি ইত্যাদির প্রভাব কম-বেশি পড়েই থাকে।

সমুদ্রকূলের মানুষরা নৌ-চালনা, মাছ ধরা, মুক্তোর চাষ, সমুদ্র থেকে আহরণ করা নানা জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এইসব সমুদ্দুর ছেঁকে তুলে আনতে যে শ্রম ও ঝুঁকির মুখোমুখি হয় তাই মানুষগুলোকে সাহসী করে তোলে। পলিতে গড়া জমির কৃষকদের চেয়ে রুখো জমির কৃষকরা অনেক বেশি পরিশ্রমী। গ্রীষ্মপ্রধান আর্দ্র অঞ্চলের মানুষদের

পরিশ্রম করার ক্ষমতা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষদের তুলনায় কম। বেঁচে থাকার সংগ্রাম মরু এবং মেরু অঞ্চলের মানুষদের করেছে কঠোর সংগ্রামী। চরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুষদের বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয়িত হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি ও মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মতো সময়টুকু থাকে না।

আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই গলানো সোনা। আয়াসহীনভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে, ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। ওরা শ্রম কেনে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষগুলো প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগসর্বস্ব হয়ে পড়ে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের অধরাই থেকে যায়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে। আবার খরা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকর এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েন। অথবা মানসিক কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, আন্ত্রিক ক্ষত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

আমাদের মতো দরিদ্র ও উন্নতশীল দেশে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রতিটি পদক্ষেপে যেখানে রয়েছে অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা, শোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অত্যাচার, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী, এটা সমাজবিজ্ঞানী মাত্রই স্বীকার করেন। এখানে স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে নানা অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে নামতে হয়। মেয়েদের নিজেকে বাঁচাতে, সংসারকে বাঁচাতে ইজ্জত বেচতে হয়। এদেশের বহু মানুষের কাছে বিশুদ্ধ জল পান চরম বিলাসিতা। এ-দেশে এখনও অচ্ছুতরা বর্ণহিন্দুদের কুয়ো ছোঁয়ার দুঃসাহস দেখালে ধড় থেকে মাথা যায় কাটা। হরিজন নারীকে জীবনসঙ্গিনী করার অপরাধে বর্ণহিন্দুর চাকরি যায়, বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। রাজনীতিকের জাদুকাঠির ছোঁয়া না পেলে ঋণ-মেলায় ঋণ মেলে না। সরকারি চাকরি অধরাই থেকে যায়। চাকরির সুযোগ সীমিত, বেকার অসীম। ফলে কাজ পেতে খুঁটি

ধরাই সেরা যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এরপরও চাকরি পাওয়া ছেলেটি ও তাদের পরিবারের সকলেই মনে করে— কাজ পাওয়াটাই বিশাল ভাগ্য, মানতের ফল, অবতারের আশীর্বাদের কেরামতি, গ্রহরত্নের ভেল্কি।

যে দেশের পঙ্গু অর্থনীতি গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দিতে পারে না, সে দেশের গ্রামবাসীরা রোগ ও মৃত্যুকে অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিক— এটাই চাইবে রাষ্ট্রক্ষমতা, সরকার। আর তেমনটাই মেনে নিচ্ছে অসহায় গ্রামের মানুষরা। গরিব ঘরের মানুষদের বিনে মাইনের স্কুলে সন্তান পড়াবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। ঘরের ছেলে কাজে না গিয়ে স্কুলে গেলে রোজগার করবে কে? শিশু-শ্রমের ওপরও প্রায় সমস্ত দরিদ্র পরিবারকেই কিছুটা নির্ভর করতে হয়। আবার পাশাপাশি এও সত্য— আব্রু রক্ষা করে স্কুলে যাওয়ার মতো সাধারণ পোশাকটুকুও অনেকের জোটে না। পড়াশুনো ও বাইরের খবরাখবর রাখতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ যেহেতু দরিদ্রদের ক্ষেত্রে খুবই কম, তাই শুধুমাত্র এই আর্থ-সামাজিক কারণেই দরিদ্র গ্রামবাসী ও শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে মেধা, বুদ্ধি, মননশীলতা খুবই কম। গ্রামের কিশোরীদের চেয়ে শহরের গরিব কিশোরীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটা ঘর নামক নরকে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষা করতে হয়। ফলে অনেক সময় এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে কৈশোরেই যৌন আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও আর্থিক নিরাপত্তা, জীবন ধারণের নিরাপত্তার জন্য পাড়ার মস্তান, কাজে নিয়োগকারী বা আত্মীয়দের লালসার শিকার হতে হয়। কৈশোরে পা দিয়েই অনেককে বেঁচে থাকার জন্য যোগ দিতে হয় নানা অবৈধ কাজে। এইসব পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো এমনতর জীবনযাত্রা ইচ্ছে করে বেছে নেয়নি, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই তাদের এমনতর জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ যে সাধারণ মানুষকে কী বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা মুখ খুলতে চাননি। যখন খুলেছেন, তখন মানবজীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে লঘু করে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রাষ্ট্র ও শোষকশ্রেণির দ্বারা সম্মানিত এইসব মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের শ্রেণি স্বার্থেই চান না, অথবা সরকার ও শোষকশ্রেণিকে তুষ্ট করার স্বার্থেই চান

না, বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, রাষ্ট্র কাঠামোকেই দায়ী করুক।

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

প্রতিটি সমাজ ও তার সংস্কৃতি জন্ম থেকেই শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবেই মানবিক আচার-আচরণ, মানবিক হৃদয়বৃত্তি বিকশিত হতে থাকে। শিশুকে হাঁটতে শেখানো হয়, শিশু হাঁটতে দেখে, তাই হাঁটে। শিশু কী ভাবে হাতকে ব্যবহার করে খাদ্য গ্রহণ করবে, কী ভাষায় কথা বলবে, সবই নির্ভর করে মা-বাবা ও তার আশেপাশের আপনজনদের ওপর। শিশু যদি কোনও কারণে মানবসমাজে প্রতিপালিত না হয়ে পশু সমাজে বেড়ে ওঠে, তাহলে দেখা যাবে সে পশুর মতোই হামা দিয়ে হাঁটবে। হাতকে ব্যবহার না করে পাত্র থেকে সরাসরি মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবে। জলপানের জন্য জিভকে কাজে লাগাবে।

শিশু বয়সে বা কৈশোরে মানুষ তার মা-বাবার ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। মা-বাবার ধর্মীয় বিশ্বাস আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, শ্রেণি-চেতনা, প্রাদেশিকতা, যুক্তিবাদী চেতনা, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সাহিত্য-প্রীতি, সংগীত-প্রীতি, অঙ্কন-প্রীতি, অভিনয়-প্রীতি, দয়া, নিষ্ঠুরতা, ঘরকুনো মানসিকতা, সমাজসেবায় আগ্রহ, নেশা-প্রীতি, অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ, ভীরুতা, সাহসিকতা, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা, রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজ সচেতনতা, মিথ্যে বলার প্রবণতা ইত্যাদি সন্তানকে প্রভাবিত করে।

শিশু বড় হতে থাকে। পাঠাভ্যাস গড়ে উঠলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকই সহপাঠীদের চিন্তাভাবনা, আচার-ব্যবহার, ভাললাগা না লাগা প্রভাবিত করতে থাকে। বেড়ে ওঠা শিশুটির ওপর অনবরত প্রভাব ফেলতে থাকে পরিবারের লোকজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু, পাঠ্য-বই, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। কিশোর বয়সে সে তার ঘনিষ্ঠ মানুষজনের চোখ ও কান দিয়ে দেখে ও শোনে। তার পরিচিত গোষ্ঠীর মূল্যবোধের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের সংঘাত হলে সে নিজের গোষ্ঠীস্বার্থে জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করতে পারে। ধর্মীয় উন্মত্ততা, জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতা, অতীন্দ্রিয়তার প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরজাতীয় কোনও কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস ও ভূত নামক কোনও কিছুর অদ্ভুত সব কাজকর্মের প্রতি বিশ্বাস, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস

ইত্যাদি প্রধানত গড়ে ওঠে আশেপাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে, পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে।

শিশুকাল থেকে আমরণ আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি; ফলে আমরা সাধারণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে পড়ি।

আমাদের খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, শিক্ষা-চেতনার স্ফুরণ, রাজনৈতিক মতবাদ—কোনও কিছুই শূন্য থেকে আসে না। এর প্রত্যেকটি গড়ে ওঠে সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলেই।

এ-যুগের অনেকেই প্রথাগত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। এঁদের অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি করেছেন, ডক্টরেট নামক ডিগ্রি পেয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, চিকিৎসক পেশায় সফল হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী নামে প্রচারিত হচ্ছেন, সফল বিভিন্ন শাখার ইঞ্জিনিয়াররা, প্রযুক্তিবিদরাও বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হচ্ছেন। এরা অনেকেই বিজ্ঞানের কোনও বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেননি, পারেননি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে—পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পরই কোনও মতকে গ্রহণ বা বর্জন করতে। এঁরা আমাদের সমাজের আপনার আমরাই বাড়ির ছেলে। শিশুকালে হাতেখড়ি হয়েছে সরস্বতীকে আরাধনা করে। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের দেখেছে ঈশ্বরজাতীয় কারো কাছে পরম ভক্তিতে আভূমি নত হতে। পড়ার বইয়ে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে নানা পুরাণের গল্পের মধ্যে কাল্পনিক অলৌকিক কাহিনি। দেখেছে জ্যোতিষ-কোষ্ঠী-হাতের রেখার প্রতি পরিচিত মানুষদের পরম বিশ্বাস। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে ঈশ্বর, আল্লা ও পরম পিতার প্রতি প্রার্থনা। এমনি আরও বহুতর অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে বেড়ে ওঠার সূত্রে বিশ্বাস করেছে বহু অলীককে। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো হওয়ার সুবাদে আপনি আমি ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ছেলের পেশাগত সুবিধার কথা ভেবে তাকে বিজ্ঞান শাখায় পড়তে উৎসাহিত করেছি। সন্তান আমাদের বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করেছে। পড়াশুনায় সফল হয়ে বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণও করেছে; যেমনভাবে পেশা হিসাবে কেউ গ্রহণ করে আলু-পটলের ব্যবসাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা কখনওই নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেনি। আর্থ-সামাজিক পরিবেশই এমন সব অনেক বড় বড় বিজ্ঞান পেশার কিন্তু বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী মানুষ বা অমানুষ তৈরি করেছে।

'অমানুষ' কথাটা একটু কড়া হলেও সুচিন্তিতভাবেই লিখতে হল। যে নিজেকে বিজ্ঞানের পূজারি বলে জাহির করে এবং একই সঙ্গে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ পরিত্যাগ করে অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, তাকে 'অমানুষ' নিশ্চয়ই বলা চলে। কারণ তার গায়ে 'বিজ্ঞানী' তক্‌মা আঁটা থাকার তার ব্যক্তি-বিশ্বাস সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা নেয়, মানুষের প্রগতির পক্ষে, বিকাশের পক্ষে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জনগণ স্বভাবতই যা ভাবে তা হল—এত বড় বিজ্ঞানী কি আর ভুল কথা বলছেন?

ঠিক এই সময় ভ্রান্ত চিন্তার পরিমণ্ডল থেকে সাধারণ মানুষদের বের করে আনতেই প্রয়োজন নতুন বলিষ্ঠ যুক্তিযুক্ত চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। এই সময়ই প্রয়োজন বিভ্রান্তিকর কুযুক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সুযুক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। মানুষ সাধারণভাবে যুক্তির দিকেই ধাবিত হয়। সুযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হলে কুযুক্তি তারা বর্জন করেই। দীর্ঘদিনের প্রচলিত বহু ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণাকেই বর্তমান শোষক ও শাসকশ্রেণি বজায় রাখতে সচেতন।

যে ভ্রান্ত চিন্তা প্রতিটি বঞ্চনার জন্য অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, সে ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মধ্যে থাকলে লাভ তো বঞ্চনাকারীদেরই।

তাই তো বঞ্চনাকারী শোষক ও তাদের তল্পিবাহক রাষ্ট্রক্ষমতা মুখে যত লক্ষবারই সাধারণ মানুষদের কুসংস্কার মুক্ত করার আহ্বান জানাক না কেন, কাজে বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারে আবদ্ধ রাখতেই চাইবে। তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রচারের সাহায্যে সব সময়ই জনসাধারণের মগজ ধোলাই করে ভ্রান্ত চিন্তার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছে, চলবেও।

কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের চরম সাফল্য কখনওই সরকারি সহযোগিতায় আসবে না। আসবে শোষক-শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের তীব্র প্রতিরোধ ও বিরোধিতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে। আর এরই জন্য চাই যুক্তিবাদী পরিমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত করা। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা।

পারিপার্শ্বিক মানুষজনের প্রভাবে আমাদের দেশের শিশু যখন যুবক ও প্রৌঢ়ত্বে পা রাখে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসগুলো একইভাবে অনড় থাকে, যদিও এঁদের কেউ কেউ ব্যবহারিক জীবনে বা পেশাগতভাবে 'বিজ্ঞানী', 'বুদ্ধিজীবী', ইত্যাদি বিশেষণে পরিচিত হতে থাকেন। তাই বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায় ও বিজ্ঞান পেশার মানুষদের মধ্যেও দেখা যায় যুক্তির শিথিলতা অথবা যুক্তিহীনতা। এঁদের মধ্যে একই সঙ্গে অবস্থান করে পড়ার বইয়ের কিছু কিছু জ্ঞান ও আশৈশব গড়ে ওঠা অন্ধবিশ্বাস। এঁদের অনেকেরই আঙুলে, গলায়, বাজুতে, শোভা পায় গ্রহরত্ন, ধাতুর বালা বা আংটি, শিকড় বা তাবিজ কবচ। ধারণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে এঁদের অনেকেই লজ্জায় স্বীকার করতে চান না— ভাগ্য ফেরাতে পেরেছেন। জেল্লা বজায় রাখতে সকলেই হাত বাড়ায় অজুহাতের 'ব্রাসো'র দিকে। এঁরা নিজেদের 'প্রেজেন্ট' কররেন বিদ্যাসাগরের সুবোধ বালক হিসেবে—'যাহা দেয়, তাহাই পরে'। এ-সব হাবি-জাবি জিনিস পরতে এঁদের নাকি অনুরোধ জানিয়েছিলেন মাতা, মাতামহী, পিতা, পিতামহ, আত্মীয়, বন্ধু, প্রেমিক, পত্নী ইত্যাদিরা। আর স্রেফ ওদের দুঃখ দিতে না চাওয়ার জন্যই পরা। এঁরা এতই কোমলহৃদয় প্রাণী যে ভয় হয়, কেউ জুতোর মালা পরাতে চাইলে প্রার্থীর হৃদয় রাখতে টপ করে না জুতোর মালাই গলায় গলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ আবার এই যুক্তিই দেন— "বলল, তাই পরে ফেললাম। দেখিই না, যদি কাজ হয় ভাল, না হলেও ক্ষতি তো নেই।" এই স্বচ্ছতাহীন দ্বিধাগ্রস্ত মানুষগুলো এটা বোঝে না যে, এতেও ক্ষতি হয়। প্রথমেই অর্থ ক্ষতি তো অবশ্যই। তারপর যে ক্ষতি তা সমাজের ক্ষতি। মানুষ হেহেতু সামাজিক জীব তাই এই দ্বিধাগ্রস্ততা, অস্বচ্ছতা যা অদৃষ্টবাদকে সমর্থনেরই নামান্তর, তা প্রভাবিত করবে তাঁরই পরিবারের শিশুটিকে, আশেপাশের মানুষজনকে।

স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়েছি সে সবই সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের লেখা। তাদের লেখা ও শিক্ষকদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা একটু একটু করে নিজেদের সাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে তুলেছি। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তীব্র হানাহানির ফলে বারবার বহু রক্ত ঝরেছে, বহু বাড়ি দোকান পুড়েছে, বহু ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে, সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ হঠাৎ করে একদিন এ দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েনি। ছড়ানো হয়েছে। বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষগুলোকে এককাট্টা হতে না দেওয়ার জন্যেই বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বারবার অনুভব করেছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী থেকে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত। এই প্রয়োজন মেটাতে তারা ঐতিহাসিকদের কাজে লাগিয়েছে বারবার। শাসককুলের কৃপা লাভের আশায় ঐতিহাসিকরা দেশের মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বীজ বুনতে আসরে নেমে পড়েছেন। ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষাগত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত, ধর্মগত ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে সেই সময়কার সমাজের একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক

ও প্রয়োজনীয়, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা মানব অগ্রগতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে জানতে পারব, বুঝতে পারব। কিন্তু পরিবর্তে আমরা স্কুল কলেজে ইতিহাস বই পড়ে জেনেছি সাধারণভাবে বিভিন্ন শাসকদের জয়-পরাজয় ও ব্যক্তিজীবনের কিছু কথা।

'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা 'হিন্দু' রাজাদের রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভুলে থাকতে চেয়েছি-দেশ শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিয়ে নয়, ভূ-খণ্ডের মানুষদের নিয়ে। কোনও দেশের উন্নতির অর্থ সেই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি। স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির প্রতি প্রেম। এই অর্থে রাজাদের দেশপ্রেমের সামান্যতম হদিশ মেলে কি? সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধ বলে প্রচার করতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। আকবরের পক্ষে হিন্দু রাজপুত সেনার সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। সেনাপতি মান সিংহও ছিলেন রাজপুত। অপরপক্ষে রাণা প্রতাপের বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যায় পাঠান সৈন্য। সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ-ছাড়া তাজ খাঁর নেতৃত্বেও ছিল আর এক পাঠান বাহিনী। অতএব দুই রাজার এই লড়াই কোনও সময়ই মুসলমান ও হিন্দুদের যুদ্ধ ছিল না। ছিল দুই রাজার মধ্যকার স্বার্থের লড়াই।

রানা প্রতাপের রাজ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টাকে স্বদেশ-প্রেম বলার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণই থাকতে পারে না। নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন স্বদেশ-প্রেমিক হবেন না?

প্রকৃতপক্ষে রানাপ্রতাপ সমগ্র ভারতবর্ষ তো নয়ই, এমনকী, গোটা রাজপুতানার জন্যেও যুদ্ধ করেননি। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন নিজের রাজ্য শাসনের দখল পাওয়ার জন্য।

একই ভাবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজির লড়াইও ছিল এক বাদশা এবং এক রাজার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র।

ইতিহাসের নিরিখে ভারতের মধ্যযুগের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। তুর্কি সেনার বিরুদ্ধে রাজপুত প্রভুদের লড়াই শুধুই দু-দলের সেনাবাহিনীরই লড়াই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে। কোথাও তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। ভোগসর্বস্ব হিন্দু রাজাদের জন্য লড়াই করার কোনও প্রেরণাই প্রজারা অনুভব করেনি। এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস রচয়িতারা 'হিন্দু'

স্বার্থেই দেখতে চাননি। তাঁরা দেখাতে চাননি—মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজারাও ছিল চূড়ান্ত ভাবে শোষিত, দারিদ্রে জর্জরিত।

'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা যেভাবে তুর্কিদের বহিরাগত বলে বর্ণনা করেছেন, আগ্রাসকের ভূমিকায় বসিয়েছেন সেভাবে তো তাঁরা বর্বর আর্য উপজাতিদের চিত্রিত করেননি। তুর্কিদের চেয়ে তো আর্যরা কোনও অংশেই কম বহিরাগত বা কম বিধর্মী ছিল না। কয়েক সহস্র বছর আগে তারাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভাবতে প্রবেশ করেছিল। আর্যরা ভারতীয় হতে পারলে তুর্কিরা কেন ভারতীয় বলে পরিচিত হবে না? প্রাক্-আর্য জাতি পরাজিত হয়েছিল বলেই তাদেরকে 'অনার্য' রূপে এমনভাবে ঐতিহাসিকরা চিত্রিত করেছেন যে বর্তমানে 'অনার্য' শব্দটি 'অসভ্য'-র প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও নর্মদা উপত্যকার প্রাক্ আর্য যুগের যে নিদর্শন পেয়েছি তা ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচারিতারই প্রমাণ। তাদের গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগরবিন্যাস, বয়ন, অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য প্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যায়ের। আর্যরা প্রাক্ আর্য মানুষের কাছ থেকে এইসব বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এ কথা চূড়ান্তভাবেই সত্য। আর্য সভ্যতার কোনও নিদর্শন না পাওয়ায় অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামীণ। তাই প্রাত্নিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

আর্যরাই ভারতে প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা যেমন মিথ্যা, একইভাবে মিথ্যা, ভারতের বর্তমান সভ্য জাতিগোষ্ঠীগুলো সবই আর্যদের থেকেই সৃষ্ট। এই চিন্তাই আমাদের আর্যজাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে প্রাক্-আর্য জাতিকে অনার্য, অসভ্য হিসেবে চিত্রিত করতে।

আমাদের দেশের 'হিন্দু' জাতীয়তাবোধ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে 'হিন্দু' বিদ্বেষের এবং হিন্দুত্বের অপমানের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছে। একই সঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষের একের পর এক হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনের ঘটনা বিষয়ে নীরব থেকেছে। হর্ষ তো মন্দির লুণ্ঠনের জন্য 'দেবোৎপাটননায়ক' নামে এক শ্রেণির রাজকর্মচারীই নিয়োগ করেছিল। মন্দির লুণ্ঠনের জন্য যদি মামুদ ও ঔরঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী

হিসেবে চিত্রিত হন, তবে হর্ষ একই কাজের জন্য কেন হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হবেন না?

হর্ষের মন্দির লুণ্ঠন প্রসঙ্গে আমার এক ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধু জানিয়েছিলেন, "আমাদের আলোচনা করা উচিত শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে নয়, বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে। সে যুগে মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, মন্দিরের গুপ্তকক্ষে সঞ্চিত থাকত ভক্তদের দান শ্রেষ্ঠীদের রত্নরাশি। অর্থ ও রত্ন রাজ্য শাসনে অপরিহার্য। রাজ্য শাসনের স্বার্থেই রত্ন আহরণের জন্য হর্ষ মন্দিরে হাত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

এই যুক্তিই মামুদ বা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না? গোটা হিন্দু যুগব্যাপী বীর-শৈব ও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়গুলো যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মঠ পুঁথি ধ্বংস করে গেছেন, আমাদের দেশের ইতিহাসের বইগুলো সে বিষয়ে নীরব কেন? হিন্দুত্বে কালি ছিটবে বলে?

হিন্দুদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মুঘল যুগের শাসকদের 'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা যতই তাঁদের লেখনিতে অভিযুক্ত করুন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মান্তরের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেননি। এমনকী, ঔরঙ্গজেবও নন।

সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে রাজধর্মে দীক্ষিত করা নিন্দনীয়ই যদি হয়, তবে নিন্দার প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত সম্রাট অশোককে। নিজ ধর্মে দীক্ষিত করতে তিনি কী না করেছেন?

তবু তিনি মহান! তিনি ধর্মাশোক! তিনি শান্তি ও অহিংসার প্রতীক!

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এমন ইতিহাসই রচনা করেছেন, যা পড়ে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ভারতের সমস্ত কিছু গৌরবের কৃতিত্ব হিন্দুদের। যা কিছু অগৌরবের তার সমস্ত কিছুর দায়ই মুসলমানদের। দেশের এই শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে সাধারণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষই পোষণ করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আচরণ পেয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্দেহই পোষণ করছে। ফলে একই দেশে বাস করেও সংখ্যাগুরুদের অবিশ্বাস ও পক্ষপাত সংখ্যালঘুদের ভারতকে আপন দেশ ভাবার সুযোগ দিচ্ছে না। বরং ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী পরিবেশই আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসছে।

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠী রক্ষার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, রক্তপাত, লুণ্ঠন, হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করেই চলেছে।

মগজ ধোলাইয়ের সেকাল—একাল : সমস্তই এক বয়ে চলা স্রোত

এ-কালের শাসক-শোষক ও তাদের অধীনস্থ বুদ্ধিজীবীদের মতো প্রাচীন ভারতের শাসকরা ও তাদের বুদ্ধিদাতা ধর্ম-পণ্ডিতরা স্পষ্টতই বুঝে ছিলেন, যুক্তিবাদী দর্শন, যুক্তি-নির্ভর চিন্তাধারা ব্যাপকতা পেলে, সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভিতই টলে যেতে পারে—যে সমাজব্যবস্থায় একদল শুধুই খাটবে আর একদল ভোগ করবে সেই খাটুনির ফল।

শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণিবিন্যাসকে বজায় রাখতেই তৈরি হয়েছিল প্রাচীন আইন গ্রন্থ 'স্মৃতি' বা ধর্মশাস্ত্র। আর বেদ, উপনিষদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রুতি'। এই 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি' নিয়ে গড়ে উঠেছিল ভাববাদী দর্শন, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত বিশ্বাসবাদ, শাস্ত্র-বিশ্বাস, গুরু-বিশ্বাস, অধ্যাত্মবাদ।

যুক্তিবাদী দর্শনে এমন অন্ধ-বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। যুক্তিবাদ সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যুক্তির পথ ধরে, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পথ ধরে।

দর্শনের ইতিহাসে মূল দ্বন্দ্ব ভাববাদ বা বিশ্বাসবাদ বনাম বস্তুবাদী যুক্তিবাদ। ভাববাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্বই অন্ধ-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্ব, অসাম্যের

সমাজ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্যের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দ্বন্দ্ব।

এই দুই দর্শনের গুরুত্ব ও দ্বন্দ্বের গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেও সাম্যের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ভাববাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লাগাতার যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রক্রিয়াগুলোকে চালু না রাখতে পারলে ভাববাদী দর্শনের চিন্তা আবার অসাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেই।

আসুন, আমরা ফিরেই তাকাই প্রাচীন ভারতের দিকে। সেখানেও দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মতো মহাকাব্যগুলোতেও ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনি, অনেক নীতি কথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

ক্কচিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পন্ডিতমানিনঃ।।

অর্থাৎ, "আশা করি তুমি লোকায়তিক (যুক্তিবাদী) ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সঞ্চয় করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কি পারে সে-জীবন ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শিয়াল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম।

চূড়ান্ত মূর্খের মতো মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এল নীতিকথা—

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম।।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্ট চ-অভিবক্ত চ ব্রাহ্মবাকেষু চ দ্বিজান।।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃশৃগালত্বং মম দ্বিজ।
(শান্তিপর্ব ১৮০-/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ-সমালোচক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম যুক্তিবাদের প্রবক্তা। যুক্তি বলে দ্বিজদের ব্রাহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কি না পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

ভারতবর্ষে ভাববাদী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'উপনষদ' সাহিত্যে। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদের সূচনা সঠিক কবে হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমল শীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'পঞ্জিকা'তে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমল শীলের গুরু শান্ত রক্ষিত নিজের মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী যুক্তিবাদী দর্শনকে তিনি 'চার্বাক' না বলে 'লোকায়ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্ত রক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকের রচনায় 'লোকায়ত' বা 'চার্বাক' নামের যুক্তিবাদী দর্শনটির উল্লেখ দেখতে পাই। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথামত পরমত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন করা হত। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

আত্মা অবিনশ্বর হলে তবেই মৃত্যুর পর আসে স্বর্গ বা নরক ভোগের

প্রশ্ন, জন্মান্তর পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির প্রশ্ন। আত্মা নশ্বর হলে এইসব প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়।

আসুন আমরা এক ঝলকে চার্বাক দর্শনের পরিচয়টা একটু জেনে নিই।

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটির নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সেরে নিলে বোধহয় অনেকের কিছুটা কৌতূহলও মেটানো যাবে এবং আত্মা প্রসঙ্গে যে দর্শনের মতামতের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে চাইছি, তার বিষয়েও কিছু বলা হবে।

'চার্বাক' কথাটা কোথা থেকে এল? অনেক দার্শনিকের মতে 'চারু + বাক' থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা মাথায় রেখে যে দর্শন 'চারু' বা সুন্দর কথার জাল বুনে 'হই জগতেই সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে অন্য কোনও জগৎ বলে কিছু নেই, অতএব ভোগ করো' বলে মানুষদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে, সেই দর্শনই চারু + বাক্ বা চার্বাক দর্শন।

অন্য মতে 'চব' (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে -এই অর্থে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাতারা বলতে চান-চর্ব-চোষ্য-খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে দর্শন খুঁজে পায় সে দর্শনই চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। 'চারু + বাক' থেকে 'চারু-বাক' অথবা 'চারবাক্' বা 'চার্বাক্' কোন অবস্থাতেই 'চার্বাক' নয়। অথচ প্রাচীন প্রতিটি লেখাতেই আমরা দেখতে পাই 'চার্বাক-এর 'ক'-এর হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

আবার 'চর্বণ করে যে' সে 'চার্বাক নয় চার্বক, অর্থাৎ 'র্ব'-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস্ (Rhys Debinds) -এর ধারণায়—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক-এর নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারতে আছে— চার্বাক ছিল দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু আর এক দুরাত্মা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বিজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক-এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা

সৃষ্টির জন্যই এমন এক ঘৃণ্য রাক্ষস চরিত্রের নামে দর্শনটির নাম রেখেছিলেন।

সে যুগের কিছু ভাববাদীরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলের রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত দর্শন রচনা করলেন, তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিভ্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হল।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী দর্শনই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির স্পষ্ট চেষ্টা।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে 'লোকায়ত' নামে অবহিত করার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন— দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই 'লোকায়ত' দর্শন।

এখানে ভাববাদী দার্শনিকদের লোকায়ত দর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকাদের মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে কী এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দার্শনিকদের ছিল না, তার ফলে ভাববাদী রথী-মহারথীরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে লক্ষ করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন এবং সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে আত্মার বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যেগুলো ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তিবাদী এই দর্শনে আত্মা বা চেতনাকে দেহধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্যই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা 'অমর' কি 'মরণশীল'—এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে—কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান-নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও তাঁরা প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে 'পূর্ব প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কখনওই হতে পারে না।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবান্তর। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন 'ঋষি' নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ- বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মবিদ্যার এবং অধ্যাত্মতত্ত্বই 'পরমবিজ্ঞান', তাঁরা এটা ভুলে যান—প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনামাত্র।

লোকায়ত দর্শনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হল— লোকায়ত দর্শনের মতে দেহের মূল উপাদান জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটি ভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত—চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু ভাববাদী দার্শনিকেরা যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই শঙ্করাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থের গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হওয়ার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তি হাজির করেছেন—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে বা মিলিত অবস্থায় কোনও মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোনও বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন? মৃতদেহও দেহ।

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালোতম যুক্তি।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন-এর বিপক্ষে জোরালো কোনও যুক্তি হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারীরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে, তাই স্নায়ুকোষের ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যেগুলো তীক্ষ্নতা এযুগের যুক্তিবাদীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মতো। দু-একটা উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও নিশ্চিতভাবে জানি আমার অক্ষম বাংলা তর্জমায় মূল শ্লোকগুলোর রস অনেকটাই শুকিয়ে যাবে।

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু করেছেন শ্রাদ্ধাদি বিহিত।।
এছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত।।

উদাহরণ ২ : যদি শ্রাদ্ধকর্মে হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।।
তবে নেতা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন।।

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে পঞ্চভূতে
তার পাথেয় দিতে পিণ্ডদান বৃথা।
যেমন, ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে
তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা।।

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা?
তবে তো পিণ্ডদান নেহাতই বৃথা।।

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে।
তবে, পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে
ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।।

উদাহরণ ৬ : ভণ্ডরা পশুর মাংস খেতে চান।
তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান।।

আত্মা, পরলোক ইত্যাদি নিয়ে ভাববাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদীদের চিন্তার ও মতের এই যে পার্থক্য, এটা নিছক দুটি মতের পার্থক্য নয়। এটা মতাদর্শগত পার্থক্য, মতাদর্শগত সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।

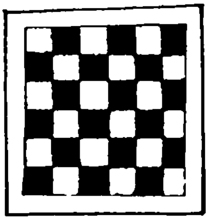

শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে

সময় এগোচ্ছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে খসে পড়ছে অনেক সংস্কার, অনেক মূল্যবোধ। মানুষ অনেক পুরোনো ধ্যান-ধারণা বিদায় দিচ্ছে। মানুষের এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধনীরাও শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল বের করছে, বের করছে গরিব মানুষগুলোর মগজ ধোলাইয়ের নানা প্যাঁচ-পয়জার। এইসব কূট কৌশল যেমন ধনীদের ভাড়া করা কিছু বুদ্ধিমান মানুষদের মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে, তেমনই কিছু কিছু

বুদ্ধিমানদের কাছে সে-সব ধরাও পড়ে যাচ্ছে। এই সব বিক্রি না হওয়া বুদ্ধিমানদের কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন বঞ্চিত মানুষদের ঘুম ভাঙাতে। তাঁদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছে নানা সংগঠন, নানা গোষ্ঠী। এইসব সংগঠন ও গোষ্ঠী বঞ্চিতদের ধোলাই করা মগজ আবার ধোলাই করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে নতুন চিন্তা, গড়ে তুলছে নতুন চেতনা, গড়ে উঠছে নতুন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

হুজুরের দল অবশ্যই এই অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে এক সময় বঞ্চিত মানুষগুলোর সোচ্চার দাবি ও ক্ষোভকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য-পাট ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেয় না। ওরা অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তোলে, প্রতিআক্রমণ চালায়। শোষকরা ভালোমতোই জানে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে দাবিয়ে চলার মতো পুলিশ ও সেনা রাষ্ট্র-শক্তির নেই। তাই নানা কৌশলে চেষ্টা করে শোষিত ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে দমিয়ে রাখতে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশলের সাহায্য নিতে।

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার পুরোটা যেহেতু ধনী হুজুরের দলই জোগায় তাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলকারী রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের বিশ্বস্ত 'যো-হুজুর' -এর দল।

এরই সঙ্গে হুজুরের দল আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর বিবেক কিনতে বাজারে নেমে পড়ে। টপাটপ বিক্রিও হয়ে যায় অনেকেই। শোষিত মানুষগুলোর মগজ ধোলাই করতে হুজুরের দল ময়দানে নামিয়ে দেল রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের। নেমে পড়ে সরকারি ও ধনী মালিকানাধীন প্রচার-মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। মগজ ধোলাই করা হতে থাকে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ভাবে। পাশাপাশি তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা জনমানসে বাড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রয়োজনে জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক নানা চিন্তাকে উস্‌কে দেওয়ার নানা কৌশলও টপাটপ্ বের করতে থাকে হুজুরের উচ্ছিষ্টভোগী পরামর্শদাতা ও দালালের দল। ভক্তিরসের বান ডাকানো হতে থাকে নানা ভাবে। অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কৌশলেই কাজ হয়। জ্যোতিষ ও প্যারাসাইকোলজিস্ট নামধারী প্রবঞ্চকের দল রাষ্ট্রশক্তির আসকারায় তাঁদের উদ্ভট সব চিন্তা সাধারণের মধ্যে

ছড়িয়ে নিজেদের আখের গোছাবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। প্রতিটি ক্লাব, গণসংগঠন, লাইব্রেরি, স্কুল, কলেজকে কুক্ষিগত করে নিজেদের ইচ্ছেমতো সাংস্কৃতিক চেতনা মাথায় ঢোকাতে কখনও রাজনৈতিক দলগুলোকে কাজে লাগায় হুজুরের দল। কুক্ষিগত করার জন্য লোভ, ভয়, বলপ্রয়োগ ইত্যাদিকে পাথেয় করে রাজনীতি পেশার মানুষগুলো। কখনও বা সাহায্যের বদান্যতায় সংস্থাগুলোর ইচ্ছেমতো চলার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। আবার কখনও বা ওইসব সংস্থার নেতাদের বিবেক কিনেই সংস্থাকে পকেটে পুরে ফেলে হুজুরের দল। কখনও নিজেদের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে ওই ধরনের সাজানো আন্দোলন শুরু করা হয়; আন্দোলনে শামিল মানুষদের বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টায়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রশক্তি আন্দোলনকারীদের দেশের সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে জাতীয়তাবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, ইত্যাদি ছাপ মেরে দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকারি, বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোর নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে শোধিত মানুষদের এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দেশের শোষিত মানুষরাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

কখনও বা সওদা হতে না চাওয়া উন্নত শির, বিপদজনক নেতাদের চরিত্র-হননের নানা প্রচেষ্টা চালানো হয় সাজানো আন্দোলনকারীদের সাহায্যে।

কখনও বা নেতাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে গুলিবিনিময়ের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়। অথবা গল্প ফাঁদা হয় পতিতাপল্লি রেইড করতে গিয়ে ধরাপড়া নেতার গুলি বিনিময় এবং মৃত্যুর।

এই যে কথাগুলো লিখেছি, এর একটা কথাও কল্পনাপ্রসূত নয়। যখনই কোনও দরিদ্র শোষিত জনগোষ্ঠী ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে, আঘাত হেনেছে হুজুরদের দুর্গে, তখনই সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে শোষকশ্রেণি ও তার সেবক রাষ্ট্রশক্তি এই পদ্ধতিগুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করে চলেছে।

যারা শোষণ করছে তারা চায়, যাদের শোষণ করছি তাদের এমন নানা নেশায় ভুলিয়ে রাখব, মাতিয়ে রাখব যে তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকবে যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোনও দিনই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আন্দোলনকে জয়ী দেখতে চাইলে হুজুরের দল ও তাদের রক্ষার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার আন্দোলন ধ্বংস করতে কী কী কৌশল গ্রহণ করে থাকে সে বিষয়ে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। সম্ভাব্য আক্রমণ বিষয়ে অবহিত থাকলে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা এবং পাল্টা আক্রমণ চালানো সহজতর হয়।

শোষকশ্রেণি বা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন যাঁরা চালাবেন তাঁদের এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিটি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট নজর রাখে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রয়েছে বহু বিভাগ। আমাদের সরকারের ইন্টেলিজেন্ট ডিপার্টমেন্টেরই রয়েছে তিরিশের ওপর বিভাগ বা সেল। ছাত্র, রাজনৈতিকদল, ডাকাত অপরাধ, নকশাল সংগঠন ইত্যাদি প্রত্যেকটা বিভাগের জন্যে রয়েছে সেল। গোয়েন্দারা এইসব সংগঠনগুলোর ওপর নজর রাখেন। এ-ছাড়াও গোয়েন্দা দপ্তরের ও বিভিন্ন থানারই রয়েছে নিজস্ব ইনফর্মার। এই ইনফর্মাররা প্রতিটি সেলেই তথ্য জোগাচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। এরা সরকারি চাকরি করে না। এদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে এক একজন বড় পুলিশ অফিসারদের হাতে থাকে সরকারি খরচে নিজস্ব বিশ্বস্ত ইনফর্মার। এরা কোথায় নেই? কোনও সংগঠন সরকারের পক্ষে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে সন্দেহ করলেই তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনফর্মার। এ-ছাড়া গোয়েন্দারাও নজর রাখেন। সুতরাং বহু আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিষয়েই সরকার ও শোষকশ্রেণি সব সময়ই ওয়াকিবহাল। বিভিন্ন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝে তাকে রুখতে সরকার হাজির করে নানা কৌশল।

এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য কৌশল হল, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে নিজের প্রয়োজনীয় খাতে নিয়ে যাওয়া।

মানুষের চিন্তাধারাকে কোনও একটা বিষেষ খাতে বওয়াতে, চিন্তায় কোনও বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে গাঁথতে যে পদ্ধতিটি এখনও সবচেয়ে বেশি সফল বলে স্বীকৃত, তা হল অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সুযোগ পেলেই মিথ্যেকেও বার বার নানা ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করতে থাকা। কোনও একটি মিথ্যে বিশ্বাসকে মানুষের মাথায় সত্যি বলে ঢোকাতে হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার করে ওই বিশ্বাসে তোমার এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির রয়েছে অগাধ আস্থা ও অচল ভক্তি। সফল রাজনীতিকদের এসব বিষয় জানতে হয়, নইলে শিল্পপতিদের কাছে কলকে পাওয়া যায় না। ওরা ধৈর্য ধরে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন

প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণকে মাঝে মধ্যেই জানাতে থাকে ওদের জ্যোতিষ-বিশ্বাস ও জ্যোতিষ নির্ভরতার কথা, ঈশ্বর বিশ্বাস ও অলৌকিক ক্ষমতাবান ধর্মগুরুদের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তির কথা। এতে কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মগুরুর শিষ্যদের ভোট প্রভাবিত হয়, জনসাধারণের মধ্যে জ্যোতিষ ও ভাগ্য-নির্ভরতা বাড়তে থাকে। কর্মফলে বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, গুরুনির্ভরতা ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেতে থাকে। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ আত্মনিবেদন করতে জানে, আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে দুঃখ ও বঞ্চনাকে ভুলতে জানে কিন্তু লড়াকু হতে জানে না। যে মানুষ লড়াকু নয়, তাকে আবার ভয় কী?

মার্কসবাদের সঙ্গে অপরীক্ষিত এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসনির্ভর জ্যোতিষশাস্ত্রের চূড়ান্ত বিবাদ থাকলেও কিছু কিছু মার্কবাদী মন্ত্রী কিন্তু জ্যোতিষীদের সম্মেলনে হাজির হন প্রধান অতিথি, সভাপতি ইত্যাদি হয়ে। ওইসব সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী-টানিও পাঠান। মেহনতী মানুষের বন্ধু ওইসব মার্কসবাদী দলগুলো তাদের মন্ত্রীদের এমন মার্কস-বাদ-ই কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার ফতোয়া জারি করেন না কেন? কেন এমন অদ্ভুত আচরণ? ওইসব কার্যকলাপ কি শুধুই মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত চ্যুতি বা নীতিভ্রষ্টতার নিদর্শন? না কি ক্ষমতার শাঁসে জলে থাকার পরিণতিতে সাধারণ মানুষের চেতনাকে অদৃষ্টবাদী করে তোলার কূট কৌশল?

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন ওইসব তথাকথিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদ বিরোধী চরমবাস্তববাদী। 'ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবেই' বলে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দলই নির্বাচনের লড়াইতে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না।

মিটিং, মিছিল, প্রচারের বিশাল ব্যয়, কর্মী, পেশিশক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড়, বোমের স্টক, জালিয়াতির নব-নব কৌশলকে কাজে লাগানোর প্রয়াস, বুথ দখল ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিরোধী প্রার্থীকে টেক্কা দিয়েই জেতার চেষ্টা করে।

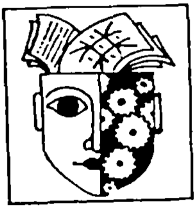

মগজ ধোলাই প্রসঙ্গে
রাজনীতিকদের জ্যোতিষ ও রাজনীতি

তাবৎ ভারতবাসীদের চেতনাকে প্রভাবিত করার মতো একটি ঘটনা ঘটল ২১ জুন '৯১। ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরসিমহা রাও ওই দিন শপথ নিলেন পাঁজিপুঁথি দেখে রাহুর অশুভ দৃষ্টি এড়াতে ১২টা ৫৩ মিনিটে।

পি. ভি. নরসিমহা রাও সুপণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, রাষ্ট্রের কান্ডারি। এমন একজন বিশাল মাপের মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি যখন অগাধ আস্থা পোষণ করেন, তখন সাধারণ মানুষেরও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আস্থা বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত বহু মানুষই এরপর শাস্ত্রটিকে অস্বীকার করাটা কিঞ্চিৎ মূঢ়তা বলে মনে করতেই পারেন। অসাধারণ মানুষের বিশ্বাস সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রভাবিত হলে সাধারণ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে জন্মকালেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। জীবনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আগে থেকেই ঠিক হয়ে রয়েছে। এ অমোঘ, অব্যর্থ।

নির্ধারিত কথার অর্থ— যা ঠিক হয়েই রয়েছে; যার পরিবর্তন সম্ভব নয়। জ্যোতিষীরা দাবি করেন, জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যে শাস্ত্রে-নির্ধারিত পথে বিচার করে একজন মানুষের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য গণনা করা যায়।

মজাটা হল এই, সাধারণ মানুষ যখন শ্রীনরসিমহা রাওয়ের জ্যোতিষ পরামর্শ মেনে শপথ গ্রহণ করার ঘোষণায় শ্রীরাওকে জ্যোতিষশাস্ত্র পরম শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী বলে মনে করছেন, তখন শ্রীনরসিমহা রাও কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর সামান্যতম আস্থা প্রকাশ করে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকেননি। শ্রীশরদ পাওয়ারকে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করার জন্য বিড়লা, হিন্দুজা, আম্বানিদের মতো বিশাল শিল্পপতিদের দোরে দোরে ঘুরছেন। নিজের দলের সাংসদদের সমর্থন আদায় করতে নাকি প্রত্যেক

সমর্থক সাংসদকে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছেন শ্রীশরদ পাওয়ারের শিবির, যাতে শামিল হয়েছিলেন কির্লস্কার, বাজাজ, নুসলি ওয়াদিয়া, গুলাবচাঁদ প্রমুখ শিল্পগোষ্ঠী। শ্রীনরসিমহার পক্ষে সিংহভাগ সাংসদদের সমর্থন নিশ্চিত করতে শ্রীনরসিমহার সমর্থক শিল্পগোষ্ঠীই নাকি অর্থ জুগিয়েছেন। এ-সবই এই বইটির পাঠকদের কাছে পুরোনো খবর হয়ে গেছে। কারণ এই খবর তামাম ভারবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল '৯১-এর ২০, ২১, ২২ জুন। শ্রীনরসিমহা সত্যিই যদি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর নিত্যকার দুপুরের ভাত-ঘুমকে নির্বাসনে পাঠিয়ে শ্রীশরদকে রুখতে শিল্পপতিদের কাছে হত্যে দিয়ে পড়তেন না, পাওয়ার দখলের জন্য প্রাণকে বাজি রেখে লড়াই চালাতেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করে, ভাগ্যকে বিশ্বাস করে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার রুটিনই বজায় রাখতেন। ভাগ্য যদি পূর্বনির্ধারিত থাকে, তবে কে তাকে খণ্ডাবে? এ তো অমোঘ, অব্যর্থ। আর ভাগ্যে যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়া লেখা না থাকে, তবে কোনও চেষ্টাতেই তা হবে না। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বঞ্চিত হলে সে বঞ্চনার কারণ অবশ্যই ভাগ্য; যে ভাগ্য জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে গেছে।

মহা-বিস্ময় জাগে যখন দেখি সুপণ্ডিত, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ শ্রীনরসিমহা রাও কথা ও কাজে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা প্রচার করছেন। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি, নিজের ভাগ্যের লিখনের প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না রেখে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কেন এই দ্বিচারিতা? তবে কি ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ শ্রীরাও চান তাঁর শাসনকালে বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য নিজ-ভাগ্যকেই দায়ী করুক? তাই কি ডংকা বাজিয়ে জ্যোতিষ বিশ্বাসের পক্ষে তাঁর প্রচার? তাঁর এই স্ববিরোধী চরিত্রের কথা দেশবাসীরা যদি তোলে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁদের উদ্দেশে কী বলবেন? তখন কী উপদেশ দেবেন, "হে দরিদ্র-ভারতবাসী, হে মূর্খ-ভারতবাসী, আমি যা বলি তাই কর, যা করি তা কর না।"

যে শিল্পপতি, ধনীদের দেওয়া সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে শ্রীরাওয়ের দল ক্ষমতায় এসেছেন, যে শিল্পপতিদের পছন্দের মানুষ হিসেবে শ্রীরাও নেতা

নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করার চিন্তা নিশ্চয়ই শ্রীরাও বা তাঁর দল কখনওই করবেন না, করতে পারেন না। তেমনটা করলে শ্রীরাও এবং তাঁর দলের সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

১৯৯০-এর নভেম্বর চন্দ্রশেখর যখন প্রধানমন্ত্রী হন এবারের চেয়েও বেশি টাকার খেল হয়েছিল। সে-বারও 'কিংমেকার' শিল্পগোষ্ঠীরাই চন্দ্রশেখরকে পছন্দ করেছিলেন বলেই চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। শিল্পপতিরা নিশ্চয়ই তাঁদের কৃপা করবে, তাঁদের পিছনেই অর্থ ঢালবে, শাসনক্ষমতায় বসাবে, যাঁরা শিল্পপতিদের একান্তই বিশ্বস্ত। অতএব এইসব শাসকগোষ্ঠী ধনকুবেরদের যে বিরোধিতা করতে পারে না, করার সাধ্য নেই এ-কথা অতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে।

সংসদীয় নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা দখলের দিকে এগোতে চাইলে, লোকসভায় বা বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য আসন পেয়ে দাপট বজায় রাখতে চাইলে সেই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে বিপুল অর্থ ঢালতেই হবে। বর্তমানে নির্বাচন মানেই এক-রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল প্রচার ব্যয়, রিগিং, বুথদখল, ছাপ্পা ভোট এ-সব নিয়েই এখনকার নির্বাচন। এ এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মাসলম্যানদের পিছনেও বইয়ে দিতে হয় অর্থের স্রোত। এই শত-সহস্র কোটি টাকা গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের এক-টাকা দু-টাকা বা পাঁচ-টাকা চাঁদায় তোলা যায় না। তোলা হয়ও না।

নির্বাচনী ব্যয়ের শতকরা ৯৯ ভাগেও বেশি টাকা জোগায় ধনকুবেররা। বিনিময়ে তারা এইসব দলগুলোর কাছ থেকে পায় স্বস্তিতে শোষণ চালাবার গ্যারান্টি। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো কৌশল হিসেবে খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় করে দেখাতে চায় "মোরা তোমাদেরই লোক।"

এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন মাঠে-ময়দানে, পত্র-পত্রিকায়, বেতারে, দূরদর্শনে, গরিবি হটানোর কথা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন, মেহনতি মানুষের হাতিয়ার বলে নিজেদের ঘোষণা করেন, তখন কিন্তু এইসব তর্জন গর্জনে শোষকশ্রেণির সুখনিদ্রায় সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটে

না। শোষকশ্রেণি জানে তাদের কৃপাধন্য, তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের এইসব বজ্রনির্ঘোষ স্রেফ ছেলে ভুলোনো ছড়া; সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখার এ এক কৌশল। হুজুরের দল চায় এ-ভাবেই তাদের ক্রীড়নক রাজনৈতিক দলগুলো শোষিতদের আপনজনের মুখোশ পরে শোষিতদের বিভ্রান্ত করুক, যাতে তাদের সম্মিলিত ক্ষোভ দানা বেঁধে বিস্ফোরিত হতে না পারে। এই সমাজ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শোষণ কায়েম রাখার স্বার্থেই শোষণকারীদের দালাল রাজনৈতিক দলগুলো শোষিত সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নানা ভাবে।

হুজুরদের কৃপাধন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার মধুর লোভে সব সময়ই চায় ক্ষমতায় কাছাকাছি থাকতে।

বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে শোষকশ্রেণির দালালির অধিকার লাভের প্রতিযোগিতা।

ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই চায় মানুষ অদৃষ্টবাদী হোক, বিশ্বাস করুক পূর্বজন্মের কর্মফলে, ঘুরপাক খাক নানা সংস্কারের অন্ধকারে। এমন বিশ্বাসগুলো শোষিত মানুষগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য দায়ী করবে নিজের ভাগ্যকে, কর্মফলকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে, সমাজ সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুক্তিবাদী দর্শনের বিশাল ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই যুক্তিবাদী দর্শনের সঠিক প্রয়োগের জন্যেই সমাজ সম্পর্কিত বেশ কিছু শব্দ বা বিষয় সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই সব শব্দ বা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ জানা, নব-মূল্যায়ন করা, নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন। এই শব্দ বা বিষয়ের মধ্যে রয়েছে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা', 'গণতন্ত্র', 'দেশপ্রেম', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'জাতীয়তাবাদ', 'জনসেবা', ইত্যাদি বহু কিছু, যে-সব নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলো ভ্রান্ত এবং শাসক ও শোষকশ্রেণি তাদের শ্রেণি স্বার্থেই ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এইসব ভ্রান্ত ধারণাকেই জিইয়ে রাখতে, পুষ্ট করতে সচেষ্ট। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় বিবেচনায় এমনই কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি।

অধ্যায় : নয়

অতি ব্যবহৃত কিছু শব্দ : সিন্দুকেতে মন ভরেছে ভেতরে তার কি আছে কেই বা রাখে খোঁজ?

মূল্যবোধ : কে কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা?

'মূল্যবোধ' শব্দটি 'মূল্য' এবং 'বোধ' শব্দ দুটির সমষ্টি। 'মূল্য' বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কোনও কিছুর সঙ্গে মুদ্রার বিনিময় হার। কিন্তু আমরা যদি বলি— "পথের পাঁচালী বিদেশ থেকে সম্মান আনার আগে আমরা সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম", এই বাক্যটির ক্ষেত্রে 'মূল্য' শব্দটি 'মুদ্রা বিনিময় হার' হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে 'মূল্যায়ন' শব্দটি 'যোগ্যতা নিরূপণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'বোধ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান', 'বুদ্ধি', 'চৈতন্য', 'বোঝা' অর্থাৎ কোনও ঘটনা মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-তাই হল সে সম্পর্কে আমাদের বোধ।

'মূল্যবোধ' শব্দটির একটা গ্রহণযোগ্য অর্থ আমরা পেলাম—'যোগ্যতা বোঝা' বা 'যোগ্যতা নিরূপণ'-এর ক্ষমতা এবং প্রবণতা। Value-র বাংলা অর্থ 'যোগ্যতা'। 'Sense of Value-র বাংলা হিসেবেই আমরা 'মূল্যবোধ' শব্দটির ব্যবহার করি, 'Price'-এর বাংলা অর্থ হিসেবে নয়। এই 'মূল্যবোধ' শব্দটির সাহায্যে আমরা কোনও কিছুর ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির যোগ্যতা পরিমাপ করি।

এই 'বোধ' বা 'যোগ্যতা' বোঝার ক্ষমতা সবার সমান নয়। তথাকথিত অলৌকিক রহস্য-ভেদের ক্ষেত্রে আমার যা বোধশক্তি তা একজন জারোয়ার চেয়ে যতগুণ বেশি, তার চেয়েও বোধহয় বেশিগুণ বেশি আমার ফুটবল

বোধশক্তির তুলনায় পেলে বা মারাদোনার ফুটবল বোধশক্তি।

'মূল্যবোধ' আপেক্ষিক। মূল্যের যে পরিমাপ আপনি করছেন, অর্থাৎ 'যোগ্যতা নিরূপণ' করছেন, তা অন্যের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, আবার ভালোও মনে হতে পারে। আপনার কাছে যা আদর্শ, অন্যের কাছে তা অনাদর্শও হতে পারে।

সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোধ পাল্টায়। আবার একই দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধ পিছিয়ে থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয় মনে হতেই পারে।

এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ। এক সময় নারী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি অনগ্রসর রক্ষণশীলদের চোখে সমাজের অবক্ষয় বলেই ঘোষিত হয়েছে। রামমোহন রায় সতীদাহ-প্রথা রোধে আন্দোলন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন অনেকের চোখেই খারাপ ঠেকেছে। তাদের মনে হয়েছে এই আন্দোলন সমাজের অবক্ষয় ঘটাবে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তায় প্রভাবিত মানুষদের চোখে এই আন্দোলন মোটেই অবক্ষয় ছিল না, ছিল শ্রেয় মূল্যবোধ যা সমাজ পোষণ করছে না। 'মূল্যবোধ' আপেক্ষিক বলেই বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা কারও চোখে ভালো, কারও চোখে খারাপ বলে মনে হয়েছে।

'মূল্যবোধ' বিষয়টিকে এবার আমরা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ভাবার চেষ্টা করি আসুন। মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যৌথ ভাবনাকে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে ব্যক্তির সমষ্টিকে নিয়েই যখন সমাজ, তখন অনেক ব্যক্তি-ভাবনার ব্যাখ্যা থেকেই তো সমষ্টির ভাবনার হদিশ মেলা উচিত। অথবা গোষ্ঠীর ভাবনা ধরে আমরা পৌঁছতে পারি ব্যক্তি ভাবনায়। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন অতি সরলীকৃত নয় যে, সবসময় ব্যক্তি ভাবনা থেকে গোষ্ঠী ভাবনায় অথবা গোষ্ঠী ভাবনা থেকে ব্যক্তি ভাবনায় পৌঁছে যাওয়া যায় সহজ-সরল নিয়মের সহায়তায়। অফিস টাইমের ট্রেনের একটি লেডিজ কামরায় যদি

সমীক্ষা চালান, দেখতে পাবেন এঁদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সুকুমারবৃত্তি, সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা, নাচ, গান, সাহিত্য, নাটক, সিনেমার প্রতি টনটনে টান। এঁরাও ব্যক্তি জীবনে কারও না কারও স্নেহময়ী জননী, ভগ্নী, কারও প্রেমময়ী প্রেমিকা, কারও স্ত্রী, কারও বা কন্যা। ব্যক্তি ভাবনার এমন মহিলাদেরই সমষ্টিগত অন্য এক চেহারার পরিচয় পেয়েছি মাঝে-মধ্যে। কখনও কখনও খবর কাগজের খবর হয়েছে—লেডিজ কম্পার্টমেন্টে হঠাৎ উঠে পড়া কোনও পুরুষকে মহিলাগোষ্ঠীর তীব্র অপমান ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাই কমপার্টমেন্টে একটি পুরুষকে একা পেতেই সম্মিলিত মহিলাদের যে নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়েছে, তার হদিশ পেতে ব্যক্তি ভাবনা ছেড়ে যৌথ ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হলেও বাড়ি যেমন শুধুমাত্র ইটের পর ইট সাজানোর ব্যাপার নয়, তেমনই ব্যক্তি নিয়ে সমাজ হলেও সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়। বাড়তি কিছু। তাই শুধুমাত্র মনস্তত্ত্বের সাহায্যে সমাজ জীবনের ভাবনা বা সমাজ জীবনের ধারাকে ধরা নাও যেতে পারে।

অনেক সময় এমনও হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার রেশ। এই ভাবনা থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাতে রূপ পাওয়ার মধ্যে যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা তত্ত্ব রয়েছে— সেও সমাজতত্ত্ব।

'মূল্যবোধ' বিষয়টি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একটু ভাবনার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের প্রকাশ ও বিকাশ তার সামাজিক পরিবেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। পরিবেশগতভাবে কিছু মানুষের মনে হতেই পারে-ঈশ্বরে অবিশ্বাস নীতিহীনতারই পরিচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই পরিচয়। আবার এই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই কেউ কেউ মনে করতে পারেন-যুক্তিহীন ঈশ্বর-বিশ্বাস, অদৃষ্ট-বিশ্বাস নীতিহীন অন্ধ কুসংস্কার বই কিছুই নয়। বিপরীত মানসিকতার এই দুই শ্রেণির মানুষই কিন্ত

পরিবেশগত ভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত মানুষ, শিক্ষক, প্রচার মাধ্যম, সাহিত্য, নাটক, চলচিত্র, দূরদর্শন, আলোচনা সভা, বই-পত্তর, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি অনেক কিছুই, যা এরই কোনও একটি, যা মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে।

এমন বক্তব্য পেশ করার পর কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারেন, আমাদের মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য যদি পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত না হয়ে পরিবেশ দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ আমাদের মানসিক বৃত্তির উপর বংশগতির চেয়ে পরিবেশই যদি বেশি প্রভাবশালী হয় তবে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রেখে পশুদের মধ্যেও তো মানবিক-গুণ বা মানবিক-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো সম্ভব-এমন তত্ত্বকেও মেনে নিতে হয়।

দু-কথায় উত্তরটা এই—মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হওয়ার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি- এ সবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে, হাঁটা-চলায়, খাদ্যাভ্যাসে, পানীয় গ্রহণের কায়দায়, ভাব বিনিময়ের পদ্ধতিতে পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতো তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না; কারণ এই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দু'য়েরই প্রভাব বিদ্যমান।

আবার একই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পরিচয়ও আমরা পাই বইকি। কেন এমনটা হয়? এই প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আসবে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন প্রবণতার কথা। যমজ হওয়ার সুবাদে একই ধরনের গাত্র-বর্ণ, একই ধরণের দেহ-গঠন এবং একই ধরনের মুখাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র-'ইন্ডিভিজুয়াল', প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা, উত্তেজনা-নিস্তেজনা, আবেগপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ধর্মগুলো ভিন্নতর। তাই একই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে বেড়ে ওঠার দরুন সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাবেরও নানা তারতম্য ঘটে, রকমফের ঘটে এমনকী, ভিন্নতর, নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষও দেখা যায়। অনেকসময়ই দেখা যায় সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয় উভয়েরই সঙ্গে একটা বিরোধের ভাব পোষণ করে থাকে। সমাজতত্ত্ব যেন একটা ধরণা উপর থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে। ব্যক্তির উপর বহুর চিন্তা বা শাসকশ্রেণির চিন্তা চাপানোর মধ্যে অনেক সময় দেখা দেয় বিরোধ।

যে সমাজে শোষণ আছে, সে সমাজে শোষিত থাকবেই, থাকবে শোষক। শোষকরা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই চালিয়ে থাকে শাসন। নির্বাচননির্ভর গণতন্ত্রে বাক্সে জেতার মতো ভোট ফেলতে 'বুথ জ্যাম', 'রিগিং', মস্তান বাহিনী, প্রচার, এজেন্ট নিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়—যা বিপুল ব্যায়সাধ্য, এবং যে ব্যয়ভারের পুরোটাই জোগায় শোষকশ্রেণি। তার ফলশ্রুতিতে

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে বহু নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়। এই নীতিবোধ বা মূল্যবোধ ব্যাপক প্রচারের ফলে ব্যাপক মগজ ধোলাইয়ের ফলে বহুর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে অথবা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পড়ার ফলে, কিংবা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার ফলে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই—**এক:** দেশপ্রেম মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়, দেশের

সংখ্যাগুরু মানুষের প্রতি প্রেম। **দুই :** সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারতসেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর। **তিন:** ঈশ্বর, ভূত, কর্মফল, অদৃষ্ট এবং অলৌকিকত্বের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। শোষক ও শাসকশ্রেণি শোষণকে কায়েম রাখতেই শোষিতদের মধ্যে এই ভ্রান্ত চিন্তাগুলোর প্রসারকামী। **চার :** দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, যৌন স্বত্বাধিকার নয়—ইত্যাদি আরও বহুতর মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণায়, তবে এই পরিবর্তনটা হবে অবশ্যই কাম্য। পূর্বতন পুরুষদের কাছে, সংখ্যাগুরু মানুষদের কাছে, পশ্চাদবর্তী মানুষদের কাছে, মগজ ধোলাইয়ের শিকার মানুষদের কাছে আমাদের অগ্রবর্তী চিন্তার ফসল হিসাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধকে 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী, সুস্থ চেতনার মুক্তিকামী মানুষদের কাছে এই যুগোচিত পরিবর্তিত চিন্তা মূল্যবোধের উত্তরণ। এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার অর্থ অবৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ক্ষয়। মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই 'অবক্ষয়' অবশ্যই নয়। শাসকশ্রেণির চাপিয়ে দেওয়া নীতির ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আপনার, আমার সবারই সব সময়ই থেকে যাবে। এই প্রতিবাদকেই আপনি, আমি সক্রিয় চেষ্টার ফলে যৌথ চেহারা দিতে পারি। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জন সমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতেই পারে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একই সঙ্গে বিরোধ এবং সংগতির।

পৃথিবীতে সর্বকালে বিপ্লবীদের সংগ্রাম চেতনা মুক্তির সংগ্রাম, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শোষণ মুক্তির সংগ্রাম। মানব প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সেই শক্তিগুলোই প্রধান, যে সমস্ত শক্তি সমাজের উপর নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয়-অর্থাৎ শোষক ও শাসকশ্রেণি। আমাদের শাসকশ্রেণি যে দুর্নীতির পরিমণ্ডল ও রাজনৈতিক অভ্যাস গড়ে তুলেছে তা অবশ্যই মূল্যবোধে অবক্ষয়কারী। এই রাজনৈতিক অভ্যাসের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনকে আমরা যদি গুলিয়ে ফেলে বিচারে বসি, তাহলে ভুল হবে। গান্ধিবাদী দর্শন, মার্কসবাদী দর্শন ও জাতীয়তাবাদী দর্শন—সকল দর্শনেই অনেক ভালো ভালো কথা আছে অতএব

গান্ধিবাদী কংগ্রেস, মার্কসবাদী বামপন্থী অথবা জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি সকলেই ভালো রাজনৈতিক দর্শনযুক্ত দল এবং ভালো দল—এমনটা ভাবলে বেজায় ভুল করা হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শনের সঙ্গে আচরণের মধ্যে যে অসংগতি তাই হল দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অভ্যাস-যা মূল্যবোধকে ধ্বংস করার পক্ষে পারমাণবিক বোমা।

নিপীড়িত মানুষের দর্শন হিসেবে মার্কসবাদী দর্শন এক সময় এ দেশের কিছু অঞ্চলের মানুষদের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিল। এই আস্থা অর্জনের পিছনে ছিল দলীয় নেতা ও কর্মীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ত্যাগস্বীকারের ইচ্ছে, রাজনৈতিক দর্শন ও আচরণের মধ্যে সংগতি। তারপর সংসদীয় গণতন্ত্রের লাগাম নিজেদের হাতে নিতে মার্কসবাদী দলকেও সেই রাজনৈতিক অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে যে অভ্যাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে চরম দুর্নীতি। ভারতবর্ষে নির্বাচন-কেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরন্তর চলেছে বিশাল টাকার খেলা, নীতিকে শিকেয় তুলে যে কোনও উপায়ে ভোট পাওয়ার চেষ্টা এবং ভোট পাওয়ার আগে ও ভোট পাওয়ার পরের আচরণের মধ্যে চরম অসংগতি। কিছু রাজ্যে ক্ষমতার গদিতে বসা মার্কসবাদী দলও ক্ষমতার গদিতে থাকার তীব্র আগ্রহে মার্কসীয় দর্শনকে শিকেয় তুলে রেখে চালু রাজনৈতিক অভ্যাসের সঙ্গে সড়োগড়ো হতে সচেষ্ট থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী কমরেডদের পরিবর্তে প্রমোটার মার্কসবাদী, জমি-বাড়ির দালাল মার্কবাদী, বাজারের তোলা আদায়কারী মার্কসবাদী, চোরা কারবারি মার্কসবাদী, মস্তান মার্কসবাদী, ধর্ষক মার্কসবাদী ইত্যাদি ক্ষমতার শাঁসে-জলে পুষ্ট মার্কসবাদীতে দল ছেয়েছে। বহু 'বিপ্লবী' আজ হুজুরদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

শোষিত মানুষদের দুঃখ ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আকুতি থেকে মানুষ মহৎ আদর্শের অনুসন্ধান চালিয়েছে। নিরন্তর সংগ্রাম ও বহু রক্তের বিনিময়ে কখনও কোনও আদর্শবাদ ছিনিয়ে এনেছে নিজেদের মুক্তি, জয়, দখল করেছে রাষ্ট্রক্ষমতা। ইতিহাস থেকে আমরা বারবার শিক্ষা নিয়েছি—রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কিছুকাল বাদে সেই মহৎ আদর্শের প্রচারক নেতারা আদর্শ বোধের অন্তর্গত ত্যাগের বোধকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ভোগসর্বস্বতায় নিজেদের ডুবিয়ে

রাখতে দুর্নীতিকে নিজেদের বেঁচে-থাকার শ্বাসপ্রশ্বাস করে নিয়েছে। সুন্দর কথা ও অসুন্দর আচরণের অসংগতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। নেতৃত্বের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে, বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে।

কিন্তু সংগ্রামী মুক্তিকামী মানুষ আবারও নতুন আশায় বুক বেঁধেছে, নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের জয়কে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছে। ফলে নতুন মূল্যবোধের মধ্য দিয়েই অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে বিপ্লবের।

ইতিহাসে নবযুগ আসবেই—এই প্রত্যয় নিয়ে আসুন, প্রতিটি সমাজ-সচেতন মানুষ মানবিকতার বিকাশকামী, মুক্তিকামী নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই।

প্রেম ও বিবাহ : বন্ধন মেনো না, ভাঙো অচলায়তন

২৭ আগস্ট ১৯৯২ 'আজকাল' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল—কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) -এর এক নেতাকে প্রেম করার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়েছে এবং দলের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমিতির সদস্য পাচু রায়ের একটি চিঠি আজকালে প্রকাশিত হয় ৩০ আগস্ট। আলোচনার শুরুতেই চিঠিটি তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

যতই কমিউনিস্ট পার্টি করি, যতই মার্কসবাদের কথা বলি, যতই 'লেনিনবাদ লেনিনবাদ' বলে চেঁচাই, সংস্কার আমাদের চেতনার আণবিক স্তরে বদ্ধমূল। বৃদ্ধ-বিপত্নীক সি পি এম নেতাটি ভুল বা অন্যায় কী করলেন বুঝতে পারলাম না। তাঁর প্রেমিকা বিগত দশ বছর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্করহিত। তাহলে এখানে পরস্পরের বন্ধু হয়ে বসবাস করতে অসুবিধা কোথায়। সাংবিধানিক অসুবিধা?

বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি বলে? নাকি বুড়ো বয়সে আবার, প্রেম-ভালবাসা কী? ওসব তো যৌবনের ব্যাপার, শারীরিক সক্ষমতার ব্যাপার সি পি এম-এর হাওড়া-নেতৃত্ব কি এই লাইনে ভাবছেন? আসলে সংবিধানের প্রতি, বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি এক দূরপনেয় আনুগত্য আমাদের মজ্জার আণবিক স্তরে প্রোথিত। মুখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বি জে পি-র বিরুদ্ধে ভোট বাক্সটাকে সামনে রেখে আসর গরম করা যায়, মালিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়, ২২ এপ্রিল সাড়ম্বরে লেনিনের জন্মদিন পালন করা যায়, ৫ মে কার্ল মার্কসের জন্মদিনে মালা-ফালা দেওয়া যায়। কিন্তু মাটির কাছের সমস্যাগুলি যখন আসে তখন মাথার ভিতর বুর্জোয়া জমিদারতন্ত্রের পোকাগুলি নড়েচড়ে বসে। তারাই তখন প্রাধান্য পায়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাতও করেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। স্ক্রুপস্কায়াকে কোনদিন সেই অর্থে বিয়ে করেননি। কার্ল মার্কস প্রচণ্ড ভালবাসতেন জেনি মার্কসকে, তৎসত্ত্বেও তাঁদের পরিচারিকার প্রেমে পড়েছিলেন কার্ল মার্কস। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাঁদের মিলিত প্রয়াসে। মাও সে তুং প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতেই পার্টির একজন সহকর্মীকে বিয়ে করেছিলেন, পার্টির পলিটব্যুরোর সামনে। একদিন বিবাহপ্রথা এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল পরিবারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে। পরিবারতন্ত্র গর্বিত হয়েছিল শ্রেণিশোষণকে বজায় রাখতে। যদি কোনওদিন সাম্যবাদ আসে তবে শ্রেণিশোষণ যেমন বিলুপ্ত হবে, তেমনি লুপ্ত হবে পরিবারের প্রচলিত কাঠামো, লোপ পাবে বিবাহ নামক বহুলালিত প্রতিষ্ঠানটি।

সাধারণ মানুষ এতসব বুঝবেন না। হয়ত, তাঁরা বাঁচতে চাইবেন পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে। কিন্তু যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে সাইনবোর্ডে প্রচার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও কি বুর্জোয়া অনুশাসন এত তীব্রভাবে প্রযোজ্য? যারা কি এঙ্গেলস পড়েননি? নাকি ভোটের ডামাডোলে সে-সব ভুলে গেছেন বেমালুম। দলত্যাগী শচীন্দ্রনাথের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল এই কারণে যে, পার্টির চেয়ার অটুট রাখতে মার্কসবাদগ্রাহ্য সুন্দর সম্পর্ককে তিনি অসম্মান করেননি।

এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, আপনি কি এই চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে একমত? উত্তরটা স্বভাবতই হয়েছে— হ্যাঁ। অমনি এমন প্রশ্নও অনেকে করেছেন, কার্ল মার্কস-এর স্ত্রী অথবা মাও সে তুং-এর স্ত্রী যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে সহবাস করতেন,

তাহলে কি মার্কস বা মাও সে তুং বাস্তবিকই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতেন?

প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর দিয়েছিলাম। যেহেতু দুই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষের স্ত্রীরা এমন ঘটনা ঘটাননি এবং চরিত্রগুলির কেউই আজ জীবিত নন, তাই ভবিষ্যতে এমন ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও শূন্য। অতএব মার্কস ও মাও কী করতে পারতেন এমন সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্যে যে কোনওটিই ঠিক বা বেঠিক হতেই পারত। মার্কস ও মাও ঠিক কী করতেন, দু'জনের মধ্যে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত কি না —এ সবের সঠিক উত্তর দেওয়া যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন এ বিষয়ে আমিই বা কী উত্তর দেব?

পুরুষ ও নারীর 'স্বামী-স্ত্রী' জাতীয় কোনও স্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠানিক বিবাহের ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পত্রিকা খুলে 'পাত্রী চাই' -এর বিজ্ঞাপনের দিকে নজর দিলেই দেখতে পাবেন এ দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি এ, আই এ এস, আই পি এস, বি সি এস, ব্যাঙ্ক অফিসার ইত্যাদি পদের হীরের টুকরো ছেলেরা উর্বশী, মেনকা, রম্ভার খোঁজ করছেন। আর 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনের দিকে যদি চোখ বোলান তাহলে দেখতে পাবেন সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়েরা হীরের টুকরো ছেলে খুঁজছেন। এক্ষেত্রে সাধারণত হীরের টুকরো ছেলেরা তাঁর সম্ভাব্য স্ত্রীকে গাড়ি, ফ্ল্যাট, ফ্রিজ, ভি সি আর ইত্যাদির মতোই আভিজাত্যের প্রতীক অর্থাৎ স্ট্যাটাস সিম্বল একটি বস্তু সামগ্রী হিসেবেই দেখেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা অথবা সরস্বতীর দলও সাধারণত একইভাবে তাঁদের সম্ভাব্য স্বামীটিকে আর পাঁচটা স্ট্যাটাস নির্ধারক বস্তুসামগ্রী হিসেবেই বিবেচনা করেন। নারীরা যতই নারী স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান অধিকার দাবি করুন না কেন, বেকার ছেলে বিয়ে করতে তো কখনোওই বিজ্ঞাপন দেন না? তবে বেকার মেয়েরা কী করে প্রত্যাশা করেন রাজপুত্তুররা তাঁদের বিয়ে করবেন? আসলে

মেয়েদের চেতনার অণুতে অণুতে সংস্কারের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে স্বামীকে আভিজাত্যের নিদর্শন একটি বস্তু হিসেবে পরিমাপ করা, স্বামীকে নিজের চেয়ে অনেক বড় মাপের হিসেবে চাওয়া, নিজের ওপর স্বামীর স্বত্বাধিকার মেনে নেওয়া। এই চাওয়ার

মধ্যে কোনও রকম ভাবেই একটি নতুন পুরুষের সঙ্গে আপন বন্ধু হিসেবে সম্পর্ক স্থাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখতে পাই না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে একটি ঘটনার কথা। ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের অন্যতম এক চরিত্র এই ঘটনার নায়ক। নায়কের প্রেমে পড়লেন এক অতি সাধারণ দেখতে এম এ পাশ ব্যাঙ্ক কেরানি। নায়কের সঙ্গে মাঠে, পার্টিতে সর্বত্র তাঁকে বিচরণ করতে দেখা গেল। এক সময় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই নায়ককে তাঁর স্থান ছেড়ে দিতে হল নতুন প্রতিভার কাছে। খেলাহীন নায়ক গ্ল্যামারের জগৎ থেকে ঝপ করে বিদায় নিতেই নায়িকাও বিদায় নেওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন বন্দি পাখির মতোই। নায়কের অনুরোধে আমি নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে বসেছিলাম। নায়িকা দেখলাম বেশ কয়েক বছর পর হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন—নায়কের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল, নায়ক শিডিউলকাস্ট, নায়ক চাকরি জীবনে মামুলি ব্যাঙ্ক কেরানি, নায়ক ভালো ইংরেজি বলতে পারেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ যেগুলো নায়কের বিশাল 'ডিসকোয়ালিফিকেশন' বলে মনে হচ্ছে, তার কোনোটাই কয়েক বছর আগেও নায়িকার অজানা ছিল না—আমি জানি। কিন্তু এতদিন পর আজ নায়িকার মাথায় এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল কেন— এমন মানুষটিকে বিয়ে করলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সামনে মাথা হেঁট হয়ে যাবে, এমন মানুষকে আর যাই হোক জীবনের নায়ক করা যায় না।

গ্ল্যামারের জগৎ থেকে প্রেমিকের বিদায় ঘোষিত হতেই প্রেমিকা তাঁর হৃদয় থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, 'স্বামী' নামক বস্তুটিকে স্ট্যাটাস সিম্বল হতে হবে এই ধারণা থেকেই। এটা কোনও 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা বা 'ব্যতিক্রম' ঘটনা নয়। এটাই আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক চিত্র, এটাই আমাদের সমাজ জীবনের মানসিকতার ছবি।

নারীরা যেমন সাধারণভাবে তাঁর চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন পুরুষকে জীবনসঙ্গী করতে একেবারেই নারাজ, তেমনই সমব্যক্তিত্বসম্পন্ন,

সমপর্যায়ের অথবা উচ্চতর পর্যায়ের নারীকে দাম্পত্যজীবনে বন্ধু করে নিতে পুরুষরা একেবারেই গররাজি। ব্যতিক্রম নারী ও পুরুষ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এতই কম যে, শতকরা হিসেবের মধ্যে আসে না।

দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত যখন হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, তখন প্রথম শর্ত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে এ-সমাজ যদি অন্য কোনও পরিমাপকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, তবে তাকে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ সচেতন মানুষরা মেনে নেবে কেন?

কেন এমন একটা অসুস্থ মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষ দাম্পত্য সম্পর্ক? এর জন্য অবশ্যই দায়ী সামাজিক পরিবেশ—যেখানে আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক পরিমাপ পদ্ধতি, যেখানে আমরা নারীর আদর্শ বলতে সতীত্ব এবং পরিপূর্ণতা বলতে মাতৃত্বকে চিহ্নিত করি, যেখানে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দূরত্ব শত-যোজন হলেও হিমালয়ের চেয়ে ভারী সেই সম্পর্ককে বয়ে বেড়ানোর মধ্যেই সুনীতিকে খুঁজে পাই, যে পরিবেশ শৈশব থেকে আমাদের কানে মন্ত্র জপেছে, ছেলেরা সোনার মতো, কোনও কলঙ্কেই যা মলিন হয় না, আর নারী জীবনে কলঙ্ক স্পর্শ করলে তা কখনওই মোছে না। এমনি হাজারো জানা-বোঝা-শোনা আমাদের চিন্তাকে আমাদের সংস্কারকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। নারী-পুরুষের যুগল সম্পর্ক বিষয়ে এমন যুক্তিহীন চিন্তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের নীতিবোধ।

সমাজে যে শৃঙ্খলা আনতে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের সূচনা, সেই বিবাহই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীদের শৃঙ্খলিত করার এক প্রক্রিয়া।

নারী প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে পিতার, বিবাহিত যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনতা অবনত মস্তকে আজও মেনে চলেছে। পুরুষ-শাসিত এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'কোটিতে গুটিক' নারী বিদ্রোহিণী হয়েছেন, শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠেরা দীর্ঘকালীন মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে পুরুষের অধীনতা মেনে নেওয়ার মধ্যেই সুখ খুঁজে পেয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল একবার তীব্র বিদ্রূপ মেশানো রসিকতায় মন্তব্য করেছিলেন—পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বাধীনতা না থাকলেও পুরুষদের

ছিল। তারা সুখী ছিল। জনসংখ্যার অর্ধেক সুখী থাকা কম কথা নয়। পরাধীন নারী সমাজের কিয়দংশও অসুখী ছিল না।

এইসব প্রাতিষ্ঠানিক বিয়েতে যেহেতু পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত মিলের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেয়ে বস্তু সামগ্রী হিসেবে উভয়কে বিবেচনা করতে বেশি আগ্রহী থাকেন, তাই এই ধরনের বিয়ের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যৌন স্বত্বাধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়। মতাদর্শগতভাবে মিলহীন, প্রেমহীন, গভীর বন্ধুত্বহীন এমন দেহ-মিলনকে 'সুবিধাবাদী লাম্পট্য' ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা যায় কি? এই ধরনের বিয়ে থেকে সাধারণত গভীর ও সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে 'রুম মেট' জাতীয় এক ধরনের পরিচিতের সম্পর্ক যা, এক সঙ্গে থাকা, খাওয়া ও ঘুমোনোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সম্পর্ক যেহেতু মতাদর্শগত মিল ছাড়াই গড়ে ওঠে, তাই স্বামী-রত্নটির জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে এবং তার দরুন পারিবারিক স্ট্যাটাসের বিশাল রকম পতন ঘটলে স্বামীগর্বে ও স্বামী প্রেমে মাতোয়ারা স্ত্রীর প্রেমও চটকে যায়—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমনটা হয়। এরপরও প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক অবশ্যই টিকে থাকে— কিন্তু তা ভালোবাসাহীন, বন্ধুত্বহীন ভাবেই। আর্থিক বিপর্যয়ে প্রেম বিপর্যস্ত হবে— এমন পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু মতাদর্শগত মিল থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ক্ষেত্রে শূন্য। মতাদর্শগত মিলন থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ভাঙে না, ভাঙে মতাদর্শের সংঘাতে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর ওপর স্ত্রীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, তেমনি অনেক সময় সামাজিক পরিবেশগত কারণে অনেক নারী ধরেই নেন স্বামী পুত্র-কন্যার সেবায় জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা। আপনি যখন মা হিসেবে ছেলের জামা-প্যান্ট ধোয়া, ইস্ত্রি করা, স্কুলের টিফিন তৈরি করে গুছিয়ে দেওয়া, জুতোর পালিশ ঠিক রাখা ইত্যাদি কাজগুলো করেন স্নেহময় জননীর মহান কর্তব্য হিসেবে, তখন একেবারের জন্যেও কি ভাবছেন আপনার এমনতর কাজ-কর্মের ফলে যৌবনে পৌঁছে আপনার ছেলে প্রত্যাশা করবে তার স্ত্রীও এমনি করে গৃহকর্ম ও শিশুপালনের কাজগুলো একা হাতেই সামলাক। সে তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে গৃহকর্ম, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে না। আপনার মেয়ে যৌবনে পৌঁছে আপনার প্রভাবে এটাই ধরে নেবে এসব কাজ করার একক দায়িত্ব একজন

আদর্শ স্ত্রী। ও মা হিসেবে তারই। এখনও আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত স্ত্রী চাকুরিরতা হলেও তার উপরই বর্তায় গৃহকর্ম ও শিশুপালনের ঝক্কি। এমন এক অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ভাগ পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যেমন পুরুষদের ওপর বর্তায়, তেমনই কিছুটা দায়ভাগ অবশ্যই নারীদের যাঁরা এই ধারাকে স্থায়ী রাখার মানসিকতা সন্তানদের মধ্যে তৈরি করে চলেছেন।

আমার এসব কথা অনেকের কাছেই নিন্দিত হবে জানি। এই ধরনের কথা বলার দরুন ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কথা শুনতে হয়েছে। যেমন, "এমনতর মতের বিকাশ সমাজে স্বেচ্ছাচারিতাই বৃদ্ধি করবে। নারীমুক্তির নামে, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার অর্জনের নামে পশ্চিম দুনিয়ার নারীরা ষাটের দশকে যে অন্তর্বাস পোড়ানোর আন্দোলনে নেমে ছিলেন তার পিছনে যৌক্তিকতা রয়েছে বলে কি আপনি রায় দেবেন?" আমার এক পরিচিতা এ প্রশ্নও রেখেছিলেন, "আপনি যে সব যুক্তি মুখে দেন, কাজের বেলায় সে সব যুক্তিকে কি মেনে নিতে পারেন? আপনার স্ত্রী যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলেন, আপনি কি পারবেন সেই সম্পর্ককে মেনে নিতে?" আর এক পরিচিতা একথাও বলেছিলেন, "আমি আপনার যুক্তিতেই বিশ্বাস করি। মনে করি, আমি স্বামীর কেনা দাসী নই। যার সঙ্গে ইচ্ছে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলব। জীবনকে উপভোগ করব। আমার এমন জীবন যাপন পদ্ধতিকে আপনি ঘৃণা করেন—আমি বুঝি। যদি ঘৃণাই করেন তো মুখে নারীমুক্তির কথা বলেন কেন? এ কি ভণ্ডামি নয়?"

খোলামনে এইসব নিন্দার যৌক্তিকতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে বসলে মন্দ হয় না। প্রতিবাদীরা আসলে 'মুক্তি', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থই ধরতে পারেননি। মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন কোনও আন্দোলনই প্রকৃত অর্থে মানব প্রগতি, মুক্তি বা স্বাধীনতা আনতে পারে না। পৃথিবীতে সর্বকালে প্রগতিবাদী, মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী, বিপ্লবীদের সংগ্রাম মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন অনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রকৃত মুক্তিকামী ও স্বাধীনতাকামীদের চিন্তাকে ঘুলিয়ে দিতে পারে মাত্র—কিন্তু কোনও অর্থেই মূল্যবোধহীন আন্দোলন 'মানব-মুক্তির' বা 'শ্রেণি মুক্তি'র সমার্থক শব্দ হয়ে উঠতে পারে না। যা হয়ে উঠতে পারে তা হল উচ্ছৃঙ্খলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়।

নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির নামে ষাটের দশকে অন্তর্বাস পোড়ানোর যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তারই পরিণতি কানাডায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে নারীদের অভিনব বিক্ষোভ। সে দেশের আইনে পুরুষরা অনাবৃত বক্ষে

প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে, নারীরা পারে না। নারীরা বক্ষ উন্মুক্ত রেখে ঘুরে বেড়ালে অশালীন আচরণের দায়ে পড়তে হয়। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে কিছু নারী মিছিল করে পথে নেমেছিলেন বক্ষ অনাবৃত রেখেই। অর্থাৎ আইন অমান্য।

পাশ্চাত্য নারীমুক্তির আন্দোলনে দেখতে পাই দর্শনের পরিবর্তে ইস্যু ভিত্তিক ধাঁচ। কখনও ওরা নারীমুক্তির দাবি ঘোষণা করেছে অন্তর্বাস পুড়িয়ে, কখনও বা প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত ও নগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নারীর মুক্তিকে আবিষ্কার করেছে। কখনও বা নারীকেই নারীর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে স্বাধীনতার পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে। এই নারীমুক্তির নেত্রীরা যেসব দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলন আনবেন বলে মনে করছেন. সেই দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এর দ্বারা নারী সমাজের মুক্তি কখনওই প্রতিষ্ঠিত হবে না, হতে পারে না। অনাবৃত বক্ষ বা শরীর নিয়ে ঘোরা যদি নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়, তবে বলতেই হয় ভারতীয় নারীরা মুক্ত নারী—কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজন মেটাবার মতো কাপড় কেনার সামর্থ্যই যেখানে নেই, সেখানে সংখ্যাগুরু নারীরা যে ব্লাউজ এবং তারও তলায় অন্তর্বাস পরবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাদের এই অন্তর্বাস পরিধান না করা নারী প্রগতি এবং নারীমুক্তিরই সাক্ষ্য বহনকারী ভাবলে তা হবে অযৌক্তিক। 'মুক্তি', 'প্রগতি', 'স্বাধীনতা' শব্দগুলোর সঙ্গে 'মূল্যবোধ' ও 'দর্শন'-এর সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। আর তাই মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন, তথাকথিত নারীবাদী আন্দোলনকে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নামে চিহ্নিত করা যায় না।

একই ভাবে কিছু পুরুষ যদি তাদের অধমাঙ্গ অনাবৃত রেখে প্রকাশ্যে চলাফেরা করার মধ্যে এবং নারীর মতো প্রসাধন করার মধ্যে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা চরম পূর্ণতাকে অর্জন করল ভেবে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তবে সেই পুরুষদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। এই পুরুষদের বিকৃতকাম ও উচ্ছৃঙ্খল বলে চিহ্নিত করাটা মোটেই অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে না— একই যুক্তিতে।

মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন কোনও আন্দোলনই কখনও কোনও শ্রেণিরই মুক্তি আনতে পারেনি, পারবেও না।

দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তই হল বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। যে দম্পতির জীবনে এইসব প্রাথমিক শর্তগুলো অনুপস্থিত সেখানে সম্পর্কের বোঝা টানা অর্থহীন, নীতিহীন এবং সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামীর জীবনে বন্ধু হিসেবে কোনও পুরুষ বা নারী যদি বসন্তের হাওয়া নিয়ে আসেন, তাকে স্বাগত জানানো মানসিকতার দিক থেকে একান্তই কাম্য। উভয়ের বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উত্তাপে বিকশিত হয়ে যদি শারীরিক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে তো শ্রদ্ধা জানাবই, স্বাগত জানাবই। তার পরিবর্তে শ্রদ্ধাহীন, বন্ধুত্বহীন নারী পুরুষের সম্পর্ককে স্বাগত জানানো কি আদৌ সুযুক্তির পরিচয় হত? বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে যখন সুস্থ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন তার চেয়ে সুন্দর তার চেয়ে শ্রেয় সম্পর্ক আর কিছু হয় না। যে সম্পর্ক মন্ত্রের জোরে শৃঙ্খলিত নয়, অন্তরের জোরে যুক্ত তাই শ্রেয়। আমার এই কথাগুলো যেহেতু আন্তরিক, তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে মত পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই আসে না।

আবার যেখানে নারী-পুরুষ শুধুমাত্র যৌন-উত্তেজনার আগুন পোহাতে নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে মেতে ওঠে, সেখানে এইসব মূল্যবোধহীন, ভোগসর্বস্ব, বিকৃতকামী নারী-পুরুষদের সুস্থ-সমাজ ও সুস্থ সংস্কৃতির শত্রু ছাড়া আর কিছুই মনে করার অবকাশ থাকে না। বন্ধুত্বহীন, মতাদর্শহীন, শ্রদ্ধাহীন কামতাড়িত নারী পুরুষদের যৌনাচার, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বহু জনের মধ্যে ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির বীজ বপন করবেই, সমাজকে পচন ধরাবেই—এই পরিবেশগত প্রভাবের সত্যকে মাথায় রেখে প্রতিটি সুস্থ সমাজ-সচেতন মানুষের ঘৃণা নেমে আসা উচিত ওদের উপর। শৃঙ্খলিত নারী-পুরুষদের মুক্তির জন্য নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনে, নতুন সস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ককে, যৌন সম্পর্ককে যুক্তির নিরিখে বিচার করতে হবে। এবং তার প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের জীবনে। ফলে নারী-পুরুষের নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবে স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে নয়, বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। নিজের জীবনে এই প্রয়োগের জন্য চাই নিষ্ঠা ও সাহস—তেজে উদ্দীপ্ত সাহস।

এ-জাতীয় চিন্তাধারা স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধিতে কতটা সহায়ক হবে, এই অভিযোগ বাস্তবিকই কতটা গ্রহণযোগ্য একটু দেখা যাক।

হিন্দুদের বহুগামী বিয়েতে অবশ্যই বহু নারীর উপর একটি পুরুষের যৌন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত, স্পষ্টতই যা স্বেচ্ছাচার। ইংরেজদের প্রভাবে এ যুগের

হিন্দুরা একগামী বিয়ে করলেও নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার দরুন আজও এই বিয়ের মধ্য দিয়েও একটি পুরুষ একটি নারীর ওপর যৌন স্বত্বাধিকারই প্রতিষ্ঠিত করে, যা স্পষ্টতই স্বেচ্ছাচারিতা। যে ক্ষেত্রে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর সে ক্ষেত্রেও একগামী বিয়ে যৌন স্বত্বাধিকারের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত—একজনের উপরে আর একজনের স্বত্বাধিকার। প্রেমহীন যৌন স্বত্বাধিকার সুবিধাবাদী লাম্পট্য ছাড়া কিছুই নয়, স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

মুসলমান সমাজে যেখানে বহুগামী বিয়ে প্রচলিত সেখানে বহু নারীর উপর এক পুরুষের যৌন স্বত্বাধিকার সন্দেহাতীতভাবে মর্মান্তিক স্বেচ্ছাচারিতা। স্ত্রী আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে জোর করে সহবাসের অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন, এমনটা বিলেতে ঘটলেও আমাদের দেশে দুর্লভ। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সামান্যতম দাম না দিয়ে স্বামীরা তো অহরহই সহবাস করছেন, স্বত্বাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে মোদ্দা কথায় ধর্ষণই করছেন—এ কি স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন নয়? না কি, বিয়ে করার সুবাদে, যৌন স্বত্বাধিকার লাভ করার ফলে স্ত্রীকে যখন-তখন ধর্ষণ করা যায়?

এই ধরনের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিয়ে কখনওই কাম্য হতে পারে না, এই স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও স্বতন্ত্র সত্তা খর্বকারী এবং সমাজের অগ্রগমন ব্যাহতকারী।

সহধর্মিণী, প্রেমিকা, সহযোদ্ধার চেয়েও নারীর বড় পরিচয় হয়ে ওঠা উচিত সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা—

এর মধ্যে কোথাও প্রেম ও দাম্পত্যের রক্ষণশীলতা নেই, ব্যক্তিত্বকে বেঁধে রাখার ফাঁদ পাতা নেই।

ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের গোড়ায় রাজনীতি সচেতন বহু প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুনভাবে তাঁদের দাম্পত্যজীবন শুরু করেছিলেন। নিজের নিজের পার্টি কমিটির কাছে তাঁরা জানাতেন বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথা। পার্টি কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর বিবাহ সভা ডাকা হত। এ সভায় শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য থাকত না, থাকত না কোনও ধর্মীয় মন্ত্র উচ্চারণ। হত না কোনও মালাবদল, শুভদৃষ্টি। নবদম্পতি পাঠ করতেন মাও সে তুং-এর কিছু উদ্ধৃতি। উপস্থিত সকলে

গান ধরতেন—বিপ্লবী গণসংগীত। আনন্দের অঙ্গ হিসেবে খাওয়া-দাওয়াও হত। এইসব দাম্পত্যবন্ধনগুলো যে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, এমন নয়। অনেক স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকা মতাদর্শগত পার্থক্য গড়ে উঠতেই শ্রদ্ধাহীন, বন্ধুত্বহীন, দাম্পত্যজীবন, প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছে।

রাজনীতি সচেতন, আদর্শ সচেতন, মূল্যবোধ সচেতন, আত্মমর্যাদা, সচেতন, স্বাধীন মানসিকতাসম্পন্ন দম্পতিদের বিচ্ছেদ তুলনামূলকভাবে অসচেতন ও স্বল্প-সচেতন দম্পতিদের চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। দু'জনেই যখন আদর্শ-সচেতন মূল্যবোধ-সচেতন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে সচেতন তখন আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিতেই পারে— সেটা একপক্ষের আদর্শচ্যুতির জন্যেও যেমন হতে পারে, তেমনই আদর্শগত মতপার্থক্য থেকেও হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে 'প্রেমিক-প্রেমিকা' অথবা 'স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক অটুট রাখা অবাঞ্ছিত মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কী?

আমি যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের একটি তাসের আড্ডা আছে। সন্ধ্যায় আড্ডায় প্রায় প্রত্যেকেই আসেন, তাস খেলেন, রাতে বাড়ি ফিরে যান। বদলি, স্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যু ছাড়া আড্ডার কোনও সদস্য বিদায় নেননি আমার দেখা পনেরোটি বছরের মধ্যে। এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন অন্যান্য পাড়ার তাস বা দাবার অড্ডার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা আমরা গত সাত বছরে আদৌ দেখিনি। যখনই কোনও সদস্য লোভ বা ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে সমিতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আমাদের সমিতির অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে তাঁর তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পরিণতিতে বিচ্যুতকে অন্য সভ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। আজ আমার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমিতির সভ্য-সভ্যাদের আছে, আমি বিচ্যুত হলে সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভাঙন ধরতে বাধ্য। তারও পরে সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক অটুট থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই নীতিহীন। তাসের আড্ডার সভ্য এবং আমাদের সমিতির সভ্যদের মধ্যে আদর্শগত সচেতনার পার্থক্যের দরুনই দ্বন্দ্ব দেখা না দেওয়ার এবং দেখা দেওয়ার পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। তাস, দাবার আড্ডায় কোনও মতাদর্শগত সংগ্রাম নেই বলেই দ্বন্দ্বেরও সম্ভাবনা নেই। আর আমাদের সমিতির ক্ষেত্রে তীব্রভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম আছে বলেই দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই একই ব্যাপার ঘটে প্রেমিক-প্রেমিকা ও স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে।

আদর্শ সচেতন নর-নারীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার সম্ভাবনা যেমন অচেতনদের তুলনায় বেশি, তেমনই আদর্শগত মত-পার্থক্যের পর তাঁরা জোর করে একটা দাম্পত্য-সম্পর্ক বজায় রাখবেন—এটাও প্রত্যাশিত নয়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মতো নয়।

পাশাপাশি সাধারণ গৃহবধূ নানা ঝড়-ঝাপটা এবং অত্যাচার সহ্য করেও দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকেন, স্বামীর প্রতি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং আদর্শগত সচেতনতার অভাবের দরুন।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় মতাদর্শগত মিল থেকে, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠতে পারে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক— যেখানে দেহ-মিলন বন্ধুত্বকে আরও সমৃদ্ধতর, দৃঢ়বদ্ধ করতেই পারে। এ মিলন স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ও বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন মিলনই তো সংস্কারমুক্ত মানসিকতার লক্ষণ, সুস্থতার লক্ষণ।

প্রাতিষ্ঠানিক বিয়ের মধ্য দিয়ে যেহেতু যৌন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রচলিত সংস্কার আমদের অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে, তাই আমরা মেনে নিই—বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নারী ও একটি পুরুষের যথাক্রমে অন্য পুরুষ ও অন্য নারীকে ভালোবাসার অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্ব বর্জিত হয়ে প্রধানত যৌন স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনের প্রায় বাকি অর্ধেকটা সময় সেই ভালোবাসাহীন দাম্পত্য সম্পর্ককেই বোঝার মতো বয়ে বেড়ানোটাই আমাদের সমাজের ‘ট্র্যাজিক ট্র্যাডিশন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অর্ধেকটা সময়ে ভালোবাসার মতো মানুষের সংস্পর্শে এলেও, মতাদর্শগতভাবে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও সেই সমস্ত সুন্দর ইচ্ছেগুলোকে দিয়ে চিতা সাজিয়ে ‘দাম্পত্য পবিত্রতা’ রক্ষা করার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর মানসিকতারই পরিচয়। নারী-পুরুষের প্রেম—সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় মানসিক মিল, মতাদর্শের মিল; শাঁখা, সিঁদুর বা মন্ত্রোচ্চারণ নয়। গতানুগতিক যুগল সম্পর্কের ছক ভেঙেই আমাদের খোঁজ করতে হবে নির্ভুল আত্মপরিচয়ের, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার।

পুরুষশাসিত আমাদের এই সমাজে পুরুষেরা তাদের স্বার্থে যে নীতিবোধ

ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে আদর্শ নারীর গুণ হিসেবে ঘোষিত হয়ে আসছে পতি-সেবা, সন্তান-পালন, পতির পরিবারের সেবা ইত্যাদি। পতি-দেবতার শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করে টিকে থাকা নারীকে সমাজ চিহ্নিত করেছে মহান পতিব্রতা রমণী হিসেবে। পতির চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়া নারীকে পূজ্যপদ দেওয়া হয়েছে সতী হিসেবে। যদি বলি এ-সবই পুরুষ দ্বারা নারী শোষণের অপচেষ্টা বই কিছুই নয়, তবে অন্যায় বলা হবে কি? তবে এ-ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণভাবে কিছুটা 'দাস-নারী'র মতোই অবস্থান মেনে নিয়ে চলেন। এ-ক্ষেত্রে আমি 'শোষণ' শব্দটিকে ব্যবহার করলেও এই শব্দটির প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের একটু সতর্ক নজর রাখতে অনুরোধ করছি। না হলে একটু গোলমাল বাধার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। কারণ সামাজিক শোষণ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি এ বইতেও সেই অর্থে শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে ইতিমধ্যে,—অর্থাৎ যার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সরাসরি যোগাযোগ আছে, এ 'শোষণ' কিন্তু তা নয়, বরং এ-ভাবে বলা যেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সমাজের মাথারা নারী-পুরুষদের বর্তমান অবস্থানকে ধরে রাখতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই মূল্যবোধকে চাপিয়ে দিয়েছে। সমাজের মাথারা যেহেতু পুরুষ তাই প্রচলিত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষরা সাধারণভাবে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় আছে। 'পুরুষদের দ্বারা নারী শোষণ' বলতে এই অবস্থানগত সুবিধার ফলকেই বোঝাতে চাইছি। এটা মাথায় না রাখলে 'শোষণ' শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়বে। সে-ক্ষেত্রের ব্যাপারটা অনেকটাই ফেমিনিস্টদের অর্থাৎ তথাকথিত নারীমুক্তির সমর্থকদের অনর্থক হট্টগোলের মতোই শোনাবে।

এ-সব বলার অর্থ এই নয়, আমি পুরুষদের সুবিধাজনক অবস্থার সমর্থক বা ব্যাপারটাকে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। এমনকী এও বলি না—আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকতে হবে। সন্দেহ নেই, এ-সবই মানবিকতার প্রতি চূড়ান্ত অপমান। এবং আমি সমস্যার মূলকে স্পষ্টভাবে চিনে নিতে চাইছি। 'মাতৃত্বে নারীত্বের চরম সার্থকতা'—এমন লাগাতার প্রচার চালিয়ে নারীকে শুধু সন্তান উৎপাদনকারী এবং যৌন উত্তেজনা-ভোগকারী যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছে পুরুষশাসিত এই সমাজ। সমাজ আরোপিত এই নীতিবোধ ও মূল্যবোধ কখনওই যুক্তিসংগত বলে মেনে নেওয়া যায় না। নারীর উপর পুরুষের শাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কিছু নারী-পুরুষ যে প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তাকে কারো

কারো দৃষ্টিতে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে মনে হতেই পারে। সব দেশেই সমাজের অগ্রসর অংশরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, সেই মূল্যবোধকে অনেক সময়ই অনগ্রসরদের পুরোনো দৃষ্টিতে অবক্ষয় মনে হয়। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছি—অগ্রবর্তী অংশের মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজের মূল্যবোধও পাল্টায়। পরিবর্তনের হাওয়া লাগুক নারী-পুরুষদের প্রণয় সম্পর্ক, দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। যুগল নারী-পুরুষের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক গভীর বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে। ভেঙে যাক যৌন স্বত্বাধিকারের উপর গড়ে ওঠা, বস্তু সামগ্রী বিবেচনায় গড়ে ওঠা, মূল্যবোধহীন শারীরিক সম্পর্কের ওপর গড়ে ওঠা যুগল সম্পর্ক। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করার প্রয়োজনেই গড়ে ওঠা যুগল সম্পর্ক। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করার প্রয়োজনেই গড়ে উঠুক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নারী-পুরুষের সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে নতুন মননশীল মূল্যবোধ।

প্রসঙ্গ জনসেবা : ভালোবাসার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার

গত কয়েক বছরে যুক্তিবাদী আন্দোলন সাধারণ মানুষের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষকে কুযুক্তির গারদ ভেঙে স্বচ্ছ চিন্তার জগতে নিয়ে আসতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে এগিয়ে এসেছে বহু বিজ্ঞান ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্যগোষ্ঠী, লিটল ম্যাগাজিন প্রমুখ গণসংগঠন। কাজ-কর্মে এরা অনেকেই খুবই আসন্তরিক। কুসংস্কার মুক্তির কাজের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকেই আরও নানা ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক, সমাজসংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, চক্ষুদান, মরণোত্তর দেহদান, কৃষিজমি পরীক্ষা, হাসপাতালে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থার দাবি তোলা, জল বাঁচাও, বৃক্ষরোপণে, বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, ফ্রি কোচিং সেন্টার, ফ্রি রিডিংরুম এমনি আরও বহুতর সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষের ভালোবাসা

ও শুভেচ্ছাও এইসব সংস্থার পাথেয় হয়েছে। ফলে এরা সার্থক গণসংগঠন হয়ে উঠেছে।

জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জনচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটি আরও সফলভাবে কাজে লাগিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মোআমার-অল-আলক-আল-ইসলামি প্রমুখ বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত রেখেছে। হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, বন্যায় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মশালা এমনি নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের প্রলেপে সাধারণের মন জয় করে তাদের আবেগ সিক্ত, কৃতার্থ হৃদয়ে রহস্যবাদ, দুর্জ্ঞেয়বাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ও রকমারি ভাববাদী চিন্তাও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আবেগ সিক্ত, ঋণী, কৃতার্থ মগজ তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে এদের নিপীড়িত মানুষদের বন্ধু হিসেবেই ধরে নিচ্ছে। নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলো এইসব প্রতিষ্ঠানকর্মীদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছেন এইসব ভালো-লাগা মানুষগুলোর চিন্তাও।

ভাববাদী শিবিরের এই ধরনের মগজ ধোলাই কৌশল থেকে শিক্ষা নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীদেরও প্রয়োজনে জনচিত্ত জয়ের জন্য নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হতে হবে পাল্টা মগজ ধোলাই করতে। যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সাধারণ মানুষের চেতনা মুক্তি এবং সেই পথ ধরে সার্বিক শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে—উপলক্ষ যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম যে শুধুমাত্র উপলক্ষ্যই হতে পারে, এই বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন। স্পষ্টতই মনে রাখতে হবে পরম সত্যটি—

সেবায় আর যাই করা যাক, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো যায় না, শোষণমুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণমুক্তি ঘটতে পারে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সমাজসচেতনতা বোধ থেকে।

সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশ যেদিন বুঝতে শিখবে তাদের বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট নির্ধারিত নয়, পূর্বজন্মের কর্মফল নয়, ঈশ্বরজাতীয় কোনও কিছুর অভিশাপ নয়, বঞ্চনার কারণ শোষকশ্রেণি, সে-দিন তাদের নিজেদের স্বার্থেই,

বাঁচার তাগিদেই বঞ্চনামুক্তির জন্য পাথর না পরে, পুজো না দিয়ে আঘাত হানবে শোষকশ্রেণির দুর্গে।

কিন্তু এই আঘাত হানার প্রসঙ্গ তখনই আসবে যখন শোষিতশ্রেণির ঘুম ভাঙবে, তারা বঞ্চনার কারণগুলো বুঝতে পারবে। গরিবদের ক্ষোভকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ধনীর অর্থে চলছে 'দরিদ্র-নারায়ণ সেবা'। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা যাদের চিরন্তন লক্ষ্য, তাদের সেবা বিলোবার জন্য দরিদ্র-নারায়ণের সরবরাহও যে চিরন্তন হওয়া প্রয়োজন— এই সত্যটুকু আমাদের ভুললে চলবে না। এই সেবামূলক তাৎক্ষণিক লাভ গরিবদের হলেও ভবিষ্যতের জন্য পড়ে রইল অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন।

জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সম্পর্কটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের, শোষণমুক্তির সংগ্রামের সম্পর্কটা। যাঁরা বুঝতে চাইবেন না, বুঝতে পারবেন না, তাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই পারা সম্ভব নয়। এইভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে যেতে দেবে না রাষ্ট্রশক্তি। কারণ রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ মানুষের চেতনাকে ততদূর পর্যন্তই এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে, যতদূর পর্যন্ত এগোলে তাদের কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। যখনই বিপদের গন্ধ পাবে, তখনই নানাভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। কখনও সংস্থাকে আর্থিক সাহায্যে মুড়িয়ে দিয়ে লেজুড় করতে চাইবে, কখনও সংস্থা দখল করতে চাইবে নিজের পেটোয়া দালালদের নিয়ে। কখনও ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের পাইয়ে-দেওয়ার রাজনৈতিক চালেই কিনে নিয়ে সংস্থাকে পকেটে পুরতে চাইবে, কখনও সংস্থাকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে লাগাতারভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। কখনও সংস্থার সুনাম জনমানসে মলিন করতে সংস্থা-প্রধানের চরিত্রহননের চেষ্টা করা হবে, কখনও বা সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা হবে সমাজসংস্কারমূলক, জনসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য। শেষ পদ্ধতিটি আপাত নিরীহ হলেও মগজ ধোলাইয়ের জন্য শাসকশ্রেণির পক্ষে খুবই কার্যকর অস্ত্র। সেবামূলক বা সমাজসংস্কারমূলক কাজকর্ম যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ, রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদির পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক প্রচার চালান। যে সব ব্যক্তি ও সংস্থা এ-সব কাজে এগিয়ে আসে বার বার তাদের মুখ ভেসে ওঠে দূরদর্শনে, গলা ভেসে ওঠে বেতারে। এগিয়ে আনা হয় আরও সব প্রচারমাধ্যমকে!

মন্ত্রীরা বার বার হাজির হতে থাকেন এইসব সংস্থার অনুষ্ঠানগুলোতে। মন্ত্রীর সাহচর্য, বেতার দূরদর্শনে প্রচার, সব মিলিয়ে একটা ক্রেজ। একটু একটু করে আরো বেশি বেশি সংস্থা সবাজসেবা, সমাজসংস্কারের কাজে এগিয়ে আসতে থাকেন। অনেকেই আরও বেশি বেশি করে অনুভব করতে থাকেন এই ধরনের কাজকর্মে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা।

এই কথাটাও স্পষ্ট করে বলি—সমাজসেবা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু সমাজসেবার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সাধারণ মানুষের চিন্তায় চেতনায় রহস্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তাকে রুখতে আমরাও কি পারছি, সমাজসেবার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের চেতনায় স্বচ্ছতা আনতে? যদি পারি, তবে আমাদের সার্থকতা, নতুবা আমরা সমাজসেবার আবর্তে শাসক ও শোষকশ্রেণির সুতোর টানে পুতুলনাচই নেচে যাব।

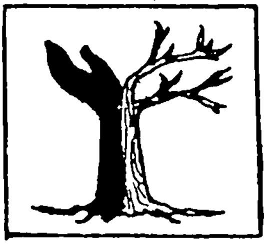

পরিবেশ আন্দোলন : মানুষ থাক বা না থাক বাঁচাও সোঁদরবনের বাঘ

একটি মিথ্যেকে বার বার সাজিয়ে গুছিয়ে প্রচার করতে করতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যার ফলে মিথ্যেটাই মানুষের বিশ্বাসে সত্যি হিসেবে জ্বল জ্বল করে। এই সত্যটাকেই মাথায় রেখে তাবৎ রাজনীতিকরা পরিবেশ দূষণ নিয়ে প্রচারে নেমেছেন। কত টাকা উড়ছে সেমিনারে, ওয়ার্কশপে, গাছ বিলি করতে, গাছ পুঁততে, কত লক্ষ মিটার দুর্মূল্য ফিল্ম, কত টন নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে তার হিসেব রাখা ভার। কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রচারে ফল পাওয়া গেছে দারুণ। এখন পরিবেশ বলতে তামাম দেশবাসীর মাথায় শুধু ভেসে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি। কিন্তু পরিবেশ বলতে কি শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশ? মানুষের ওপর শুধুই কি প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রভাব ফেলে?

যারা পরিবেশ বলতে শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকাতে চাইছে, তারা ভালোমতোই জানে 'আর্থ-সামাজিক' ও

'সমাজ-সাংস্কৃতিক' নামের দুটি বিশাল প্রভাবশালী পরিবেশের কথা, মানবজীবনে যাদের প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিপুল প্রভাবের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ রাশিয়া সমেত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে মার্কসবাদের বিদায়। ওইসব মার্কসবাদী দেশে দীর্ঘ দিন ধরে নানা ভাবে পাচার করা হয়েছে মার্কিন-সংস্কৃতি, উত্তেজক মার্কিন সংস্কৃতি, ভোগসর্বস্ব মার্কিন সংস্কৃতি। মার্কসবাদী দেশগুলোর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ভেসে আসা উদ্দাম মার্কিন সংস্কৃতি মানুষগুলোকে মানসিকভাবে নেশাগ্রস্ত করেছে, ক্ষুধার্ত করেছে। আর তাইতেই একের পর এক ধস নেমেছে।

'সুসংস্কৃতি' মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। 'সুসংস্কৃতি' প্রগতির ধারক। মানবতাবাদী জীবনবোধের উপাদানই হল সুসংস্কৃতি। যে 'সংস্কৃতি' এইসব ধারার বিপরীতগামী তা 'অপসংস্কৃতি'। ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে, যাত্রায়, নাটকে সর্বত্র এক অসংস্কৃতির ঢল নেমেছে। কারণ এইসব সৃষ্টির পিছনে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়াস নেই। বরং রয়েছে ভোগসর্বস্ববাদ, অবাধ যৌনতা, হত্যা-হানাহানি-ধর্ষণ, দুর্জ্ঞেয়বাদ, অদৃষ্টবাদ, ঠাকুর দেবতার রমরমা, ধর্মীয় সংস্কার সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলে বৃহত্তর শোষিত জনসমষ্টিকে পিছিয়ে রাখার প্রয়াস।

কোনও কোনও সমাজ সচেতন গোষ্ঠী কোনও কোনও জায়গায় শোষিত মানুষদের যখন বোঝাচ্ছে তাদরে বঞ্চনার কারণগুলো আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র বা স্বর্গের দেবতা নয়, বঞ্চনার কারণ এই সমাজব্যবস্থা, যখন এই অপসাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব মুক্ত করতে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছে তখন বাংলাভাষার জনপ্রিয়তম সাহিত্য পত্রিকায় দুই ঔপন্যাসিকের কলম ঝলসে উঠল ওইসব সমাজ-সচেতন যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কলমচিরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে, অলৌকিক ক্ষমতাবানদের পক্ষে সোচ্চার হলেন।

যাঁরা সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেই নারাজ, তাঁরা কী বলবেন? দেশ জুড়ে এই যে ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা, হানাহানি এ-সব কোন্ পরিবেশের ফল?

ধর্ম নিয়ে এমন উন্মত্ততা তো একদিন গাছের পাকা ফলটির মতো টুপ করে এসে পড়েনি। সাম্প্রদায়িক দল বলে আজ যাদের গাল পাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেই সাম্প্রদায়িক দলটি তো হঠাৎ করে উজ্জীবিত হয়ে

ওঠেনি। ভারতবর্ষের মাটিতে ধর্মের চাষ, ধর্মের ফসল উৎপাদন ও ধর্মব্যবসা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বারোয়ারি দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর রমরমা বেড়েছে। অনেক মার্কসবাদীই দলের নির্দেশে পুজো কমিটিতে ঢুকে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে নেমে পড়েছেন। এই নতুন শক্তির আগমনে পুজোর বাজেট বেড়েছে চড়চড় করে। ফুটপাত আর সরকারি জমির দখল নিয়ে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মস্তানেরা শনি-শীতলার দোকান খুলেছে। রাজনীতিকরা পুজো উদ্বোধন, জ্যোতিষ-মহাসম্মেলন উদ্বোধনে হাজির থেকে পোঁতা বিষবৃক্ষের বীজে সার ঢেলেছেন, জলসিঞ্চন করেছেন। বাবা 'তারকনাথ', 'সন্তোষী মা' ছবির কৃপায় পাড়ায় পাড়ায় যুবক-যুবতীদের উদাত্ত অংশগ্রহণে মাইক, আলো, দেবদারুপাতা ও বাঁক-শোভিত চত্বরের সংখ্যা বেড়েছে। বাঁক কাঁধে শ্লীল-অশ্লীল স্লোগান দিতে দিতে যুবক-যুবতীরা ছুটে চলে তারকেশ্বরে। 'জয় সন্তোষী মা' ছবির কৃপায় মা সন্তোষীর জাঁক-জমক বাড়ে। দূরদর্শনে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' দেশবাসীকে ভাবাবেগ ও ভক্তিরসের তীব্র নেশায় বুঁদ করে রাখে। 'সতী মন্দির' রাজস্থানের ব্যাপার, পশ্চিমবাংলার মাটিতে বসবাসকারী রাজস্থানী ভোটারের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এই অঙ্ক মাথায় রেখে ভোটারদের কাছে প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে তাবড় রাজনীতিকরা ঘোষণা করেন, মৃতকে নিয়ে স্মৃতি-সৌধ হতে পারে, কিন্তু মৃতকে পুজো? এ তো কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের আবর্জনা আমরা পশ্চিমবাংলায় জমতে দেব না। এই রাজনীতিকরাই আবার রামকৃষ্ণ, রামঠাকুর, অনুকূলচন্দ্র, লোকনাথের পুজো নিয়ে নীরব থেকে ধর্মশিকারিদের পরোক্ষ মদত দিয়েছেন। এইসব মৃত ধর্মীয়নেতাদের ভক্ত-সংখ্যা বিশাল এবং তাদের ভোটাধিকার আছে বলেই কি এইসব রাজনীতিকদের প্রগতিশীল বুলির ফানুস চুপসে যায়?

'আত্মা অবিনশ্বর' এই যুক্তিহীন বিশ্বাস যতদিন মানুষের মনে থাকবে ততদিন সতী-মন্দির সহ নানা মৃত বাবাজি মাতাজিদের মন্দিরও থাকবে তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায়। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসে বলা হয়েছে 'আত্মা' মানে 'চিন্তা', 'চেতনা', 'চৈতন্য' বা 'মন'। শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও জেনেছি 'চিন্তা', 'চৈতন্য', 'চেতনা' বা 'মন' হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল। মানুষ মারা গেলে তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোও মারা যায়। তারপর এক সময় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায় সমাধির মাটির তলায়, আগুনে পুড়ে, পচে অথবা কোনও প্রাণীর

পাকযন্ত্রে হজম হয়ে। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর অস্তিত্বই যখন থাকে না তখন সেই অস্তিত্বহীন স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল হিসেবে 'চিন্তা', 'চেতনা', 'চৈতন্য' বা 'মন'-এর অস্তিত্বও যে আর থাকতে পারে না, এই সাধারণ যুক্তির কথাটুকু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের অজানা থাকার কথা নয়। ধরে নিলাম শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, অশিক্ষিত সমাজবিরোধী মাফিয়া নেতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু শক্তিমান রাজনীতিক আছেন যাঁরা শক্তিপ্রয়োগের বিষয় যতটা বোঝেন, 'চিন্তা', 'চেতনা', 'মন' ইত্যাদির কথা ততটাই বোঝেন না। কিন্তু এর বাইরে যে সংখ্যাগুরু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা রয়েছেন তাঁদেরকেও মাথা-মোটা ভাবলে ভুলই করা হবে। সবগুলো মাথা-মোটার পেছনে অর্থ ব্যয় করে তাদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনলেই বা লাভ কী? ওইসব মোটা-মোটারা দেশের দরিদ্র শোষিত মানুষদের মগজ ধোলাই করে বঞ্চনার থেকে উঠে আসার সম্ভাবনাময় প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করতে পারবে? পারবে না। তাহলে তো রাতারাতি শোষকশ্রেণির গণেশ উল্টোবে। ধুরন্ধর এইসব ধনীর দালাল রাজনীতিকরা 'চিন্তা', 'চেতনা', 'মন', 'আত্মা', 'অদৃষ্টবাদ' কর্মফল ইত্যাদি খুব ভালোমতই বোঝেন। বোঝেন বলেই জানেন, দরিদ্র মানুষগুলোর চেতনা কতদূর পর্যন্ত এগোতে দেওয়া নিরাপদ। ওইসব রাজনীতিক ও তাদের দলের বুদ্ধিজীবীরা ভালোমতোই জানেন 'আত্মা অবিনশ্বর' এই ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মাথায় বদ্ধমূল করতে পারলে সেই সূত্র ধরেই গরিবদের মাথায় ঢোকানো যায়, 'এই জন্মে এই যে এত কষ্ট পাচ্ছি, এসব গত জন্মের কোনও পাপের ফল, এজন্মে দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, রাজপদে (বর্তমানে রাজনীতিকদের পায়ে) ভক্তি রেখে, কোনও হিংসার আশ্রয় না নিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া এই জীবনের দুঃখগুলোকে মেনে নিয়ে সুশীল হয়ে চললে আগামী জন্মে ভাল ফল পাব।'

শিল্পপতিদের মালিকানাধীন বিশাল বিশাল ঝাঁ-চক্চক্ কাগজগুলোতে বিশাল বিশাল মাইনের বিশাল বিশাল লেখক পোষা হচ্ছে। পত্রিকার মালিক নিত্য রুটিনমাফিক পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন পেপার পলিসি। আর সেই পেপার পলিসিকে মাথায় রেখেই কলম চালাচ্ছেন, কলম চালাতে হচ্ছে মাইনে করা তা-বড় লেখকদের।

পেপার পলিসি কী? পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কৌশলই, পত্রিকার কৌশল। পত্রিকার মালিকের স্বার্থ কখনও ব্যক্তিগত, যেখানে আর এক পত্রিকাগোষ্ঠীর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার কখনও শ্রেণিগত, যেখানে

সামগ্রিকভাবেই ধনিকশ্রেণির স্বার্থ মিলেমিশে আছে। পত্রিকার মালিক এই দুই ধরনের স্বার্থেই তাঁর মাইনে করা লেখকদের কাজে লাগিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মগজ ধোলাই করে।

এ-যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনি হাজারো উপায়ে হাজারো ফন্দিতে মুঠোবন্দি করে রেখেছে হুজুরের দল, হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতেই। দেশের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের এই বিশাল দূষণ নিয়ে, পচন নিয়ে নীরব কেন সেইসব রাজনৈতিক দল যারা গরিবি হটাতে চায়, যারা শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের হাতিয়ার? যারা দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী? ওদের নীরবতার একটাই অর্থ—ওরা চায় এই সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে, তাই তো পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র 'প্রাকৃতিক পরিবেশে'র কথা আমাদের মাথায় ঢোকাতে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার প্রচার চালিয়েই যাচ্ছে।

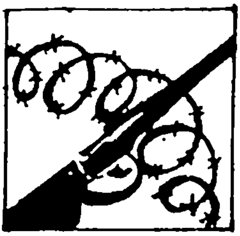

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই : যুদ্ধ ছাড়া শান্তি নেই

কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' মিছিলের ঢল কল্লোলিনী কলকাতাকে একানব্বুইয়েও কল্লোলিত করেছে, একটু বেশি মাত্রায়ই করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মাত্রা ছাড়াই করেছে। রাস্তার এ-মুড়ো থেকে ও মুড়ো চওড়া মিছিলের মাথা যখন পার্কসার্কাস ময়দান অতিক্রম করছে, তখন লেজ রয়েছে একগাদা পাক মেরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। মুড়োয় রাজনৈতিক, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া, সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের স্টার-মেগাস্টারদের ভিড়। মাথায় মাথায় শান্তির সাদা টুপি। ট্যাবলোয় শান্তির বিশাল পায়রা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেটের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির পক্ষে বলিষ্ঠ হরফের স্লোগান। আগাম প্রচারের ব্যাপকতায় রাস্তার দু-ধারে স্টার-মেগাস্টার দর্শনার্থীদের লাগামছাড়া ভিড়। এক সময় বয়ানে-বাঁধা বক্তব্যে আকাশে-বাতাশে আগুন ছড়ান পেশাদার গরিব-দরদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী সুবক্তারা। প্রেস ও দূরদর্শনের

আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করতে করতে গলার ওঠা-নামায় নানা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করে দেশবাসীদের সতর্ক করে দেন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চক্রান্তর বিরুদ্ধে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' মার্কা-সভা-মিছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংস্থা প্রথাগতভাবে প্রতিবছরই করছেন। নামতা পড়ার মতো আউড়ে যাচ্ছেন যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে গরম গরম নানা কথা। সভা-মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই দু-কান ভরে শুনছেন ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি ও অস্ত্রব্যবসায়ীদের আপন প্রয়োজনে কীভাবে নির্ধনী মানুষগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ। কী সুনিপুণ চক্রান্তের মধ্য দিয়ে শান্তিকে পাঠানো হচ্ছে নির্বাসনে। সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত ভেঙে দেবার, পুড়িয়ে দেবার শপথ বাক্যগুলো দু-কান দিয়ে ঢোকে বটে—কিন্তু মস্তিষ্ক কোষকে প্রভাবিত করতে পারে না, ভাসা-ভাসা থেকে যায়।

কারা সাম্রাজ্যবাদী? কারা সম্প্রসারণশীল? কাদেরকে চিহ্নিত করব ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে? যুদ্ধবাজ দেশ হিসেবে কাদের গায়ে মারব সিলমোহর? প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ খাতে যারা ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কতখানি সোচ্চার হব? প্রশ্নগুলো শুনে যতটা নিরীহ মনে হয়, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' আন্দোলনের নেতাদের মস্তিষ্ক ঘুরে উত্তরগুলো যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন আর সেগুলো মোটেই সহজ-সরল থাকে না, এ যেন মাথায় পেরেক ঢোকানোর পর স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসা। 'জনপ্রিয়তা', 'ভোটার-তোষণ' ইত্যাদি বিষয়গুলো নিজের জীবনের গণনার মধ্যে আনলেই অনেক মাপ-ঝোক করে কথা বলতে হয়, সাদা সত্যি কথা বলার বিলাসিতা শোভা পায় না। ফলে আমাদের শান্তিকামী, পায়রা ওড়ানো নেতারা কোনও দিনই সত্যের খাতিরেও উচ্চারণ করতে পারেননি যুদ্ধের চক্রান্ত ও আয়োজন মার্কিন হামলাবাজরাই শুধু করছে না। রাশিয়াও সমান উৎসাহেই যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার আগে পর্যন্ত। ওদের অস্ত্রও পৃথিবী জুড়ে বহু দেশেই বিক্রি হত।

আমাদের দেশের সরকারও যে যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন বাড়িয়েই চলেছে, প্রতিরক্ষা তথা জাতীয় নিরাপত্তা খাতে আমাদের দেশের ব্যয় সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের একশো ষাটটি দেশের মধ্যে পঞ্চম-এই কথাগুলো 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' দিবসে কোনও শান্তি-দরদি বক্তা কি উচ্চারণ করেছেন?

আমাদের দেশে পারমাণবিক বোমা বানানো চলবে না— এমন সোচ্চার দাবি করতে কি সৎসাহস দেখাবে কোনও ভোট-নির্ভর রাজনৈতিক দল? যুদ্ধ বিরোধী সভায়-মিছিলে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দলগুলো ভাসা-ভাসা গোলা-গোলা কথা বলে উত্তেজনার আগুন পোহানোর মধ্যে নিজেদের দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তাই অকপট উচ্চারণে তারা এত দ্বিধাগ্রস্ত।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপে ভারত সেনা পাঠিয়ে দৈনিক যে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করেছে, ফি বছর আট দশ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র কিনছে বিদেশ থেকে, হাজার হাজার কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি করে চলেছে প্রতিরক্ষা কারখানাগুলোয়, এর পরিবর্তে আমরা কি পারতাম না বন্ধ কারখানাগুলোর তালা খুলতে? নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে? কোটি কোটি বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করতে? কয়েক লক্ষ গ্রামে স্কুল খুলতে, পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নিতে?

দেশের অর্থনৈতিক তীব্র সংকট যখন বাঘের থাবা হয়ে হামলা চালায় কোটি কোটি অবর্ণনীয় দারিদ্রগ্রস্ত মানুষকে লক্ষ করে তখন অসহায় সরকার তাদের সরকারি তহবিলের শোচনীয় তলানির কথা জানিয়ে দেশের স্বার্থে আরও কৃচ্ছ্রসাধনের বাণী শোনায়। হে শান্তির মহান দূতরা—আপনারা কি তবে মনে করেন গরিবদের পিছনে টাকা খরচ করার চেয়ে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-মালদ্বীপে সেনা পাঠিয়ে 'দাদাগিরি' করার প্রয়োজন অনেক বেশি? বিদেশ থেকে বাহারি কামান, আধুনিক বিমান, রাজকীয় জাহাজ ও ছিমছাম ট্যাঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টিকারী ক্ষেপণাস্ত্র কেনা অনেক জরুরি? অনেক শ্রেয়তর রকেট ও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ?

আমাদের পড়শি দেশ পাকিস্তান মার্কিন দেশ থেকে অস্ত্র কিনলে শান্তি সচেতন রাজনৈতিক দল ও সংস্থাগুলো যতটা সরব হয়, তার ভগ্নাংশ প্রতিবাদও কি প্রকাশ করি আমাদের সরকার যখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের নামে প্রতিবছর বহু সহস্র কোটি টাকার বিদেশি অস্ত্র ঘরে তোলে? আমাদের

দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-পুঁজিবাদী, আধা ঔপনিবেশিক, আধা সম্প্রসারণশীল সরকার বিনা বাধায় প্রতিরক্ষার নামে জনসাধারণের ট্যাক্সের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেই চলেছে যুদ্ধাস্ত্র, রকেট, পারমাণবিক অস্ত্র। বিদেশ থেকে আমদানি করেই চলেছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, জাতীয় নিরাপত্তার নিছক অজুহাত খুঁজে তখত্‌কে সুদৃঢ় করতে আধা-সামরিক বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে— এ বিষয়ে বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিটি দলই আশ্চর্য রকম নীরব, নীরব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সংস্থা ও ব্যক্তিরা। এরপর যখন এরাই যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির পক্ষে সরব হন, তখন এই স্ববিরোধিতাই কি এই সরবতাকে 'ন্যাকামি'র পর্যায়ে নামিয়ে আনে না? জনগণকে সত্যি বলার ক্ষমতা যখন থাকে না, তখন ন্যাকা-ন্যাকা, গোলা-গোলা, ভাসা-ভাসা কথা ছাড়া আর কিই বা বলার থাকতে পারে শান্তির ধান্দাবাজ দূতদের?

স্পষ্ট উচ্চারণে সত্য কথাগুলো বলতে এত জড়তা কেন? কেন এমন মুখে কুলুপ দিয়ে থাকা? যদি রাষ্ট্রশক্তি দেশদ্রোহীর অপবাদ রটায়—এই ভয়ে? দলে ভারী হওয়ার লোভে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে সত্যকে সচেতনভাবে এগিয়ে চলার মধ্যে আদর্শ কোথায়?

কোনও অবস্থাতেই আদর্শের কোনও বিকল্প নেই—
একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য—স্থূলতা
সব সময় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

তবে বোবা হয়ে থাকার পিছনে আরও একটি সম্ভাবনার কথা সমাজ সচেতনদের ভুলে থাকার কোনও অবকাশ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে এই বিপ্লবী-বক্তারা একই ছাঁচে-ঢালা পদ্ধতিতেই শাসন চালাবে, ঠিক করাই আছে, তাই জনচেতনাকে গুলিয়ে দিতেই যুদ্ধ-শান্তি নিয়ে আবেগ সর্বস্ব, যুক্তিহীন গোলা-গোলা কথার ফুলঝুরিতে আগুন দেওয়া। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশটাকে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ঘাঁটি করে তুলতে সাহায্য করছে—এই নিয়ে আমরা যখন উষ্মা প্রকাশ করি তখন আমাদের নিরপেক্ষতাহীন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না প্রকৃত চিত্র—পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির সঙ্গে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণির এবং আমাদের দেশের শাসন ক্ষমতা দখলকারী সংসদের বিরোধী শক্তিগুলোর চরিত্রগত ও আচরণগত মিল বড়ই বেশি।

শান্তিকামী মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধবাজ শাসকশ্রেণি ও

তাদের দোসর শাসক শ্রেণি। শোষিত শ্রেণির চাওয়া, না চাওয়ার উপর আজ যুদ্ধ নির্ভরশীল নয়। বঞ্চিত মানুষরা শান্তি আনতে চাইলে মুখের কথায় তা আসবে না, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করেই শান্তি আনতে হবে। অশান্তি নির্মূল করতে লড়াই করতেই হবে। সে লড়াই অবশ্যই শোষকের সঙ্গে শোষিতের— দীর্ঘস্থায়ী শান্তির স্বার্থেই এই লড়াই একান্ত কাম্য। এমন একটা যুদ্ধ ছাড়া শান্তি নেই।

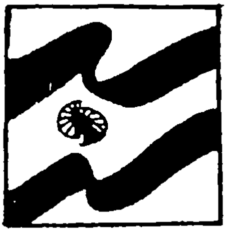

দেশপ্রেম : কানামাছি ভোঁ ভোঁ

সিনেমায়, যাত্রায়, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে যখনই দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে, সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করতে বারবার বোঝানো হয়েছে, দেশ মানে, 'ধরতি', 'দেশের মাটি', 'দেশের নদী-পাহাড়'। দেশের মাটিকে এক খাবলা তুলে নিয়ে শপথ নিচ্ছে দেশপ্রেমিকরা এবং তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে।

বারবার প্রচারে যে কথাটা আমাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে এবং হচ্ছে, তা তো বাস্তব সত্য নয়। 'দেশপ্রেম' মানে কখনওই দেশের মাটিকে ভালোবাসা হতে পারে না।

দেশপ্রেম মানে 'দেশবাসীর প্রতি প্রেম'। কিন্তু তামাম দেশবাসীকে তো এক সঙ্গে প্রেম বিলোনো যায় না। হুজুরের দলকে প্রেম বিলোলে মজুরের দলকে অপ্রেম বিলোতে হয়। আর মজুরের দলকে প্রেম বিলোনো মানেই হুজুরের দলকে অপ্রেম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবে দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটান ততই

জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠপে প্রাকৃতিক দেশ তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।'

এক শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ যে পরম সত্যটি অনুভব করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি ও অনুভবে এখনও যদি বুদ্ধিজীবীরা পৌঁছতে না পেরে থাকেন, তবে এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের হয় নির্বোধ অথবা অতি বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ 'ধান্দাবাজ' বলতে হয়।

আজ 'দেশপ্রেম' বলতে দেশের মাটিকে দেশের ভূখণ্ডের চৌহদ্দিকে চিহ্নিত করাটাই প্রচলিত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। '৯২-এ একটি বৃহৎ মার্কসবাদী দলের ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে তোরণে তোরণে সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে, "এ দেশে তোমার আমার, এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।" দেশের মানুষ ছেড়ে দেশের চৌহদ্দির প্রতি প্রেম জাগিয়ে তোলার এমনতর চেষ্টায় প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলো লাগাতার মগজ-ধোলাই করেই চলেছে। তাই দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে যখন কোনও মানবগোষ্ঠী হুজুরের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের শোষণের থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে অমনি চারদিক থেকে নিপীড়িত মানুষগুলোই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সুরে সুর মিলিয়ে 'গেল গেল' রব তুলে ছুটে আসে। এবং যা নয় তাই বলে গাল পাড়তে থাকে। এরপর ওইসব আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাসিল।

একটি বারের জন্য গভীরভাবে ভাবুন তো, বাস্তবিকই 'দেশদ্রোহী' কে? কে চিহ্নিত করবে দেশদ্রোহীদের ও দেশপ্রেমিকদের? যে ফসল ফলায় তাকে সমাজ ফসলের অধিকার দেয়নি। যে কলে-কারখানায়-খনিতে উৎপাদন করে তাকে সমাজ দেয়নি উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকার। ওদের অধিকার বঞ্চিত করেই কিছু মানুষ তাদের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে।

দক্ষিণ-বিহার, যে অঞ্চল ঘিরে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠেছে। সেই দক্ষিণ বিহারের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে উত্তর-বিহারের মহাজন জোতদাররা আজ ধনী। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের একাদশ ও ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে সমৃদ্ধ হয়েছে শহরাঞ্চলের মহাজনেরা। মিজোরাম-নাগাল্যান্ডের সম্পদ আহরণ করে সমৃদ্ধ

হয়েছে সমতলের কিছু মানুষ সমতলের জনপথ। এই শোষণ এই বঞ্চনা অবিরল ধারায় বয়েই চলেছে বছরের পর বছর। কেউ এই শোষিত বঞ্চিত মানুষদের হয়ে প্রশ্ন তোলেনি কেন এদের শোষণ করে সমৃদ্ধ হবে কিছু ব্যবসায়ী মহাজন ও তাদের সাথী রাজনীতিকরা। এই বঞ্চনা ও শোষণ যখন বঞ্চিত মানুষদের সমাজ জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে প্ররোচিত করেছে, ক্ষুব্ধতার ঝড় তুলতে উদ্বেল করেছে, তখন ব্যবসায়ী, মহাজন ও তাদের রাজনীতি পেশার সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়েছে। ওদের চিহ্নিত করতে চেয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে, দেশের শত্রু হিসেবে। দেশের সর্বত্রই প্রায় একই নিয়মে দেশদ্রোহী—বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

প্রশ্নটা এই— কারা চিহ্নিত করছে? না, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই মন্ত্রক ঠিক করবে কারা দেশদ্রোহী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চলবে কার তর্জনী হেলনে? না, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর গোমস্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তর্জনী হেলনে। দেশের মানুষের যথার্থ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে আন্দোলন, যে সংগ্রাম, তার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের 'দেশদ্রোহী' ঘোষণা করাটাই তো দেশের মানুষের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই তো দেশদ্রোহিতা। ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠীস্বার্থে যারা বলি চড়িয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষগুলোর স্বার্থকে। সেই শাসকগোষ্ঠী আর তার চামচা-হাতারাই তো প্রকৃত দেশদ্রোহী। দেশপ্রেমিক মানুষ তো তারাই, যারা বঞ্চিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য কাঁধে কাঁধ দিয়ে সংগ্রামে নেমেছে।

সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ! এখানে 'ভারতরত্ন'-এর মুকুট চড়ে সেইসব রাজনীতিকদের মাথায় যারা দেশের বঞ্চিত মানুষদের মিথ্যে আশার বাণীতে ভুলিয়ে রেখে শোষণ প্রক্রিয়াকে কায়েম রাখতে সচেষ্ট রেখেছে নিজেদের 'তন্-মন্'।

যারা বিবেচনা শক্তিকে পকেটে পুরে রেখে সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হয়, "জল উঁচু-জল উঁচু, জল নিচু-জল নিচু" বলে, তারাই সরকার চিহ্নিত দেশপ্রেমিক।

১৯৯২-এর আগস্ট মাস ধরে দেশপ্রেমের বাড়তি বান ডাকাল ভারতের বড়-মেজ-সেজ-ছোট নানা মাপের রাজনৈতিক দলগুলো। আকাশবাণীর ধ্বনিতে আর দূরদর্শনের পর্দা জুড়ে শুধু দেশপ্রেমের অনুষ্ঠানের সারিবদ্ধ

প্রদর্শনী। একটি মার্কসবাদী দলের যুব সংগঠন এক লাখ গানের ক্যাসেট বাজারে ছেড়ে দেশপ্রেমের ঝটতি বন্যায় বাড়তি জল সরবরাহ করল। সম্মিলিত প্রচারের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল একটি বিশ্বাসের শিশুকে—মানুষকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই দেশদ্রোহিতা। ওরা মৌলবাদ রোখার কথা বলল, বলল না মৌলবাদের ধারক-বাহক-পালক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটিও কথা। কেন এমন তালগোল পাকানো অস্বচ্ছ-চিন্তাকে সাধারণের মাথায় ঢোকাতে এত বিপুল আয়োজন? কে সেই বিশ্বাসের শিশু?

এই বিশ্বাসের শিশুটির জন্ম হয়েছিল '৯২-এর জানুয়ারির কলিকাতা পুস্তক মেলায় 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ মুহূর্তে। এই খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বিশাল সংখ্যক জনগণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে রাষ্ট্রশক্তি ও বিভিন্ন জন-প্রতারক রাজনৈতিক দল অনুভব করেছিল সর্বনাশের ঝড় আসন্ন। দেশপ্রেম-বিচ্ছিন্নতাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-বিজ্ঞানজাঠা ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছিল উল্লিখিত বইটিতে, সেসব ব্যাখ্যা যে কী বিশালভাবে জনগণকে প্রভাবিত করেছিল তারই এক অকাট্য প্রমাণ রাষ্ট্রশক্তি পেয়েছিল—তাদের বড় সাধের বিজ্ঞান জাঠার চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধসে যাওয়ায়। এই বইটিতে 'দেশপ্রেম' -এর প্রকৃত সংজ্ঞা প্রকাশিত হয়ে মানুষকে দারুণভাবে আন্দোলিত করল। গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-মাঠে সর্বত্র আমাদের সমিতির শাখা সংগঠনগুলো ও সহযোগী সংস্থাগুলো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে জনগণের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে লাগল যুক্তির আলোকে দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা। এই অভাবনীয় অবস্থাকে সামাল দিতে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনকুবেরদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো পালটা মগজ ধোলাই করে জনগণের মাথায় ঢোকাতে চাইল— দেশপ্রেম মানে দেশের ভূখণ্ডের প্রতি প্রেম; দেশের নদী, মাটি, সমুদ্র, পর্বতের প্রতি প্রেম।

কিন্তু একটু আগে যে কথা বলছিলাম, দেশ তো মাটি-নদী-পর্বত নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তো আর যাই হোক, দেশ হয় না, তাই গ্রামে-শহরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বহু নতুন কণ্ঠ তাদের লাগাতার প্রচারে প্রতিষ্ঠা করেই চলেছে 'দেশপ্রেম'-'বিচ্ছিন্নতাবাদ' - 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

আমাদের সমাজে প্রকৃত দেশপ্রেমের কোনও ঐতিহ্য নেই। আর সেই

ঐতিহ্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য তথাকথিত দেশপ্রেমীরা সদা-সতর্ক, সদা তৎপর। এ দেশের ঐতিহ্যে দেশপ্রমিক বলে চিত্রিত রানাপ্রতাপ, শিবাজি থেকে শুরু করে ঝান্সির রানি, বারো ভুঁইয়ার মতো ভিড় করে আসা বহু চরিত্র। এঁদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বকেই বিকৃতভাবে আমাদের সামনে বারবার হাজির করা হয়েছে ও হচ্ছে দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে। ধনিকশ্রেণির অর্থপুষ্ট, ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতিকদেরই 'ভারতরত্ন' বলে ভুষিত করার ঐতিহ্যই আমরা বহন করে চলেছি। হুজুরের প্রতি প্রেমময় এইসব ভারতরত্নরা যদি দেশপ্রেমিক হন, তাহলে দেশদ্রোহী কারা? এই ঐতিহ্য অনুসারী আমরা তাই নিপীড়িতদের স্বার্থরক্ষাকারীকেই 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করেই চলেছি।

ঐতিহাসিক, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, নাট্যকার, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, আকাশবাণী, দূরদর্শন লাগাতার প্রচারে 'জাতীয়-মনীষী', 'জাতীয় মহাপুরুষ' হিসেবে যাঁদের চিত্রিত করেছেন, তাঁদের প্রতি ভক্তির প্লাবনে অনেক সময়ই যুক্তিচ্যুত হয়েছি। এই মনীষীদের যে সীমাবদ্ধতা আছে, ভ্রান্তি আছে এসব ভুলে গিয়ে 'অভ্রান্ত' হিসেবে ধরে নিয়েছি, 'মিথ' হিসেবে গড়ে তুলেছি। আমরা এইসব 'জাতীয় নেতাদের' 'জাতীয় মুক্তির প্রতীক', 'প্রাতঃস্মরণীয়', 'অনুকরণযোগ্য', 'জাতীয় প্রগতির প্রতীক' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থেই এইসব জাতীয় মনীষীদের সঠিক মূল্যায়ন একান্তই প্রয়োজন। ভ্রান্ত মূল্যায়নকে বজায় রেখে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়তে গেলে ওইসব মনীষীদের ভ্রান্তিকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধ্বংসের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করবে শোষকশ্রেণি ও রাষ্ট্রশক্তি। এইসব মনীষীদের চরিত্রের মাঝে-মাঝেই যে স্ববিরোধিতা, দ্বিচারিতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, প্রকৃত মূল্যায়নের স্বার্থেই সে বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনায় আসা একান্তই প্রয়োজনীয়, নতুবা এইসব মনীষীদের ছবি ঘিরে জ্যোতি নামক কুয়াশা সৃষ্টি হলে প্রগতির গতি হবে রুদ্ধ।

এও তো ঐতিহাসিক সত্য—যে রামমোহন ফরাসি বিপ্লবের জয়ের খবরে উল্লসিত হয়ে ভাঙা পা নিয়েও ছুটে গিয়েছিলেন ফরাসি জাহাজে ফরাসি পতাকাকে অভিনন্দন জানাতে; স্পেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সংবাদে আনন্দের প্রাবল্যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন কলকাতার টাউন হলে; ইতালীর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে শয্যা নিয়েছিলেন; সেই 'স্বাধীনতার পূজারি', 'জাতীয়তাবাদের জনক' হিসেবে পূজিত রামমোহন ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন, "ইংরেজ জাতির অভিজাত সম্প্রদায় ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করলে তার ফল ভারতীয়দের কাছে বিশেষ মঙ্গলময় হবে।" শোষক ও উৎপীড়ক নীলকর সাহেবদের পক্ষ নিয়ে নিলর্জ্জের মতো বলতে পেরেছিলেন, "নীলকর সাহেবরা এ-দেশে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই করেছে বেশি।" নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সেই সংগ্রাম রামমোহনের চোখে ছিল, 'সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আন্দোলন।' সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রামমোহনের বিশাল অবদানের কথা সুবিশাল প্রচারের কল্যাণে অনেকেরই অজানা হয়। কিন্তু ক'জনের জানা আছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাওয়ার ক্ষেত্রে রামমোহনের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা? রামমোহনের কথায়, 'প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ সংবাদপত্রের রামমোহনের বিশাল অবদানের কথা সুবিশাল প্রচারের কল্যাণে অনেকেরই অজানা নয়। কিন্তু ক'জনের জানা আছে, সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না পারলে অথবা তার প্রতিকার না হলে বিপ্লব ঘটে যেতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেই বিপদ নিবারণ করতে পারে।' হিন্দু-ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার ছিলেন বলে যে চরিত্রটি চিত্রিত হয়ে আসছে তাও তো ঠিক নয়। এ-বিষয়েও তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল। জাত-পাতের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামী পুরুষ বলে যে সীমাহীন প্রচার অবিরল ধারায় চলে আসছে, সেও তো গল্পের গরুকে গাছে তোলারই নামান্তর মাত্র।

রামমোহন হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও কু-আচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও নিজে কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পৈতেটি পরিত্যাগ করতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার একটি ঘরে ব্রাহ্মণরা বেদ ও উপনিষদ পাঠ করতেন। ওই ঘরে অব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ।

যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বাল্য-বিবাহ রোধের আন্দোলনে ঋজুতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, বেদান্ত-সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই আবার শিক্ষা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। মঞ্চে কোনও নারীকে অভিনেত্রীর ভূমিকায় সহ্য করতে পারতেন

না। সিপাহি বিদ্রোহ দমনকারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর থাকার জন্য তাঁর পরিচালনাধীন সংস্কৃত কলেজকে ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ শাসকদের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। এরপরও বিদ্যাসাগরকে সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে এক 'জাতীয়-নেতা', 'দেশ-প্রেমিক' বলা যায় কি?

বাংলা গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু ভক্তিরসের অতি-প্লাবনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরম-মন্ত্র 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনির স্রষ্টা হিসেবে হাজির করা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তো মোটেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিলেন না। তিনিই বরং ব্রিটিশ সরকারকে 'ভারতের পরমোপকারী' বলে সোচ্চার ঘোষণা রেখেছিলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রই মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক প্রচার বন্ধ রাখতে বলেছিলেন এই কারণে যে, কৃষক বিদ্রোহের এই নাটক অভিনীত হতে থাকলে ইংরেজ বিরোধিতার 'জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে।' দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' নাটকের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "সমাজ সংস্কারাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকে নাটকত্ব থাকে না।" বঙ্কিমচন্দ্রই ভারতমাতাকে চিত্রিত করেছিলেন হিন্দুদেবীর রূপ কল্পনায় যা মেনে নেওয়া মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় কারণে ছিল অসম্ভব। তিনিই এভাবে ভারতবর্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষকে পালন ও পুষ্ট করতে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেননি কি?

দীনবন্ধু মিত্র চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে 'নীলদর্পণ' রচনা করলেও এই নাটকের ভূমিকাতেই ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহারানি ভিক্টোরিয়ার জয়গান গেয়ে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রশস্তি গেয়ে রাজভক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকেও তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

স্বামী বিবেকানন্দকে যতই যুক্তিবাদী ও প্রগ্রতিবাদী বলে প্রচার করা হোক না কেন তার বিজ্ঞান বিরোধী, যুক্তি বিরোধী, স্ববিরোধী চরিত্র তাতে বিন্দুমাত্র বদলায় না। বিবেকানন্দ রচনাবলি শুধুমাত্র তাকে সাজিয়ে না রেখে তাতে চোখ বোলালেই এমন অজস্র উদাহরণ সাধারণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে। তিনি যেমন জাত-পাতের বিভেদের সমর্থক ছিলেন তেমনই সমর্থক ছিলেন সতীদাহ প্রথার। স্বামীজির কথা মতো সতীরা মৃত্যুর পর 'অমরলোকে প্রস্থান করেছেন।' বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "আমি এখনো এমন কোনো জাতি দেখিনি, যার উন্নতি বা শুভাশুভ বিধবাদের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।" ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পতি বা পত্নী নির্বাচনের ফলে "পাশবপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চেষ্টা সমাজে অবাধ বিস্তার লাভ করে, এর ফল

নিশ্চয় অশুভ হবে— দুষ্ট প্রকৃতি, অসুর ভাবের সন্তান জন্মাবে” বলে বিবেকানন্দ মত প্রকাশ করেছেন। প্রচারে প্রাজ্ঞ স্বামীজির শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য কী? তাঁর কথায়, “যত কম পড়বে তত মঙ্গল। গীতা ও বেদান্তের উপর যেসব ভাল গ্রন্থ আছে সেগুলি পড়। কেবল এইগুলি হলেই চলবে।” স্বামীজির উপদেশকে মানব সমাজ মহাদর্শ হিসেবে নিজ জীবনে গ্রহণ করলে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতি হত স্তব্ধ। জিজ্ঞাসু মন সৃষ্টির বদলে জ্ঞানের অনড়তায় আবদ্ধ থাকাকেই যিনি জীবনে পরম কাম্য জ্ঞান করেন, থাকে যাঁরা রেনেঁসাস যুগের পুরোধা বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের বিবেচনা-শক্তি বিষয়েও সন্দেহ দেখা দেয়, জ্ঞানস্পৃহাকে দ্বিধাহীন ভাষায় নিন্দা করে স্বামীজি বলেছেন, এ “অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ ও ভ্রম সৃষ্টি করে”। আরও বলেছেন, “গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে।” জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন জানিয়ে স্বামীজি বলেছেন, “জাতিভেদ আছে বলেই ত্রিশ কোটি মানুষ এখনো খাবার জন্য এক টুকরো রুটি পাচ্ছে।” আদর্শ জীবনচর্যার পথ নির্দেশ দিয়ে স্বামীজি জানিয়েছেন, “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ‘দেব’ ও ‘দেবী’ লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ‘দাস’ ও ‘দাসী’।”

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের প্রতিটি সম্ভাবনাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন পরাধীন দেশের এই চিন্তা-নায়কটি। লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ চিন্তাকে স্থান না দেওয়ার কারণ সম্ভবত দেশীয় রাজাদের উপর স্বামীজির অতি-নির্ভরতা। রাজারা ও জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের অনুগত হওয়ার দরুন স্বামীজির পক্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্রেফ ‘বাঁদরামি’ বলে নিন্দা করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চোখে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব ছিল সমার্থক। বহু-ধর্মাবলম্বীদের দেশে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম যে আদৌ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে না, এই সত্যকে অস্বীকার করে তিনি বেদান্তকে হাতিয়ার করে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

এমন সব চিন্তাধারার নায়ককে যদি ‘প্রগতি বিরোধী’ না বলে ‘প্রগতিবাদী’ বলা হয়, তাহলে ‘প্রগতি’ শব্দের অর্থই পালটে যায় না কি?

একটি পরাধীন দেশে অধীন প্রভুর বিরোধিতা করাটাই কোনও ব্যক্তি বা আন্দোলনের পক্ষে প্রগতিশীলতা-বিচারের মূল পরিমাপক হওয়া উচিত। যাঁরা ভারতবর্ষের অথাকথিত রেনেসাঁস যুগের পুরোধাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, “উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন জানানোই

ছিল প্রগতিশীলতার লক্ষণ, কারণ ব্রিটিশ শাসনই ভারতীয় অনড় সমাজজীবনে গতি এনেছিল", তাদের যুক্তিকে মেনে নিলে বলতেই হয় সবচেয়ে বড় প্রগতিশীল হিসেবে পূজিত হওয়া উচিত বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের। কারণ তিনিই এদেশে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে আমাদের সমর্থন জানাতে হয় সেইসব উপনিবেশিক শক্তিকে যারা গত কয়েক শতক ধরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিজেদের থাবার তলায় রেখে শোষণ চালিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। কারণ, একই ভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন দেশগুলোর সমাজ জীবনে কিছু গতি যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশে।

বাস্তবিকই কি আমরা উন্মাদের মতো আচরণ করে সমর্থন জানান ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নগ্ন লুণ্ঠন চালিয়ে যাওয়াকে? এ সমর্থন যদি যুক্তিহীন বলে ত্যাজ্য হয়, তবে তথাকথিত রেনেসাঁস যুগের তথাকথিত মনীষীদের প্রতি সমর্থন ও ভক্তিকেও বর্জন করতেই হয়। সঠিক মূল্যায়ন ও নিরপেক্ষতার নিরিখে 'দেশপ্রেমিক' ও 'দেশদ্রোহী'দের চিহ্নিত করতে না পারলে, হুজুরদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের এবং বিরোধী সংগ্রামী চরিত্রদের চিনতে না পারলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সর্বাত্মক বিপ্লবের স্বপ্নে ধ্বংসের সম্ভাবনার বীজ থেকেই যাবে। আজ মুখোশ টেনে নামাবার সময় এসেছে। মুখোশের আড়ালের মুখগুলোকে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। আজ যারা মুখোশ তৈরির শিল্পীর ভূমিকায় রয়েছে— তাদেরও চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কল্লোল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে তাতে গতি সঞ্চারিত করতে আবেগের পরিবর্তে যুক্তির নিরিখে আন্দোলনের ও ব্যক্তির চরিত্রের বিচার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গণতন্ত্র : একটি মোরগের কাহিনি

আমাদের দেশ বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক' দেশ। এ দেশে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। সংবিধান সেই অধিকার রক্ষায় সদা সতর্ক। এখানে লৌহযবনিকার

অন্তরালে মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয় না। দেশের মানুষ খাঁচার পাখি নয়, বনের পাখির মতোই মুক্ত। এদেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতির আর ওড়িশার কালাহান্ডির মানুষগুলো একই অধিকার ভোগ করে, চুলচেরা সমান অধিকার।

এই ধরনের প্রতিটি কথাকে বর্বর রসিকতা বলেই মনে হয় যখন দেখি, কালাহান্ডির মানুষগুলো দিনের পর দিন ক্ষুধার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিল, আর তারই সঙ্গে মৃত্যু ঘটল একটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারের। এ-সব আপনজন হারা বহু মানুষের হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে রক্তাক্ত করে। এই রক্তাক্ত হৃদয়গুলোই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, যখন দেখে শোষকশ্রেণির কৃপায় দিতে বসা কতকগুলো রাজনীতিক ওই একই সময় রাষ্ট্রপতির গণতান্ত্রিক অধিকারসম্মতভাবে দেওয়া ছত্রিশ কোর্সের ভোজসভায় কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে করতে ভারতবর্ষকে 'সুমহান গণতন্ত্রের দেশ', 'সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ' ইত্যাদি বলে কদর্য বর্বর রসিকতা করছে।

প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারই বিড়লা, আম্বানিদের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ভিখারিটিকে পর্যন্ত। পার্থক্য শুধু রাষ্ট্রশক্তির অকরুণ সহযোগিতায় বিড়লা, আম্বানিদের অধিকারের হাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে ভিখারির অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেই শুধু ভুলে গেছে রাষ্ট্রশক্তি—এই যা।

১৬ সেপ্টেম্বর '৯১ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটা খবরের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খবরটাকে ছোট্ট করে নিলে দাঁড়ায় এই—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এক বড়কর্তার বাগান আছে ঝাড়গ্রামের জিতুশোল মৌজায়। সেই বাগান থেকে তিনটি আমগাছের চারা চুরি যাওয়ায় রাজ্য পুলিশবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে ওই অঞ্চলে। পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে জিতুশোল মৌজার তিনশো গ্রামবাসী জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছেন। একটিও বয়স্ক পুরুষ নেই গ্রামে। তবু গ্রামবাসীদের ওপর চলেছে পুলিশের ভীতিপ্রদর্শন। অনেকেই থানা-লকআপে আটক রেখে দিনের পর দিন পেটানো হচ্ছে। আর পুলিশের বড়কর্তার বাগান পাহারা দিতে রাজ্যের জনগণের টাকায় পালিত পুলিশ একটি স্থায়ী চৌকি বসিয়েছে।

একবার উত্তেজিত মাথাকে ঠান্ডা করে ভাবুন তো —একটি গরিব লোকের বাগান থেকে তিনটে আমগাছের চারা চুরি গেলে থানায় রিপোর্ট লেখাতে গেলে পুলিশ তার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে? আমচারা চোর ধরে দেওয়ার বেয়াদপি আবদার শুনে থানার মেজবাবু হয় বেজায় রসিকতা ভেবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন, নতুবা বেয়াদপটাকে এক দাবড়ানিতে থানা-ছুট করতে বাধ্য করবেন।

কিন্তু রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তার বাগান থেকে মাত্র তিনটি আমচারা চুরি যেতেই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র-প্রহরী পুলিশবাহিনী পাগলা-কুকুরের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল জিতুশোলের মানুষগুলোর ওপর। পুলিশি অত্যাচারে তিনশো মানুষ জঙ্গলের রাজত্ব থেকে বাঁচতে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। ধরে নিলাম, ওই গ্রামবাসীদের মধ্যেই রয়েছে এক, দুই বা তিনজন আমরা চার চোর। ধরে নিলাম, পুলিশ তাদের ধরেও ফেলল। ফেলুক, খুব ভাল্লো কথা। তারপর পুলিশের কর্তব্য চোরটিকে বা চোরদের বিচার বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া। অপরাধ প্রমাণে শাস্তি যা দেওয়ার তা দেবেন বিচার বিভাগ। ওই বিচারাধীন চোর বা চোরদের পেটাই করার কোনও অধিকার আমাদের দেশের গণতন্ত্রে তো পুলিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

জিতুশোল মৌজার এক দুই বা তিনজন সম্ভাব্য অপরাধীর ওপর পুলিশি অত্যাচার নেমে আসেনি, পুলিশবাহিনী বর্বর গুন্ডামি চালিয়েছিল তামাম গ্রামবাসীদের ওপর। গ্রামবাসীদের একটিই অপরাধ বড় কর্তার বাগান এলাকায় তাদের বাস।

আইন ভাঙা অপরাধ। আইনের রক্ষকদের আইন ভাঙা আরও বড় অপরাধ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ওইসব বর্বর গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আইন আদৌ কঠিন হতে পারবে? তা যদি না পারে তবে অত্যাচারিত মানুষগুলো, যুক্তিবাদী মানুষগুলো, অনপুংসক মানুষগুলো কী করে বিশ্বাস করবে—আমাদের দেশের গণতন্ত্রে রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তার ও একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর সমান গণতান্ত্রিক অধিকার?

পুলিশের সামান্য বড়কর্তার সঙ্গে সাধারণ অধিকারের পার্থক্য যদি এমন আশমান-জমিন হয়, তবে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের সঙ্গে এবং মন্ত্রী বানাবার মালিক অর্থকুবেরদের সঙ্গে গরিব মানুষগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারের পার্থক্য যে সীমাহীন হবে, এই তো প্রকৃত সত্য।

এ-দেশে অনেক বিত্তবানেরাই, অনেক জোতদারেরাই নিজস্ব গণতন্ত্রের হাতকে আরও বেশি দীর্ঘ করতে বাহিনী পোষে। এইসব বাহিনী বা

সেনাবাহিনীর নামও নানা বিচিত্র ধরণে—ভূমিসেনা, লোরিকসেনা, ব্রাহ্মর্ষিসেনা, এমনি আরও কত নামেই রয়েছে এইসব সংগঠিত হিংস্র সেনাবাহিনী। সেইসব বাহিনীর হাতে নিত্যই নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। সামান্য ইচ্ছায় এরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, লুটে নেয় মহিলাদের লজ্জা। আর নির্লজ্জের মতো সরকার দেখেও অন্ধ হয়ে থাকে। এই উগ্রপন্থী নরখাদকদের কঠোর হাতে দমন করতে কখনোই তো এগিয়ে আসে না সরকার? কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকারে এই সব সেনাবীহিনী পুষে চলেছে হুজুরের দল? নিপীড়িত মানুষদের দাবিকে দাবিয়ে রাখতে ওদের সেনাবাহিনী পোষা যদি গণতন্ত্র-সম্মত হয়, উগ্রপন্থা না হয়, তবে অত্যাচারিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য সেনা গঠন অগণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র-বীরভোগ্যার গণতন্ত্র। যার যত বেশি ক্ষমতা, যত বেশি অর্থ, যত বেশি শক্তি, তার তত বেশি বেশি গণতন্ত্র। শোষকদের অর্থে গদিতে আসীন হয়ে শোষক ও শোষিতদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার বিলানো যায় না। শাসক ও শোষকরা শুধু এই অধিকারের সীমা ভঙ্গই করে পরম অবহেলে; আর শোষিতদের অধিকার বার বার লাঞ্ছিত হয়, লুণ্ঠিত হয়—এ অতি নির্মম সত্য। আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; তাহলেই দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে 'গণতন্ত্র' আছে দেশের সংবিধানে ও বইয়ের পাতায়, গরিবদের জীবনে নয়।

যে দেশের মানুষের দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার অধিকার নেই, বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে গ্রহণের অধিকার নেই, শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধে গ্রহণের অধিকার নেই সেখানে বিড়লা, আম্বানি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর গরিব মানুষগুলোর সমান গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা যারা বলে, তারা শয়তানেরই দোসর—এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গণতন্ত্র মানে কি শুধুই ভোট দেওয়ার অধিকার? সেটাই বা কজনের আছে? ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, চতুর রিগিং সেই অধিকারে তো অনেক দিনই থাবা বসিয়েছে।

তারপরও যদি ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে কেউ বলেন এই

দেশের মানুষই কখনও ইন্দিরাকে তুলেছেন কখনও নামিয়েছেন, কখনও রাজীবকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, কখনও বা ছুঁড়ে ফেলেছেন, কখনও এনেছেন ভি.পি-কে, কখনও বা পি.ভি-কে; তাঁদের আবারও মনে করিয়ে দেব পরম সত্যটি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলব কথাটি —মন্ত্রী যায়, মন্ত্রী আসে এদের বহু অমিলের মধ্যে একটাই শুধু মিল—এঁরা প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণির কৃপাধন্য, পরম সেবক। এরা শোষকদের শোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার বিনিময়ে আখের গোছান।

আর একটি ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি একটু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

১৪ আগস্ট '৯১ আনন্দবাজারে তিনটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যাদের শুরু একই রকম হলেও পরিণতি ভিন্নতর। সংবাদ এক : সৌদি আরবের এক বৃদ্ধ এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। আদালত ওই বিচারাধীন আসামিকে পনেরো দিন পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সংবাদ **দুই** : ওড়িশার জনতা দলের বিধায়ক তথাগত শতপথী একটি নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ভুবনেশ্বর থেকে পুরী নিয়ে যান এবং নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে পুলিশ তথাগতকে গ্রেপ্তার করে। ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনতা দলের শ্রীবিজু পট্টনায়কের হস্তক্ষেপে তাঁর দলের বিধায়ক তথাগতর উপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। তথাগত অবশ্য গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন 'এমন মেয়ে ফুঁসলানো' তাঁর জীবনে 'এই প্রথম নয়।' সংবাদ **তিন** : ত্রিপুরার মন্ত্রী জহর সাহা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় মহিলাটির পাড়ার লোকেদের হাতে ধরা পড়েন। জহর সাহাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার। জহর ঘোষণা করলেন, তাঁকে মন্ত্রিসভার ফিরিয়ে না নিলে মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিল তুলে দেবেন সংবাদপত্রের হাতে। শঙ্কিত ও জহর ভয়ে কম্পিত মুখ্যমন্ত্রী ওই দিনের সংবাদে জহর সাহাকে 'ধোয়া তুলসী পাতা' বলে ঘোষণা করে ইঙ্গিত দিয়েছেন জহরকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নেবেন।

আরবের শেখ, তথাগত শতপথী ও জহর সাহার খবর পড়ে যদি ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নাগরিক তার শিক্ষককে প্রশ্ন করে বসে— ভারতবর্ষ কেমন গণতন্ত্রের দেশ, দুর্নীতিপরায়ণ লম্পটরা রাজনীতিক হওয়ার সুবাদে আইনকে লাথি কষিয়ে ফুটবল খেলে আর খুঁটির অভাবে তার চেয়ে লঘু অপরাধে জেলেপচে শেখ? কী জবাব দেবেন শিক্ষক? সত্যি কথাটুকু বলতে গেলে

যে দরাজ বুকের পাটা প্রয়োজন তা এই চাটুকার ধান্দাবাজ ও ক্লীবে ছেয়ে ফেলা দেশে কতজনের আছে? শিক্ষকরা আজ যদি সত্যির থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, ছাত্ররা যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা কী শিখবে?

জানি—দুর্নীতি যেখানে অসীম, দলবাজি যেখানে চূড়ান্ত, অন্যায়ের সঙ্গে আপস যেখানে বেঁচে থাকার শর্ত—সে দেশে সত্যি বলাটা, সত্যি শেখানোটা চূড়ান্ত অপরাধ, 'উগ্রপন্থী 'দেশদ্রোহী' বলে দেগে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তবু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে শিক্ষার মহান দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া মানুষদেরই তুলে নিতে হবে মানুষ গড়ার দায়িত্ব, নতুন প্রজন্মের মানুষ গড়ার দায়িত্ব।

মানবাধিকার : এসো মুক্ত কর

কলকাতার বড়বাজারে কোনও দুই উদ্ধত লরিচালক ভেবে নিয়েছিল গাড়ির কাগজ-পত্তর ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিক থাকলে এবং বে-আইনি মালপত্তর না বয়ে আইন মেনে গাড়ি চালালেই বুঝি সব ঠিক-ঠাক। পুলিশরা তাদের চা খাওয়ার জন্য মাত্তর কয়েকটি হাজার টাকা চাইতেই লরির সামান্য ড্রাইভার সামান্য কথাই বলেছিল— বে-আইনি কিছু তো করিনি! আইন ভাঙলে কেস্ দিন।

বেয়াদপের মতো এমন কথা বলায়, এমন মানুষের অধিকার বুক ঠুকে দাবি করায়, পুলিশরা ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে বুটের লাথিতে বুক ভেঙে দিয়েছিল।

লরির ড্রাইভারদের জানা উচিত ছিল তার আজব দেশের আজব আইন-কানুন। এখানে বাস (সরকারি বাস বাদ), মিনিবাস, লরি প্রত্যেকের চাকা ঘোরাবার অধিকার কিনতে হয় পুলিশের সঙ্গে রফা করে। কোনও মানুষের অধিকার নেই পুলিশ ও রাজনৈতিক মস্তানদের সঙ্গে রফা না করে ফুটপাত দখল করে আনাজ বেচে কি কামিজ বেচে নিজের বেঁচে থাকার খোরাক তুলবে। এখানে কোনও মানুষ মানবাধিকারের ধুয়ো তুলে পারবে

না, রাজনীতির দাদাদের হাতে কিছু তুলে না দিয়ে শেষ সম্বল ভিটে-মাটিটুকুও বিক্রি করতে। ভাড়াটে তুলবেন, ভাড়াটে বসাবেন—সর্বত্র আপনার মানবাধিকারকে ছেঁটে ছোট করতে হবে পাড়ার রাজনীতিকদের সঙ্গে আপস করতে গিয়ে। আপনি আপনার মানুষের অধিকারে কাজ পাবেন না ইনকামট্যাক্স, সেলসট্যাক্স, মোটর ভেহিকলস্ কোর্ট এমনি হাজারো প্রতিষ্ঠানে। মানবাধিকারকে ছেঁটে ফেলে কিঞ্চিত মুদ্রা হাজির করলে তবেই কাজ মেলে, মেলে ব্যাঙ্ক ঋণ, পাস হয় বিল, পাওয়া যায় টেন্ডার, পাস হয় দূরর্শনের কাহিনি, কলেজের অ্যাডমিশন, কি নয়?

মানুষ আজ আপস করতে করতে পাপোশ হয়ে পড়ায় তার অধিকারটুকুও দাবি করতে ভুলেছে। আর তাই আমাদেরই অর্থে আমাদের সেবার নামে পালিত সাংসদ, বিধায়ক, পুলিশ প্রত্যেকেই সাধারণভাবে দুর্বিনীত, হাতে মাথা কাটে। কখনও কোনও ন্যায্য দাবি আদায় আপনাকে সাহায্য করলে ভাবটা এমন দেখায়, যেন দয়া করছে, তার ঘর থেকে সাহায্য তুলে দিচ্ছে। ওদের প্রায় সকলেরই ভাবটা এমন, যেন জনগণের সেবক ওরা নয়, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

বিভিন্ন দেশের সংবিধানেই সে দেশের মানুষদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার এই যে অধিকারগুলো দেশের মানুষদের দিয়েছে, এগুলো ওরা ভিক্ষা দেয়নি, কোনও অধিকারই সংগ্রাম ছাড়া আসেনি। যে সব অধিকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদায় করা গেছে তার বাইরেও বহু অধিকারই অধরা রয়ে গেছে, যেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ লড়াই চালিয়েই যাচ্ছে। মানবিকতার বিকাশের জন্য মানুষের যে যে অধিকার একান্তই প্রয়োজন, তা আজও দেয়নি আমাদের দেশ ভারত-এর রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। আজও এ-দেশের মানুষের অধিকার নেই মাথা গোঁজার ছোট্ট ঠাঁইটুকু পাওয়ার। দু-মুঠো ভাত—দু'টো রুটি—একটু ত্যানা জোটাবার জন্য চাকরির অধিকারও আমাদের সংবিধানে নেই। অধিকার নেই সাংসদরা বা বিধায়করা জন-বিরোধী কাজে জড়িত থাকলে বা অঞ্চলের দিকে বিন্দুমাত্র দিক্‌পাত না করলেও তাকে ফিরিয়ে আনার। আমরা আজ যে মানুষের অধিকারগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছি তা স্পষ্টতই খর্বিত অধিকার।

কিন্তু এই আদায়করা খর্বিত অধিকারের কতটুকু আপনি ভোগ করতে পারেন? শুরুতে অতি সংক্ষিপ্ত যে কটি উদাহরণ টেনেছি তারই সূত্র ধরে আপনি কাঁটায় কাঁটায় বিচারে নামুন, দেখবেন আপনার অধিকার প্রতিটি দিন কী বিপুলভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং আমার সংক্ষিপ্ত ফর্দটা আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এরপরও একটা কথা থেকে যায়, আপনার স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে তখনই পারবেন এবং ভোগ না করতে পারলে সেই বিষয়ে অন্তত প্রতিবাদ জানাতে পারবেন, যখন জানবেন কী কী অধিকার আপনার আছে।

তারই সঙ্গে এও ঠিক, আপনার-আমার যে অধিকারের জন্য সরকার বিপন্ন বোধ করবে, সেই অধিকারই কেড়ে নেবে যে কোনও অজুহাতে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রচলিত আইন অনুসারে অভিযুক্তর (অভিযুক্তকে কখনোই আসামি বলা যায় না) অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর। কেউ যদি হত্যাকারী, বেআইনি অস্ত্র বহনকারী অন্তর্ঘাতমূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তির বিধান আমাদের সংবিধানে আছে। কিন্তু এটা কি আপনি মেনে নেবেন আজ পুলিশ আপনাকে যদি হত্যার অপরাধে ধরে বলে, "আপনি হত্যা করেছেন 'ক' বাবুকে, সাক্ষী আছেন কয়েকজন, এবং আপনিই প্রমাণ করুন আপনি আপনার পাশের পাড়ার ক'বাবুকে হত্যা করেন নি?"

আপনি হয় তো বললেন, "আমি খুনের সময় ক'বাবুর পাড়াতেই যাইনি।" অমনি দেখলেন আপনাকে বলা হল, "আপনার বিরুদ্ধে তিনজন সাক্ষী আছে। তার একজন জানিয়েছে আপনার একটা বে-আইনি অমুক রিভলবার আছে। ক'বাবুকে ওই জাতীয় রিভলবার থেকেই হত্যা করা হয়েছে। ওই রিভলবার পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ পরীক্ষা করে দেখতে পাবে ঠিক ওই রিভলবার থেকেই গুলি চালানো হয়েছে কি না?"

আপনি বললেন, "অমন কোনও বেআইনি রিভলবার তো আমার নেই?"

পুলিশ বলল, "আপনি প্রমাণ করুন আপনার ওই রিভলবার নেই।"

এছাড়াও পুলিশ জানাল, "আপনি যে গুলি চালিয়েছেন, তার দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে। তারা সাক্ষ্যও দিয়েছে।"

আপনি বললেন, "এ তো উদ্ভট মিথ্যে। তখন আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম, সাক্ষী আমার স্ত্রী ও ছেলে।"

পুলিশ বলল, "এমন কেসে স্ত্রী ও ছেলের সাক্ষ্যর কোনও দামই নেই।"

আপনি বললেন, "আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী কারা?"

পুলিশ জানাল, "নাম, পরিচয় জানানো যাবে না।"

বললেন, "ঠিক আছে, তাই সই। ওদের মুখ ঢেকে নিয়ে আসুন, অথবা

আমার চোখ দিন বেঁধে। আমি ওদের জেরায় জেরায় জেরবার করে বুঝিয়ে দেব মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার মজাটা।"

পুলিশ বলল, "না, সাক্ষীদের জেরা করতে দেব না।"

হতাশ আপনি অন্ধকার দেখলেন, চেঁচালেন, "এভাবে তোমরা আমার বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিতে পারো না।"

আপনার কথা বিচারক ও পুলিশ ছাড়া কেউই শুনল না, জানল না, কারণ আপনার বিচার হচ্ছে গোপনে, এখানে আর কারও প্রবেশ নিষেধ।

আপনি আপনার নির্দোষিতা কোনওভাবেই প্রমাণ করতে পারছেন না, তাই আপনার শাস্তি হয়ে গেল। আপনি ফাঁসিতে চড়লেন।

এই সমস্ত শুনে আপনি হয় তো চেঁচাবেন, "এমনটা আমাদের দেশে হয় না, ওসব অসভ্য দেশে হয়। ডিক্টেটররা নিজেদের গদিকে মসৃণ রাখতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে যাদের ধরে তাদের আইনের নামে হত্যা করতেই এমন প্রহসন করে।"

তখন আমি বলব, আপনার ধারণাকে বিশাল অট্টহাসিতে খান্‌খান্‌ করে দিয়েছে আমাদের দেশেরই শাসককুল। 'সন্ত্রাসবাদী' সিলমোহর দেগে দিয়ে আপনাকে ধরলে আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে আপনি বোম মারেননি, অস্ত্র পাচার করেননি বা খুন করেননি ইত্যাদি। আপনার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের নাম পরিচয় জানতে পারবেন না, তাদের জেরা করতেও না। আর 'সন্ত্রাসবাদী' ছাপ পড়লে Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) অনুসারে ন্যূনতম সাজা ১০ বছর জেল। আইনের প্রচলিত নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত, বীভৎস, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইন আজও ভারতে চালু আছে।

এক সময় এমন মানবিকতা বিরোধী আইনের প্রতিবাদ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের গণ-প্রতিনিধিরা। কিন্তু এই কালা আইনকেই এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রয়োগ করল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ঠেকাতে। বামফ্রন্ট সরকার বিপন্ন বোধ করলে মানবিক অধিকারেও থাবা বসাবে। প্রগতিশীলতার মুখোশ ছিঁড়ে প্রকাশিত করল সেই সত্য— রাজা আসে, রাজা যায়, ক্ষমতা হাত পাল্টায়; ওরা সিংহাসনে পাছা রেখেই হাঁক পাড়ে— হালুম; হাড়-হাভাতে তেমনই আছে, চোখ মেলতেই মালুম।

আমাদের, সাধারণ মানুষদের বিশ্বাসের অণুতে-পরমাণুতে মিশে রয়েছে, 'পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা'। পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে

বাবার নাম না ভুলিয়ে ছেড়েছে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের শহর-গাঁয়ের মানুষদের হয়নি। গোটা দেশেরই একটি রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েই গত কয়েকটা বছরের ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলাই আসুন। পশ্চিমবাংলায় শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বইটি লেখা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯২-এর নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ কাসট্যাডিতে (custody)) বা হেফাজতে অভিযুক্ত মারা গেছেন ১৩৬ জন। custody কথার অভিধানগত অর্থ 'নিরাপদ তত্ত্বাবধান', 'নিরাপদ রক্ষণ'। সন্তান যেমন পিতা-মাতার নিরাপদ তত্ত্বাবধানে বা হেফাজতেই বড় হয় পরম নিশ্চিন্তে, তদন্ত চলাকালীন তেমন নিশ্চিন্তেই পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের থাকাটা আইনমাফিক স্বাভাবিক। সেই আইনকে ভঙ্গ করে পুলিশ যে বর্বরোচিত নির্যাতন অভিযুক্তদের ওপর চালায়, তা অভিজ্ঞতাহীন মানুষদের পক্ষে কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ১৬৩ নম্বর ফৌজদারি দণ্ডবিধি মতো পুলিশ কখনওই কোনও অভিযুক্তকে মারধর তো করতে পারেই না, এমনকী, হুমকি বা ভয় পর্যন্ত দেখাতে পারে না। এই আইনটি-সহ প্রতিটি আইনের রক্ষক হল পুলিশ। একই সঙ্গে সংবিধান অনুসারে পুলিশ আইনের অধীন। অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই সে আইনকে ভঙ্গ করতে পারে না। ভঙ্গ করলে সেও অবশ্যই অপরাধী, শাস্তি-যোগ্য অপরাধী। কিন্তু আপনার আমার অভিজ্ঞতা কী বলে? পুলিশ নিজেই আইন মানে না। প্রতিটি মুহূর্তে আইনের রক্ষকদের হাতে আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। লরি আর বাসের ঘুষে সন্তুষ্ট নয়। চোরাকারবারি, ভেজালদার, ডাকাত, মস্তান, ড্রাগ ব্যবসায়ী, বিল্ডিং প্রমোটার, সবার সঙ্গেই আজ থানা ও পুলিশের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। আইন ভঙ্গকারীরা আইনের রক্ষকদের ছত্র-ছায়ায় আইন ভাঙছে। আইনের রক্ষকরা আইনের মুখে নিত্য প্রতিটি প্রহরে লাথি কষিয়ে বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের রক্ষকের ভূমিকা নিচ্ছে। বার-বার তাই পুলিশকে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বয়কট করেছে জঘন্য সমাজবিরোধী বিবেচনায়, চূড়ান্ত ঘৃণায়। এলাহাবাদ আদালতের বিচারপতির ভাষায় "পুলিশ মানে সবচেয়ে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী।"

প্রসঙ্গতে ফিরি—পুলিশ হেফাজতে মৃত ১৩৬ জনের জন্য কতজন পুলিশকে সরকারি শাস্তি দিয়েছে? একজনকেও না। তবে কি ওইসব মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী নয়? সকল অভিযুক্তই কি তবে আত্মহত্যা করেছিলেন? একটু চোখ বোলান পৃথিবীর আরও কিছু দেশে, এই যেমন সাউথ আফ্রিকা

থেকে শুরু করে ফৌজি একনায়ক শাসিত দেশগুলোতে, দেখবেন ও-সব দেশেও পুলিশ হেফাজতে প্রচুর অভিযুক্ত মারা যান। ওরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করে। তাই ও-সব দেশের পুলিশদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আসে না। সম্ভবত আমাদের দেশ ও ও-সব দেশের মতো অভিযুক্তরা পুলিশের অতি সুন্দর নিরাপদ তত্ত্বাবধানে থেকে রোমান্টিক হয়ে ওঠেন রাতারাতি এবং 'মরণ রে তু হুঁ মম শ্যাম সমান' বলে ঝপাৎ করে আত্মহত্যা করে ফেলেন। এইসব দেশের পুলিশি হেফাজতে থাকলে যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে— এই সহজ সরল সত্যকে আমাদের আপন সরকার মেনে নিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, এই রাজ্যে মানুষের অধিকার কখনওই লঙ্ঘিত হয় না, রক্ষিতই হয়। জানি না প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি পদে-পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার পরও এ দেশের মানুষের পদদলিত সত্তা সোচ্চারে ঘোষণা করবে কি না— "রাজা তুমি মিথ্যেবাদী।"

চাটুকার, ক্লীব ও মেরুদণ্ডহীন মানুষ তৈরির জন্য যে সংস্কৃতি হুজুরের দল সমাজে চাপিয়ে দিয়েছে, তারই পরিণতিতে আজ সংখ্যাগুরু মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন, এমনকী, অনেক সময় সমস্ত কিছু জেনে-বুঝেও মেরুদণ্ডহীন চাটুকারী মানসিকতা থেকে অথবা আখের গোছাবার লোভে শাসক ও শোষকদের শত অন্যায়কেও হাত কচলে সমর্থন জানায়। এই সমাজের সংস্কৃতির ফসল এমন বুদ্ধিজীবীই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা অন্যায়ের প্রতি বিপুল জনসমর্থন দেখলে প্রতিবাদ করতে ভয় পান। এমন অনেক সমাজ-প্রতিষ্ঠিত উন্নাসিক ব্যক্তি প্রতিবাদে মুখর না হওয়ার পিছনে যুক্তি খাড়া করেন—"এ দেশের আর কিছুই হবে না।" এমন কথাও সাধারণ থেকে অসাধারণ বহু মানুষের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে আমাদেরই উদ্দেশে— "আপনাদের আন্দোলন ভালো, স্বীকার করি। কিন্তু এই দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া, শোষণে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া সমাজের বিরুদ্ধে কতটুকু আপনারা করতে পারবেন? দুর্নীতি, ধর্মের শোষণ, রাষ্ট্রের শোষণ, জ্যোতিষী ও বাবাজি-মাতাজিদের রমরমা কি আপনারা কমাতে পেরেছেন?"

এমন নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে বসে থাকলে সমাজ যে আরও অবক্ষয়ের সংস্কৃতির পাঁকে ডুবতেই থাকবে, তা তো বক্তাদের বক্তব্যের সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইলে এক নতুন সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টির জরুরি কাজে প্রত্যেকেরই

কিছু করার আছে। আর এই গড়ার জন্যেই অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে ভাঙার প্রয়োজন। প্রতিটি অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন, আর সেই সূত্রেই প্রয়োজন, একান্তভাবেই প্রয়োজন মানবাধিকার রক্ষার জন্য সোচ্চার হওয়ার, লড়াইয়ে নামার।

পুরোনো প্রসঙ্গে একটু ফিরে তাকাই। পুলিশ হেফাজতে ১৩৬ জন অভিযুক্তকে হত্যা করা হল। আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন ধর্ষিত হল, মানবাধিকার একটা বিশাল তামাশায় পরিণত হল, তবু রাজ্য সরকার একজনকেও শাস্তি দিল না। যেখানে শাস্তি হয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে অত্যাচারিতের আপনজনেদের চেষ্টায় আইনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথে এই শাস্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবাংলায়, কেবলমাত্র পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ৪৩টি। ১৯৮৭-র জুলাইয়ে তারকেশ্বর থানার কনস্টেবল তারই সহকর্মী মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এদের কতজনের শাস্তি হয়েছে? শুধুমাত্র একজনের কথা জানি, '৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের কায়দা বিবিকে থানায় এনে শ্লীলতাহানির প্রমাণে থানায় বড়বাবুর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকিদের?

শিক্ষিকা অর্চনা গুহকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে এসেছিল। উদ্দেশ্য—অর্চনাকে জেরা করে তাঁর নকশাল ভাইয়ের খোঁজ জানা। আইনের রক্ষকরা জেরা করতে পারেন, কিন্তু কোনোভাবেই পারেন না জেরা করে কথা আদায় করার নামে, কোনও মানুষকেই মারধর করতে, ভয় দেখাতে, এমনকী, লোভনীয় কোনও টোপ দিতে। ভারতীয় সংবিধানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে এ-সবই বেআইনি। আইন ভাঙলে পুলিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতায় কী দেখলাম? বর্বরোচিত ও অশ্লীল অত্যাচারে অর্চনা পঙ্গু হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালাচ্ছেন ন্যায় বিচারের আশায়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আশায়। কলকাতা পুলিশের 'রেগুলেশন' অনুসারে এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই নির্দেশকে অবহেলা করে রাজ্য সরকার ক্রমান্বয়ে রুণু গুহনিয়োগীর পদোন্নতিই ঘটিয়ে গেছে। এ সবই কি মানবাধিকারকে সরকার কর্তৃক লঙ্ঘনেরই প্রমাণ নয়?

এই '৯২-এর শেষ অর্ধে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পাঞ্জাব পুলিশ কলকাতার একবালপুর অঞ্চল থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করলেন, 'সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিবারক আইন' (TADA) -এ। ওদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল পাঞ্জাবে। দুই নিরস্ত্র মানুষকে বিমান থেকে নামিয়ে পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করল। এই তো এই দেশের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। হত্যাকারী পুলিশদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, হবে না। রাষ্ট্রশক্তি স্বয়ং আজ সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানবাধিকার ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

লেখার এই অংশটা পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—শিখ উগ্রপন্থীরা যখন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, তখন? সে বিষয়ে কী মতামত দেবেন? না কি মুখ বুজে থাকবেন?

এ-জাতীয় প্রশ্ন ওঠে, বার-বারই ওঠে। প্রশ্নকর্তারা কখনও ব্যক্তি, কখনও বুদ্ধিজীবী,কখনও রাজনীতিক, কখনও পত্র-পত্রিকা, কখনও বা রাষ্ট্রশক্তি। হুজুরের দল ও তার কৃপাধন্যেরা বারবার এমন প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নিজেদের বেআইনি কাজের প্রতি জনমত তৈরি করতে চায়, জন-বিক্ষোভ এড়িয়ে মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। যারা সরকার ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী, তারা যখনই কোনও নিরীহ বা অ-নিরীহকে হত্যা করছে তখনই দেশের আইন ভঙ্গ করছে আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির স্পষ্ট বিধান আইনে দেওয়াই আছে। এবং সেই আইনমাফিক শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রশক্তির আছে। রাষ্ট্রশক্তি সেই আইন মাফিক না চলে আইনকে ভঙ্গ করে যা করছে তা অবশ্যই বে-আইনি, তা অবশ্যই রাষ্ট্র-সন্ত্রাস, তা অবধারিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন।

১৯৭০ থেকে ৭৬-এ কংগ্রেস সরকারের আমলে জেলখানায় ৪০০ বন্দি হত্যা হয়েছিল। কলকাতার কাশীপুর বরাহনগরের এক দিন-রাতের অভিযানে হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। স্থানীয় মানুষ দেখেছে, ঠেলায় চাপিয়ে গাদা করে কীভাবে গঙ্গায় ঢেলে দিতে চাপানো হচ্ছে মানুষের দেহগুলোকে। '৭৭-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের জমানা ('৭০-'৭৭)-র নায়কদের শাস্তি দেবেন। '৯২-এর শেষে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন—কতজন হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে? উত্তর পাওয়া যাবে না।

ক্ষমতার সিংহাসনের যে চারটি পায়া তারই একটি হল পুলিশ। অতএব বিরোধী পক্ষে থেকে আইনভঙ্গকারী পুলিশদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যতটা সোজা, ক্ষমতার সিংহাসনে বসে শাস্তি দেওয়া ততটাই কঠিন।

অতীত ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলালে দেখতে পাব, ব্রিটিশ সরকারের বিনা-বিচারে আটকের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস বই প্রকাশ করেছিল, 'পুলিশরাজ আন্ডার ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া'। ব্রিটিশ বিদায় নিতে ক্ষমতার সিংহাসনে বসে কংগ্রেস সেই 'পুলিশ-রাজ' -কেই বরণ করল।

মুলায়ম সিং যাদব সরকারের আমলে উত্তর প্রদেশ সরকার সরকারি সিমেন্ট কারখানা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইল। প্রতিবাদ জানাল শ্রমিকেরা। পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৫ জন শ্রমিককে হত্যা করল। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করল, "কাল আমরা শাসন ক্ষমতায় এলে যারা গুলি চালিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করেছে, তাদের শাস্তি দেবই।" তারপর উত্তর প্রদেশের ক্ষমতার সিংহাসনে বসল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিংহাসনের একটি পায়া পুলিশসরাজকে ঠিক-ঠাক রাখতে জনগণের সামনে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিকে ছুড়ে ফেলে দিল আঁস্তাকুড়ে।

১৯৯২-এর ২ জুন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীদিলীপকুমার বসু লকআপে হত্যা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রায় দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ লকআপে পিটিয়ে মারলে অথবা কেউ ধর্ষিতা হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাৎক্ষণিক নিহতের পরিবারকে অথবা ধর্ষিতাকে ১ লাখ টাকা এবং লকআপে গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য থাকবে। কিন্তু এই রায়ই বা কতটা কার্যকর হবে? ভবিষ্যতে কি রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সরকার-বিপন্নকারীর মৃত্যু কিনবে? কিনবে নারীর ইজ্জত? না কি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি ধর্ষণকারী আইনের রক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে?

আপনি, আপনারা স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে পারেন তখনই, রক্ষা করতে পারেন তখনই, যখন কী কী অধিকার আছে জানবেন।

অধিকারগুলো জানা থাকলে তবেই আপনি অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ করতে পারেন। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার বিষয়ে তাই নাগরিকদের সচেতনতার অতি প্রয়োজন রয়েছে। যদিও এইসব অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা রয়েছে রয়েছে স্ব-বিরোধিতা, তবু এই সব মৌলিক অধিকার নিয়ে ছোট্ট করে একটু আলোচনা সেরে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই আলোচনাই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ভেবেই আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার

সমতার অধিকার (Right of Equality)

ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রত্যেকেই আইনের চোখে সমান অথবা প্রত্যেককেই আইন সমানভাবে রক্ষা করবে — রাষ্ট্র এই অধিকারকে অস্বীকার করবে না। (সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা)।

(এখানেও কিন্তু স্ব-বিরোধিতা আছে। ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'শ্রেণিগত' আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ আইন চলবে না। কিন্তু এই ১৪ নম্বর ধারাতেই 'যুক্তিযুক্ত শ্রেণি বিভাগ' (Reasonable classification) নিষিদ্ধ করছে না।

স্বাধীনতার অধিকার (Right of Freedom)

সমস্ত নাগরিকদের (ক) মত প্রকাশের, (খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার, (গ) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করার, (ঘ) ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোনও স্থানে বসবাস করার এবং (ঙ) যে কোনও পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্য করার অধিকার রয়েছে। (সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারা।

১৯ নম্বর ধারায়ও স্বাধীনতার অধিকারগুলোর 'যুক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধতা'

(Reasonable Restrictions) রয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'যুক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধতা' আরোপ করা যাবে (ক) ভারতের সার্বভৌমত্ব, (খ) ভূখণ্ডের ঐক্য, (গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (ঘ) জনস্বার্থ, (ঙ) তফসিলি জাতির সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
(Protection of Life And Personal Liberty)

কোনও ব্যক্তির জীবনও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। কেবল মাত্র আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিক্রমেই এর ব্যতিক্রম হতে পারে। (সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা)।

আটকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আটক রাখা যায়
(Protection Against and Detention in Certain Cases)

(১) গ্রেপ্তার করার পর যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে। কারণ না জানিয়ে কাউকে আটকে রাখা যাবে না।

(২) আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীর সাহায্য পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ধৃত ব্যক্তির তার পছন্দমতো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার আছে।

(৩) গ্রেপ্তার হয়েছেন বা আটক আছেন এমন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। গ্রেপ্তারের পর, 'ছুটির দিন আদালত বন্ধ ছিল' এমন কোনও অজুহাত এনে এই ২৪ ঘণ্টাকে অতিক্রম করা যাবে না। এক্ষেত্রে নিকটবর্তী কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতেই আটক ব্যক্তিকে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে তাকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। (সংবিধানের ২২ নম্বর ধারা, এছাড়াও ফৌজদারি ৫৭ ও ৭৬ নম্বর ধারা অনুসারেও)।

(কিন্তু এই অধিকারও রাষ্ট্রপতি ঘোষিত জরুরি অবস্থার সংবিধানের ৩৫১ (১) ধারা বলে বাতিল হতে পারে। জরুরি অবস্থা না থাকলে এই ২২ নম্বর ধারা অগ্রাহ্য করা যাবে না।)

সংবিধানের এই সব মৌলিক অধিকার ছাড়াও আরও কিছু অধিকার আছে যেগুলি জানা থাকলে পুলিশের বেআইনি কাজ প্রতিরোধ করা যায় অথবা বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

পুলিশি হস্তক্ষেপ কোথায় অসাংবিধানিক

১। গ্রেপ্তার না করে পুলিশ কাউকে এক মিনিটের জন্যও আটক রাখতে পারে না। 'মুক্ত-ধৃত' বলে কিছুর অস্তিত্ব ভারতীয় আইনে নেই— ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বহু রায়ে এই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

১৪৯ ধারা অনুসারে কোনও গুরুতর অপরাধ থেকে বিরত করা বা বাধাদানের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও পুলিশকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, গ্রেপ্তার ব্যতিরেকে আটক রাখা যাবে না।

২। গ্রেপ্তারের আগে বা গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ জানাতে বাধ্য কোন্ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

৫০ নম্বর এবং ২২ (১) নম্বর ধারা অনুসারে সংবিধান নাগরিকদের এই অধিকার দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন সর্বোচ্চ আদালতের একাধিক রায় অনুসারে ধৃত ব্যক্তিকে অভিযোগ না জানানো বেআইনি।

৩। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার পছন্দমতো আইনজীবীকে উপস্থিত রাখার অধিকার ধৃতের রয়েছে। এই অধিকারের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় আছে।

৪। কোনও মামলাসংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোনও থানা কোনও ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে ডাকতে পারে না। ১৬০ নম্বর ধারার (ক) ও (খ) অনুসারে থানাকে ওই ব্যক্তির কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হবে এবং থানায় যাতায়াতের খরচও ওই ব্যক্তিকে দিতে হবে।

১৫ বছরের কম বয়সি পুরুষ বা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা চলবে না। তাদের বাসস্থানেই জেরা করতে হবে।

পুলিশ হাজতে অত্যাচার করতে পারে না

১। ফৌজদারির দণ্ডবিধির ১৬৩ নম্বর ধারা অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে হুমকি দেখিয়ে, মারধরের ভয় দেখিয়ে অথবা কোন লোভনীয় টোপ দেখিয়ে বা নির্যাতন করে পুলিশের কোনও ধরনের বিবৃতি আদায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৬১ নম্বর ধারা অনুসারে ধৃত ব্যক্তি মিথ্যা ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত পুলিশের জেরার জবাব নাও দিতে পারেন।

২। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ নম্বর ধারা অনুসারে প্রথম সুযোগেই ধৃত ব্যক্তি পুলিশের বিরুদ্ধে লকআপে বা অন্যত্র অত্যাচার চালাবার অভিযোগ এনে বিচারকের কাছে নিজের শরীর পরীক্ষার আবেদন জানাতে পারেন।

৩। ধৃত ব্যক্তিকে মারধর করার কোনও অধিকার পুলিশের নেই। ধৃত ব্যক্তির উপর অত্যাচার চালালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ নম্বর ধারা অনুসারে অত্যাচারের তারতম্য অনুসারে পুলিশের সাজা ৭ বছর থেকে ১০ বছর জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ হাজতে ধৃতের উপর একটি আঘাতের ন্যূনতম সাজাটিই হল ৭ বছরের জেল।

মহিলাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যা আইনত করতে পারে না

১। সি আর পি সি-র ৫১(২) ধারা অনুসারে ধৃত মহিলার দেহ তল্লাশি করার কোনও অধিকার কোনও পুরুষ পুলিশেরই নেই। শুধুমাত্র মহিলা পুলিশরাই মহিলার দেহ তল্লাশি করতে পারে। এই দেহ তল্লাশি কোনওভাবেই শোভনীয়তার মাত্রা ছাড়াতে পারবে না।

২। মহিলা বন্দিকে স্বতন্ত্রভাবে মহিলা লকআপে রাখতেই হবে।

৩। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার বলবৎ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোনও মহিলাকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত থানায় ডাকা চলবে না, গ্রেপ্তার করা যাবে না, এমন কী বাড়িতে মহিলা থাকলে সেই বাড়ি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত তল্লাশি করা চলবে না। প্রয়োজনে ওই সময় পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখে দিতে পারে।

পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন

১। ১৯৮৩ সালে সংযোজিত আইনে বলা হয়েছে, হেঁফাজতকালীন ধর্ষণে, অর্থাৎ ধর্ষণকারী যদি পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, সরকারি হাসপাতালের অথবা কিশোরীদের হাজতের আধিকারিক অথবা জেলখানার সিপাই হয়, তবে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে, সে ধর্ষণ করেনি।

২। হেফাজতকালীন ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও বারো বছরের কম মেয়েদের ধর্ষণের জন্য ন্যূনতম দশ বছর কারাদণ্ডের বিধান আইনে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্যই জেনে রাখুন

১। ফৌজদারি আইনের ১৬১ নম্বর ধারা অনুসারে পুলিশের কাছে আপনি কোনও বিবৃতি দিলে সেই বিবৃতিতে আপনার কোনও স্বাক্ষর অর্থাৎ সই দেওয়া বা আঙুলের টিপছাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২। এই ধরনের বিবৃতি মামলার কোনও ক্ষেত্রেই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না।

৩। বিচারকের কাছে আপনার স্বাক্ষর যুক্ত বিবৃতিই কেবল মামলায় ব্যবহার করা যায়।

৪। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিনামূল্যে মামলা সংক্রান্ত পুলিশ রিপোর্ট, এফ.আই.আর, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি ও সাক্ষ্যদান প্রভৃতির নকল ২০৭ ধারা মতো বিচারক দিতে বাধ্য।

৫। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৭ ও ৩৯ ধারা অনুসারে পুলিশ আপনার বাড়ির যে সব জিনিস বাজেয়াপ্ত করবে তার তালিকার নকল আপনাকে দিতে বাধ্য।

৬। আপনার বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালাবার সময় আপনাকে উপস্থিত থাকতে দিতে বাধ্য। এ ছাড়াও অন্য সাক্ষ্য রেখেই পুলিশি তল্লাশি চালাতে হবে। ১৮৭ নম্বর ধারা অনুসারে এর অন্যথা করলে পুলিশ দণ্ডনীয় অপরাধ করবে।

৭। ফৌজদারি আইনের ১৫৪ নম্বর ধারা অনুসারে পুলিশ যে কোনও অভিযোগকারীর অভিযোগের ডায়েরি নিতে বাধ্য।

৮। ১৯৮০, ১৯৮৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ও মে মাসে যথাক্রমে বোম্বাই হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের এবং মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের রায় অনুসারে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হাতকড়া লাগাতে পারে না এবং কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে অথবা থানায় নিয়ে যেতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আদালতে প্রমাণিত হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী, ততক্ষণ সে আইনের চোখে অবশ্যই নিরপরাধ।

৯। যদি আপনাকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে অথবা যদি আপনাকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে অথবা বিচারকের কাছে হাজির করা না হয়, তবে আপনার পক্ষ থেকে কেউ হাই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে 'হেবিয়াস করপাস' আবেদন করতে পারেন। এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আপনি হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে পারেন।

মানবিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে কিছু দাবি

১। ১৯৮০ সালে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশে (প্রথম অধ্যায়) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, লকআপে অত্যাচার বা হত্যার ঘটনা ঘটলে, পুলিশের

গুলিতে দুই বা অধিক ব্যক্তির মৃত্যু হলে, অথবা 'সাজানো সংঘর্ষে' হত্যার ঘটনা ঘটলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা উচিত, পুলিশকে দিয়ে তদন্ত নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ কার্যকর করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিয়ে জনমত তৈরি করা উচিত।

২। পুলিশ হাজতে অত্যাচার বা হত্যার ঘটনা ঘটলে বড়বাবুকে অর্থাৎ ইনচজার্জকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে এবং তাদেরই প্রমাণ করতে হবে উপর ধৃতের অত্যাচার করা হয়নি।

বিখ্যাত শীলা বারসে বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় (১৯৮৩) সুপ্রিম কোর্ট এই একই সুপারিশ করেছেন। আইন কমিশনও এই সুপারিশ করেছেন। ১৯৮৫ সালে রামসাগর যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ওই একই মন্তব্য করেছেন। অতএব সারা দেশে এই আইন চালু করা হোক।

৩। কাউকে হঠাৎ যে কোনও জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর ধৃত ব্যক্তির আপনজনেরা থানায়, পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরেও ধৃত ব্যক্তির কোনও হদিশ পায়নি, এমন ঘটনা কম ঘটেনি। বিভিন্ন পুলিশ দপ্তর গ্রেপ্তারের কথা অস্বীকার করায় বহু জলজ্যান্ত-মানুষ হঠাৎ পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন। এমন ঘটনাগুলোর কথা মনে রেখে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীদিলীপকুমার বসু ২ জুন ১৯৯২ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে বলেন— অবিলম্বে প্রত্যেককে গ্রেপ্তারের মুহূর্তে ধৃত ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কারণ সম্বলিত তথ্য, গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসারের নাম ঠিকানা-সহ একটি 'কাস্টডি মেমো' ধৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে দিতেই হবে। রাস্তায় গ্রেপ্তার করলে এবং কোনও ভাবে ধৃতের নিকট আত্মীয়, সাধারণ আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে পুলিশের পক্ষে দ্রুত যোগাযোগ অসম্ভব হলে যেখানে গ্রেপ্তার করা হল, সেই অঞ্চলের কোনও দোকানদারকে অন্তত 'কাস্টডি মেমো' দিয়ে ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে ওই মেমো পৌঁছে দেবার অনুরোধ করতে হবে।

হাই কোর্টের এই রায়কে মর্যাদা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। এই রায় অমান্য করা বেআইনি। সম্মিলিত দাবি তুলতে হবে, সরকারকে এই আইন মেনে চলতেই হবে।

রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা, সরকার দ্বারা ধৃতকে নির্যাতন মানবাধিকারের একটি মৌলিক লঙ্ঘন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একে 'মানুষের মর্যাদার বিরুদ্ধে

এক জঘন্য অপরাধ' হিসেবে তীব্র নিন্দা করেছে। এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে ধৃতকে নির্যাতন নিষিদ্ধ হয়েছে।

তবু পৃথিবী জুড়ে শাসক ও শোষকরা তাদের গদি মজবুত রাখতে, নিপীড়িত মানুষের অধিকারকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করেই চলেছে। আজ বহু দেশের তথাকথিত-গণতন্ত্র আমাদের দেশের মতোই এক বিরাট প্রহসন মাত্র। এ-দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি যে 'ছাপ্পা-ভোট', 'বুথ-জ্যাম' পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক আকারে শুরু করেছিলেন, সেই কালচার এখন এতই ব্যাপকতা পেয়েছে যে ভোট ব্যবস্থাই একটা প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের অধিকারকে ব্যাপকভাবে যারা খর্ব করে চলেছে তারাই সরকার অথবা এই ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার গঠনে পরম উৎসাহী ক্যারিয়ারিস্ট রাজনীতিক।

২৯ নভেম্বর ১৯৯২ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো আর এক ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী রাজনীতির কালচার আমদানি করল আমাদের দেশে। দলের শক্তি প্রদর্শনের খেয়ালে মাতোয়ারা হয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় যেভাবে বহু খেটে খাওয়া মানুষকে হুমকি দেখিয়ে ব্রিগেডের জনসভায় যেতে বাধ্য করল, যেভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি বাসগুলোকে পার্টি মিটিং-এ হাজির করল, যেভাবে দশ হাজার বাস-মিনিবাস-লরির মালিকদের বাধ্য করল বাস-মিনিবাস লরি দিতে, তাতে কলকাতার আশে-পাশে অলিখিত একটা বন্‌ধ দুপুর থেকেই চেপে বসল।

এই যে কালচার শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট নেতারা, এর পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠতেই পারে। আগামী দিনে শাসক দল হিসেবে কংগ্রেস বা অন্য কেউ এলেও তারাও যে একইভাবে ফ্যাসিস্ট পেশি শক্তি এবং সরকারি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার ঘটিয়ে মানুষের অধিকারকে লুণ্ঠন করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনসমাবেশ ঘটানোর খেলায় মাতবে না, তার গ্যারান্টি কি দিতে পারবে বামফ্রন্ট সরকার বা বামফ্রন্ট দল? এই জনসমাবেশ ঘটানোর কালচার যে সরকারের গদিতে বসা অন্যান্য রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও জনপ্রিয়তা পাবে না—এই গ্যারান্টি কি দিতে পারবে বামফ্রন্ট? মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন ভাঙতে শাসক দল যে আন্দোলন বিরোধী আন্দোলন গড়তে, আন্দোলন বিরোধী সমাবেশ গড়তে হিংস্র পেশিশক্তির সাহায্য নেবে না, মানুষের অধিকার খর্ব করবে না,—এই গ্যারান্টি কি বামফ্রন্ট দিতে পারবে?

না পারা সম্ভব নয়। যে বিষবৃক্ষের বীজ বামফ্রন্ট রোপণ করল, তা এখুনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তুলে ফেলতে না পারলে ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল আপনাকে, আমাকে সকলকেই ভোগ করতে হবে— এমনকী, বামফ্রন্টকেও। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে এখনই বাড়তি উদ্যম নেওয়া উচিত প্রতিটি মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলোর।

ভারতে মানবাধিকার ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কি না দেখতে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছে কমিশন গড়তে। কমিশন গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে অনেক রাজ্য সরকার। অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা বটে! মানুষের অধিকার যারা খর্ব করছে, কেড়ে নিচ্ছে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, তারাই যখন কমিশন গড়ে, তখন অবাক হতেই হয়। এমন ক্ষেত্রে এই অনুমানই প্রত্যয় পায়—আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র মানুষের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে, এমন জ্বলন্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে প্রমাণ করতেই শাসকদল কমিশন গড়তে কোমর বেঁধে নেমেছে। ভারতে মানবাধিকার রাষ্ট্র শক্তির কাছেই বার বার খর্বিত—এমন কথাগুলো বিভিন্ন দেশের প্রচার মাধ্যম মারফত বার-বার ঘুরে-ফিরে নানাভাবে উঠে আসছে। পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারত-শাসকদের বীভৎস চেহারাটা মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়তেই আবার আড়াল তৈরি করতে কমিশন গড়ার এই পরিকল্পনা।

ভারতীয়রা যে সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধান অনুসারে ভোগ করার অধিকারী, তার উপর আজ এসে পড়েছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর নগ্ন আক্রমণ। সুন্দর সংস্কৃতি গড়ার প্রয়োজনে মানুষের অধিকার রক্ষা ও অধিকারের সম্প্রসারণ একান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অনুসারে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা লাভের অধিকার। আর সেই হেতুই প্রতিটি মানুষের রয়েছে দৈহিক নির্যাতন থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার। কোনও ব্যক্তিকে রাজনীতিগত, আইনগত, বা আন্তর্জাতিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে আলাদাভাবে না দেখে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিককে সমানভাবে দেখার অধিকার; আইনের চোখে সমানাধিকার; স্বাধীন জীবিকা নির্বাচনের অধিকার; ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার; রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার অধিকার; সংগঠন গঠনের অধিকার; বিনা বিচারে বন্দি না হওয়ার অধিকার; পক্ষপাতহীন বিচার পাওয়ার অধিকার; স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকার; স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার;

সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার; শিক্ষা লাভের অধিকার; সরকারি কাজ পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি অধিকার। জাতিসংঘের ঘোষিত মানুষের অধিকারগুলোর প্রতি আমাদের সমিতির আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা মনে করি দেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য-বস্ত্র-গৃহ লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দান একান্তই প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত মৌল ও অপরিহার্য মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব জনগণেরই। জনসচেতনতা গড়ে উঠলে, জনগণ তাঁদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হলে তবেই অধিকার কোথায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তা বুঝতে আম-জনতা সক্ষম হবেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন। জনসচেতনতাই শাসকদের কাছ থেকে নতুন নতুন অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে, সংগ্রামে নামবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নামবে। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব ও মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনে শামিল প্রতিষ্ঠান যদি মানবাধিকার বিষয়ে জনচেতনা গড়তে সচেষ্ট হন, মানবাধিকার রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, তবে নিশ্চিতভাবে অবক্ষয়ী লাঞ্ছিত মানবাধিকারের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুসংস্কৃতির বিজয় ঘোষিত হবেই।

আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ভিতর কতকগুলি অশুভ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। এই পরস্পর সম্পর্কিত উপাদানগুলোই মানুষের অধিকার খর্ব করার ক্ষেত্রে সক্রিয়। কিন্তু এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেও আমরা লড়াই শুরু করতে পারি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেই, মানুষের চেতনার ক্ষেত্র থেকেই। বর্তমানে মানুষের চেতনা ক্ষেত্রের বা সাংংস্কৃতিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব যে কী বিশাল, তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর ছড়ি ঘোরানো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় কী ভাবে নাক গলাবে? কী ভাবে ও সব দেশের মানুষের মগজ ধোলাই করে প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলোকে ঢোকাবে? সাহায্য নিল তাবড় মনোবিজ্ঞানীদের। চিনের জনগণের মাথায় অন্য চিন্তা ঢোকাতে হবে— তলব করল মনোবিজ্ঞানীদেরই। গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলায় দেখা গেল মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিতে। তারই ফল স্বরূপ সি. আই. এ-র ম্যানুয়াল হিসাবে আবির্ভূত হতে দেখলাম 'সাইকোলজিক্যাল অপারেশনস ইন গেরিলা ওয়ারফেয়ার'কে, যা আজ অনেক দেশেরই গেরিলা যোদ্ধাদের সংগ্রাম

পরিচালনার আকরগ্রন্থ। চেতনার ক্ষেত্রের ওলট-পালট যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ওলট-পালট ঘটিয়েই থাকে, সমাজের চলমান গতির উপর নজর রাখলে, ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্যা, মানবাধিকার রক্ষার সমস্যা আদৌ কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। যে দেশে শোষণ থাকবে সে দেশে শোষণ বজায় রাখতেই মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবেই।

তবু আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেই, মানুষের চেতনায় সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই। আর তাই আসুন প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষ ও সংগঠন ভারতের সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন আক্রমণের পটভূমিতে জনসাধারণের অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দ্বিধাহীন ভাবে সচেষ্ট হই, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি, সোচ্চার হই।

আপনি বা আপনার জানাশোনা কেউ কি—

১। বিনা বিচারে জেল খাটছেন?

২। পুলিশ বা মিলিটারি দ্বারা অত্যাচারিত?

৩। পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর হুমকির মুখে দিন কাটাচ্ছেন?

৪। পুলিশ হেফাজতে ধৃতকে হত্যা করা হয়েছে?

৫। পুলিশ হেফাজতে ধর্ষিতা হয়েছেন?

ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে নীচের ঠিকানাগুলোয় যোগাযোগ করতে পারেন—

১। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪

২। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির যে কোনও শাখা।

৩। A.P.D.R গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ) ১৮, মদন বড়াল লেন, বউবাজার, কলকাতা-৭০০ ০১২

৪। লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অ্যান্ড কাউন্সেলিং সেন্টার ৫, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

৫। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

৬। পিপল্‌স ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ (P.U.C.L.) ২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

৭। উইমেনস সেল ক্যালকাটা পুলিশ লালবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০১

৮। লিগ্যাল এইড কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিটি সিভিল কোর্ট, দ্বিতল, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১

৯। এ ছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন সরকারি স্তরে পুলিশ সুপার অথবা জেলাশাসক, স্থানীয় মহিলা সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে।

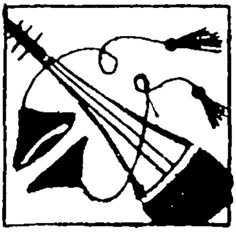

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি : গোলেমালে পীরিত কইর্‌য়ো না

'জাতীয়তাবাদ' ও 'জাতীয়-সংহতি' শব্দ দু'টির ব্যাপক ও বহুল অপব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ এতটাই প্রভাবিত যে শব্দ দু'টিই আজ শোষক ও শাসকশ্রেণির শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কখনও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা ঢাকা, কখনও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের অনিবার্য ফল হিসেবে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভে একগাদা ঠান্ডা জল ঢালতে হঠাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জুজু দেখানো হতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের সীমান্তে তৎপর হয়ে উঠেছে, আমাদের দেশে নানা নাশকতামূলক কাজ করে বেড়াচ্ছে ওদের দেশের গেরিলা সেনারা। আর দুই প্রতিবেশী দেশের শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর একই সমস্যা হলে তো কথাই নেই, দুই সরকার গোপন সমঝোতায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বেতারে-দূরদর্শনে দেশপ্রেমের গানের বন্যা বইয়ে দিয়ে এমন গণউন্মাদনার সৃষ্টি করে যে, ভিখারিও একদিন উপোস করে থেকে তার একদিনের ভিক্ষে করে পাওয়া অর্থ যুদ্ধখাতে তুলে দেয়, সদ্য বিবাহিত গা থেকে খুলে দেয় গহনা। দরিদ্র মানুষগুলো আরও

বেশি দারিদ্রে পাঁকে ডুবতে ডুবতে স্বপ্ন দেখে তাদের দেশের সেনারা অন্য দেশের লোকেদের কীভাবে গুলিগোলায় ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। গরিব মানুষগুলো দেশের স্বার্থে ভুলে যায় ব্যক্তিগত পাওয়া না পাওয়ার ক্ষোভ বঞ্চনার তীব্র জ্বালা।

গরিব দেশগুলো যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে, সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তখন লাভ হয় কাদের? ক্ষতিই বা কাদের? লাভ বিদেশি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের, লাভ দেশি অস্ত্র-দালালদের, লাভ শাসক ও শোষকদের, বহু সংকটময় মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় বলে। লোকসান পুরোটাই সাধারণ মানুষের। অনেক আন্দোলন, অনেক অবরোধ, অনেক ক্ষোভ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় যদি আন্দোলন চালাতে যান, শাসককুল আপনার সামনে পিছনে 'পঞ্চম বাহিনী'র অর্থাৎ শত্রুদেশের গুপ্তচর বলে ছাপ মেরে দেবে। আর জাতীয়তাবাদের গণ-উন্মাদনার জোয়ারে শোষিত মানুষই সেই কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেবে, বিরোধিতা করবে আপনাদের আন্দোলনের।

'জাতীয়তাবাদ' শব্দটার বাস্তবিকই অর্থ কী? আসলে 'জাতীয়তাবাদ' শব্দের কোনও অর্থই হয় না, অর্থ হতেই পারে না। 'জাতি' কথার অভিধানগত অর্থ সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ। যেমন মানবজাতি, উদ্ভিদজাতি, পশুজাতি, নারীজাতি, পুরুষজাতি। আবার ধর্মের অন্তর্গত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খ্রিস্টানজাতি। আবার সামাজিক বিভাগজাত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, চণ্ডাল। এমনিভাবে জাতি-বিভাগ নিয়ে আলোচনা প্রায় অসীম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

'জাতীয়' কথার অর্থ জাতি সম্বন্ধীয়। 'বোধ' কথার অর্থ উপলব্ধি, অনুভব।

তাহলে আমরা 'জাতীয়তাবোধ' কথাটির অর্থ হিসেবে পেলাম 'জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি।' কিন্তু কোন জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি? যে কোনও জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিই হতে পারে।

শাসকশ্রেণি বা রাজনীতিকরা অথবা তাদের স্নেহধন্য কলমচীরা 'জাতীয়তাবাদী' বলতে ভারতের প্রতি ভালোবাসা বলে ব্যাখ্যা চাপাতে চেয়েছেন। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' ও 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটিকে ব্যবহার করে হিন্দুজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে চাইছে, হিন্দুজাতীয়তাবোধের গণউন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই বিষয়ে ওরা যে বিশাল সাফল্য পেয়েছে, সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির

সাফল্য তারই প্রমাণ। 'আমরা বাঙালি' আবার 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটিকে প্রয়োগ করে বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে বাঙালিত্ব জাগাবার চেষ্টা করছে।

শাসকশ্রেণি জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণা সাধারণের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে ধনীজাতীয় মানুষ ও গরিবজাতীয় মানুষদের সহাবস্থানের কথা বোঝায়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে দেশের জন্য, জাতির জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার পক্ষে হাওয়া তোলে।

এমন ব্যাপক প্রচারে নিপীড়িত দরিদ্র মানুষগুলো তাদের শোষকদের চিনতে ভুলে যায়, তাদের শত্রু চিনতে ভুলে যায়। ভুলে যায় তাদের কারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করছে, গিলে খাওয়ার চেষ্টা করছে।

'জাতীয়তাবোধ' বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিকে আমরা বুঝি এবং 'জাতীয়তাবাদ' বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয় মতবাদকে বুঝি তাহলেও সেই একই সমস্যা থেকেই যায়। এই জাতীয় কোনও মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণ মানবজাতির মঙ্গল অসম্ভব। মানবজাতির মধ্যেকার শোষকশ্রেণির মঙ্গল মানেই শোষিত শ্রেণির অমঙ্গল। আর শোষিত শ্রেণির মঙ্গল মানেই শোষকশ্রেণির অমঙ্গল। দুই শ্রেণির মঙ্গল যেহেতু একই সঙ্গে সম্ভব নয়, তাই দুই শ্রেণির সহাবস্থানে মানবজাতির মঙ্গলচিন্তাও অতি অবাস্তব। শোষিত শ্রেণির মাথার থেকে শোষিত শ্রেণির চেতনা দূর করতেই এই ধরনের জগাখিচুড়ি মতবাদ গেলানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি।

'সংহতি' শব্দের অর্থ 'নিবিড় সংযোগ'—'চলন্তিকা'য় এমনটাই লেখা আছে। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বাংলা ভাষার অভিধান'-এ 'সংহতি'র অর্থ হিসেবে আছে 'ঘন সন্নিবেশ, নিবিড়তা'। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'বঙ্গীয়, শব্দকোষ' -এ 'সংহতি' বলতে বলা হয়েছে, 'ঐকমত্য, একচিত্ততা, নিবিড়ভাব, একসঙ্গে'।

একদিকে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব জম্মু-কাশ্মীর জ্বলছে, জ্বলছে দক্ষিণ-ভারতের অন্ধ্র, পূর্ব-ভারতের গোর্খাল্যান্ড, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর তখন রাষ্ট্রশক্তি 'জাতীয় সংহতি'র লেবেল মেরে আর এক রকমের উত্তেজক মাদক ছাড়ল বাজারে গণ-হিস্টিরিয়া

গড়ে তুলতে। 'ব্রান্ড'টিকে জনপ্রিয় করতে দূরদর্শন দারুণ দারুণ কয়েকটা অ্যাড-ফিল্ম তৈরি করল চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের স্টার-সুপারস্টার-মেগাস্টারদের নিয়ে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোও শুরু করল জাতীয় সংহতির বন্দনা। 'জাতীয় সংহতি উৎসব', 'জাতীয় সংহতি পুরস্কার', 'জাতীয় সংহতি দৌড়', এমনি নানা ধরনের জাতীয় সংহতির উপর নানা কার্যক্রম লাগাতারভাবে গ্রহণ করেই চলেছে ডান-বাম নির্বিশেষে নানা রাজনৈতিক দল। এই প্রচারগুলোর মধ্য দিয়ে তারা বারবার মানুষের মাথায় ঢোকাতে লাগল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, অসমিয়া, নাগা, তামিল, মারাঠি ইত্যাদি নানা শ্রেণির জাতির মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রাখার কথা, ক্ষুব্ধতা না রেখে 'মিলে-জুলে' থাকার কথা। এই প্রচারের মাধ্যমে সাধারণের মাথায় ধর্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, প্রদেশ-ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের কথাই বলা হল। প্রেম-প্রীতি বজায় রেখে এই বিন্যাসকৃত শ্রেণি সহাবস্থানের কথা বলার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানুষদের ভুলিয়ে রাখা হল আসল সত্যকে—পৃথিবীতে রয়েছে মাত্র দু'টি শ্রেণি। শোষক এবং শোষিত। এই শ্রেণি বিন্যাসের বাইরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, রাজস্থানি, তামিল, নাগা, সাঁওতাল, মণিপুরি—এসবই শেষ পর্যন্ত সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলোর শোষকদের সঙ্গে সংহতি অর্থাৎ শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রেখে চলার একটিই অর্থ—শোষক ও শোষিত—এই খাদক ও খাদ্য সম্পর্কের দুই শ্রেণি বিন্যাসকেই বজায় রাখা।

গোটা পৃথিবী জুড়ে মানব-সংহতি, মানব সৌহার্দ্য, মানব-ভ্রাতৃত্বের জন্যে একটি লড়াই অবশ্য প্রয়োজনীয়—শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। একটি শ্রেণির উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই আসতে পারে বাস্তব সংহতি—তার আগে কখনওই নয়।

শোষক ও শোষিতের কোনও জাত হয় না, ধর্ম হয় না, ভাষা হয় না, দেশ হয় না, প্রদেশ হয় না। যে কোনও ধর্মের যে কোনও জাত-পাতের, যে কোনও ভাষাভাষী, যে কোনও দেশের শোষকদের একটিই পরিচয় হওয়া উচিত— শোষক। যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাত-পাতের, যে কোনও ভাষাভাষী, যে কোনও দেশের শোষিতদের একটিই পরিচয় হওয়া

উচিত—শোষিত। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংহতির একটাই অর্থ—শোষণ ব্যবস্থার অবস্থান। এমন 'সংহতি' কখনওই সমাজ-সচেতন, মানবিকতার বিকাশকামী, সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারকামীর কাছে কাম্য হতে পারে না।

বিচ্ছিন্নতা : যন্ত্রণার দাউদাউ আগুনে আপসের জল ঢালো নতুবা পুড়তেই থাকবে বিচ্ছিন্নতার আত্মনিগ্রহে

'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দটির সঙ্গে এখন আমরা বড় বেশি রকম ভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছি ব্যাপক ও লাগাতার প্রচারের দৌলতে। আমরা অনেকেই এই প্রচারের আবর্তে প্রভাবিত হয়ে ভাবতে শুরু করেছি 'বিচ্ছিন্নতা' এক ধরনের নৈরাশ্যতাড়িত অভিব্যক্তি। বিচ্ছিন্নতার এই নেতিবাচক আবেদন আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করায় আমরা 'বিচ্ছিন্নতা'র এই নেতিবাচক আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে অচেতন বা সচেতনভাবে কিছুটা বিরক্ত বা বিরূপ হয়ে উঠি। সরকার যে 'জনগোষ্ঠী' বা আন্দোলনকারীদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে ঘোষণা করে, তাদের সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করি। আমরা ভাবতে থাকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের দেশ-মাতৃকার অঙ্গহানি ঘটাতে চাইছে। এ-ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরও বেশি বেশি হতে থাকলে আমাদের দেশের তো অস্তিত্বই থাকবে না। 'দেশকে আমরা টুকরো হতে দেব না'—এই মানসিকতাই তখন আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

'বিচ্ছিন্নতা' কী? সকলের থেকে স্বতন্ত্র, সকলের থেকে আলাদা, সকলের সঙ্গে না মানিয়ে নিতে পারা।

কোনও অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ 'বিচ্ছিন্ন' হতে বাধ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যারাসেলসাস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগর-এর মতো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আগমনের কথা লেখা আছে, যাঁরা প্রত্যেকেই

সমাজে ছিলেন একাকী। এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথাগত চিন্তার স্থবিরত্বকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়কার সমাজের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন মানুষদের সঠিক মূল্যায়ন ক্ষমতা ছিল না সেইসময়কার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীর। আজ সেইসব বিচ্ছিন্ন মানুষরাই এ-যুগের মানুষদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন।

যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সেই বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মনুষ্যত্বের কাম্য, সভ্যতার কাম্য।

যে সমাজ আগাপাছতলা ডুবে আছে দুর্নীতির পঙ্কিলতায়, যে সমাজে শাসন ক্ষমতায় বসতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হয় ধনকুবেরদের দোরে দোরে, যে সমাজে বৈষম্য ও শোষণ লাগাম ছাড়া, সেই সমাজ থেকে কোনও জনগোষ্ঠী যদি বেরিয়ে যেতে চায়, তবে তাদের সেই উচ্চশির স্পর্ধিত সংগ্রামকে অভিনন্দন জানানোই প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের একমাত্র অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই 'উচিত'টাই ঘটছে না শাসকশ্রেণির সুনিপুণ মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে।

শক্তিমান বহু সাহিত্যিকের কলমে এমন বহু চরিত্র উঠে এসেছে যারা 'স্যাডিস্ট', ধর্ষকামী, বিকারগ্রস্ত, নৈরাশ্যতাড়িত, অসুস্থ, বিচ্ছিন্নতার শিকার এক মানসিক রোগী। এদের কেউ কেউ যৌন উচ্ছৃঙ্খলার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। আর এইসব সাহিত্যিকদের সৃষ্ট ওইসব চরিত্রগুলো দু-মলাটের বাইরে দূরদর্শনের ও সিনেমার পর্দায় হাজির হয়ে আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে আমরা একটা ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছি 'বিচ্ছিন্নতা' একটা সামাজিক ব্যাধি। আমরা ভুলে থেকেছি ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী তরুণদের স্বাভাবিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামও 'বিচ্ছিন্নতা'।

কোনও জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ যখন তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে অথবা শোষণমুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই জনজাগরণকে সামাল দেওয়ার সাধ্য রাষ্ট্রশক্তির থাকে না।

যে আন্দোলনে শরিক হয়েছে একটি জনগোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি পরিবার, সেই আন্দোলনকে শেষ করতে হলে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিটি পরিবারকেই

শেষ করতে হয়। যা সীমিত সেনা ও পুলিশের সাহায্যে সম্ভব নয়।

ওই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে ধ্বংসের আগুনে প্রতিবাদী প্রতিটি পরিবারকে শেষ করে দিয়ে শ্মশানের স্তব্ধতা আনাও এ-যুগে সম্ভব নয়। আধুনিকতম যোগাযোগের কল্যাণে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। এইভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে গেলে পৃথিবীর বহু প্রান্ত থেকেই এমন নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই। আর তাই পৃথিবীর বহু দেশেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাগরণের কাছে পিছু হটতে হয়েছে শাসক ও শোষকশ্রেণিকে।

এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে বহু দৃষ্টান্ত। আমাদের খুব কাছের দেশ শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি সংগ্রামী তামিল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পুলিশ, সেনা এমন কী, প্রতিবেশী দেশ ভারতের সেনা নামিয়ে সমস্ত রকম ভাবে দমননীতি চালিয়েও দমন করতে পারেনি তামিল জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে।

আমাদের দেশেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। হাতের কাছেই দু'টি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব ও কাশ্মীর, সেখানে জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন থাকায় আন্দোলন ধ্বংস করতে গিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সরকার এমন নিদারুণভাবে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, ওসব জায়গায় আন্দোলন ধ্বংস করতে হলে প্রায় সমগ্র জনসমষ্টিকেই ধ্বংস করতে হয়, যা অসম্ভব। অসম, অন্ধ্রে একই ভাবে যত বেশি বেশি করে স্থানীয় মানুষরা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন ততই এই আন্দোলন ধ্বংস করা সরকারের পক্ষে অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে উঠছে।

শ্রীলঙ্কা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম বা অন্ধ্রের আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করা এই উদাহরণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য— আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত টেনে এনে বোঝার ব্যাপারটা সহজতর করা। সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে রাখাটাও প্রয়োজনীয়, বিচ্ছিন্নতার সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়াসে। যখন কোনও জনগোষ্ঠীর যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হবে আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের চেতনা, তখন রাষ্ট্রশক্তি ওই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে খেপিয়ে তুলতে জনগোষ্ঠীর বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর লেবেল লাগাবে। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দটা 'নাস্তিক' শব্দের মতোই এমনই এক নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ বা নেতিবাচক আবেদনে ভরা দীর্ঘ প্রচারের দৌলতে। ভাবুন তো, একটা শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে জনগোষ্ঠী শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চাইবে, নিজেদের শাসন কায়েম করতে চাইবে, তারা তো দেশের মূল জনগোষ্ঠী

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেই বাধ্য। যে সমাজে শোষক ও শোষিতদের সহাবস্থান বিরাজ করছে, সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তবেই কোনও জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারে শোষণমুক্ত সমাজ। একটি শোষণমুক্ত জনগোষ্ঠী বহুকে প্রভাবিত করতে পারবে এই পরম সত্যটি মাথায় রেখেই জনগোষ্ঠীকে তাঁবেতে রাখতে সচেষ্ট বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ রাষ্ট্রশক্তি এমনভাবে প্রচার চালাতে থাকে যে সাধারণ মানুষ দেশ বলতে, দেশের বৃহত্তম নিপীড়িত জনসাধারণ, এই সত্যটি ভুলে গিয়ে দেশকে একটা ভূখণ্ড একটা ম্যাপ ভেবে ফেলে। ফলে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া রক্তাক্ত শোষিত মানুষগুলোর সংগ্রামকে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে, নীতিগতভাবে সমর্থন জানাবার পরিবর্তে, আমরা শোষিত মানুষরাও ভুল করে অঙ্গহানির ব্যথা অনুভব করি। শোষক শ্রেণির খপ্পর থেকে কিছু মানুষ যে অন্তত মুক্তি পেয়েছে ম্যাপের ওই বিচ্ছিন্ন অংশটা কিছু কিছু মুক্তিকামী মানুষদের জয়েরই প্রতীক, যা আরও অনেক নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, এ-কথা ভুলিয়ে রাখতেই রাষ্ট্রশক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে জুড়ে দিতে সচেষ্ট একটা নেতিবাচক আবেদন।

বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে আদর্শ ও পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েই গড়ে ওঠে বিপ্লবী চেতনা। পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই যুক্তির কাজ, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাজ।

যুক্তিবাদী আন্দোলন, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন আপাত নিরীহ এক আন্দোলন, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অসাধারণ শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থানের বীজ, ঠাসা রয়েছে শোষণমুক্তির বিস্ফোরক বারুদ।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম : হানিমুনে বাঘ ডাকে

যুক্তিবাদ-বিরোধিতার প্রকৃত উৎস কোথায়—এই বিষয়ে আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। যুক্তিবাদ আন্দোলনের

পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনতে হলে কে প্রধান শত্রু, কোন্ কোন্ শক্তি তার সহায়ক, কী তার শক্তিশালীতম অস্ত্র এসব বিষয়ে পরিষ্কার, স্পষ্টভাবে জানতে হবে।

যুক্তিবাদ বিরোধিতার প্রধান উৎস অবশ্যই শোষকশ্রেণি। তার সহায়ক শক্তি বহু। শোষক শ্রেণি কৃপাধন্য হওয়ার মতো মানুষের অভাব নেই এই সমাজে। তবে কৃপা পাওয়ার জন্য কিছু ক্ষমতা চাই বই কী, তা সে বুদ্ধিবলই হোক, কী বাহুবলই হোক। প্রধান সহায়ক শক্তি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা, সরকার—যারা শোষকদের অর্থে নির্বাচন জিতে এসে গদিতে বসে মুখে গরিব-দরদী এবং কাজে ধনিক-তোষণের ভূমিকা গ্রহণ করে। শত্রু শিবিরে অমোঘ অস্ত্রটির নাম ধর্ম, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা সাংগঠনিক রূপ। 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' হল এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ভিত্তিমূল। এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা তথাকথিত ধর্ম অবশ্যই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির প্রতিবন্ধক, জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অন্তরায়, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা এবং তাই শোষকশ্রেণির শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার।

(ঈশ্বর, পরমপিতা, পরমব্রহ্ম বা ওই জাতীয় চিন্তার ধারক-বাহক তথাকথিত ধর্ম যে আক্ষরিক অর্থেই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির অন্তরায়, জ্ঞান ও মুক্ত চিন্তার প্রবন্ধক, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা—এ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা ও তথ্যপ্রমাণ হাজির করা প্রয়োজন, তা সবই নিয়ে হাজির হওয়ার ইচ্ছে রইল 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে)।

'ধর্ম' ক্যানসারের চেয়েও মারাত্মক, পারমাণবিক বোমার চেয়েও ধ্বংসকারী। শোষকশ্রেণির শ্রেষ্ঠতম এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করতে না পারলে চেতনা-মুক্তির যুদ্ধ জয় অধরাই থেকে যাবে—এই পরম সত্য প্রতিটি চেতনা-মুক্তির আন্দোলনকারীকে বুঝতেই হবে।

মানব সমাজের প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এক বিপজ্জনক দিক হল ধর্মের ভিত্তিতে মানবসমাজ বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ফলে শোষিত মানুষগুলোও আর এককাট্টা থাকে না, বহু ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠী-ভাগের সুযোগ নেয় শঠ রাজনীতিকরা। শঠ রাজনীতিকরা ও

রাজনৈতিক দলগুলো নিজ স্বার্থেই ধর্মান্ধতার অবসান চায় না। চাইতে পারে না। তারা নিপীড়িত মানুষদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে অথবা ভোট কুড়োবার স্বার্থে বঞ্চিত মানুষগুলোকে 'মুরগি লড়াই'তে নামায়। নিপুণ কুশলী প্রচারের ব্যাপকতায় সাধারণ মানুষ ভুলে যায়, যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতপাতের কালোবাজারির একটাই পরিচয় হওয়া উচিত—কালোবাজারি, শোষক। যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতপাতের দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের একটিই পরিচয়—দরিদ্র, শোষিত। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষগুলো যখন নিজেদের মধ্যে জাতপাত বা ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন লাভের ক্ষীরটুকু জমা হয় শাসক ও শোষকের ঘরেই। গরিব মানুষের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে লড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা মনে রেখেই শোষকশ্রেণি ধর্ম নামক অস্ত্রটিকে আরও শক্তিশালী করার গবেষণায় রত।

ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পূর্বজন্ম, কর্মফল, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তারই ফলে ধর্মবিশ্বাসী বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে আসল খল-নায়কদের দায়ী না করে দায়ী করেছে কল্পনার ভগবানের অভিশাপকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে। দুঃখে, অপমানে, সব হারাবার যন্ত্রণায়, ক্ষুব্ধতায় খান্‌খান্‌ হতে গিয়েও ভেঙে না পড়ে পরমপিতা জাতীয় কারো চরণে সব ক্ষোভ, সব দুঃখ যন্ত্রণা ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করেছে— মোরে সহিবারে দাও শকতি।

ধর্মের সমর্থক অনেকেই বলেন—পরমপিতা জাতীয় কারো কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে রয়েছে অপার শান্তি, সহ্য করার শক্তি।

পুরুষকারহীন মানুষই জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় পরমপিতাজাতীয়ের কারও কাছে আত্মসমর্পণ করে পরিত্রাণ পেতে চায়। আপসপন্থী মানুষই শান্তি খোঁজে আত্মসমর্পণে। কাদা-নরম মেরুদণ্ডী মানুষই নিজ শক্তিতে প্রতিরোধ না গড়ে আঘাত সহ্য করার শক্তি খোঁজে পরের শ্রীচরণে।

ধর্মের সমর্থক অনেকে এ-কথাও বলেন—ধর্মই সমাজকে ধারণ করে রয়েছে, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছে।

প্রাচীনকালে যখন রাজনৈতিক সংহতি, আইনের শাসন ছিল দুর্বল, তখন

ধর্ম দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, হয়তো বা তার কিছু প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাও অসম্ভব হয়ে পড়ে— তা সে দেশের মানুষ যতই ধর্মভীরু হোক না কেন?

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্টো উদাহরণ টানছি। ১৯৮৮ সালে আমাদের দেশে ১০০ জন অপরাধীর ওপর একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। বিভিন্ন ধরনের এই অপরাধীই বিশ্বাস করত ঈশ্বরের অস্তিত্বে, বিশ্বাস করত পাপ পুণ্যে। বিশ্বাস করত পাপের ফল নরক-যন্ত্রণা। এই বিশ্বাস কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদে সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে দুর্নীতির স্রোত, সে দেশে হত্যাকারী, নারী-ধর্ষক, গুন্ডা, ছিনতাইবাজ, চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকলে সাত-খুন-মাপ হয়ে যায়। যে দেশে গুন্ডা-বদমাইশ পকেটে না থাকলে রাজনীতি করা যায় না, সে দেশের মানুষ দু-বেলা ঠাকুর প্রণাম সেরে, নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবেই। এতক্ষণ উদাহরণ হিসেবে যে ধর্মপ্রাণ ভারতের কথা বললাম, এটা বুঝতে নিশ্চয়ই সামান্যতম অসুবিধা হয়নি সমাজসচেতন পাঠক-পাঠিকাদের।

প্রগতিবিরোধী চিন্তা এবং কুসংস্কারের উৎস ধর্ম, অধ্যাত্মচিন্তা। তাই কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে গেলে ধর্মকে আঘাত দিতেই হবে। ধর্মকে আঘাত না দিয়ে যাঁরা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা হয় কল্পনাবিলাসী, নতুবা হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতে সচেষ্ট। এ তো বিষবৃক্ষের গোড়াকে বাঁচিয়ে রেখে আগা কাটতে কাঁচি চালানো। এই সত্যকে ভুললে তো চলবে না— শোষণমুক্ত সমাজ গড়ারই একটি পর্যায়, একটি ধাপ শোষিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্তি, শোষিত মানুষদের চেতনা-মুক্তি, যার আর এক নাম— সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

যেসব সংস্থা ও ব্যক্তি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বাঁধছে, নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছে, সভা করে বক্তব্য রাখছে, ফাঁস করছে ওঝা গুণিনদের নানা কারসাজি— তারা অবশ্যই খুব ভালো কাজ করছে। অবশ্যই এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংস্কারের গোড়া ধরে টান দিতে হলে যে তথাকথিত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষদের সামনে তুলে ধরতে হবে একথাও মনে রাখতে হবে। সঠিক রণকৌশলের স্বার্থে তত্ত্বগতভাবে ধর্ম বিষয়ে জেনে নিতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে

রণনীতি। কোথায়, কখন, কী পরিস্থিতিতে তথাকথিত ধর্মকে কতটা আঘাত হানব, কাদেরকে কেমনভাবে বোঝালে তথাকথিত ধর্মের স্বরূপ ফলপ্রসূ হবে সেটা নিতান্তই কৌশলগত প্রশ্ন।

আমরা বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘদিনের বহু অন্ধ-সংস্কার, বহু স্পর্শকাতর সংস্কার নিয়ে বোঝাতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, ওঁরা বোঝার চেষ্টা করেন, ওঁরা বোঝেন, ওঁরা বিষয়ের অনুধাবন করে সংস্কার-মুক্তির লড়াইতে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন, আমাদের নেতৃত্ব দেন। ওঁরা দেশি-বিদেশি পুঁথি পড়ে, ভালো বলতে কইতে বা লিখতে পারার সুবাদে ছাত্রনেতা থেকে জননেতা হননি, ওঁরা বুদ্ধি-বেচা ও ডিগবাজি খাওয়া শেখেননি। ওঁরা লড়াই করতে করতে লড়াকু হয়েছেন, ওঁরা জানতে বুঝতে শিখতে অনেক বেশি আগ্রহী, অনেক বেশি আন্তরিক। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা নিয়ে 'সব জানি', 'সব বুঝি' করে 'কুয়োর ব্যাঙ' হয়ে থাকতে নারাজ। সংগ্রাম যখনই ময়দানে নেমে আসে, নেমে আসে রান্নাঘরে বেয়নেটের ফলা তখন মধ্যবিত্ত নেতাদের সীমাবদ্ধতা পচা ঘায়ের মতোই ফুটে ওঠে। বঞ্চনার শিকার শ্রমিক-কৃষক লড়াকুরাই তখন নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যে সঠিক পথ নির্দেশ করেন। তাঁরা নেতৃত্বে চলে আসেন। তাঁরা ইতিহাস ঘেঁটে নজির খোঁজেন না, নজির তৈরি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ওঁদের হাতে নেতৃত্ব চলে যেতে থাকলে সবচেয়ে মুশকিল হয় শোষকশ্রেণির। ওঁদের নেতাদের কেনা যায় না মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা নেতাদের মতো। এখানেই শাসক শোষকদের মুশকিল।

আজ আমাদের সমিতির বহু শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক শ্রেণির বঞ্চিত বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। ওঁদের লড়াইয়ের সাথী হিসেবে পেয়েছি, ওঁদের অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার ফলেই। সুতরাং যাঁরা মনে করেন বঞ্চিত মানুষদের ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত করলে আমরা বঞ্চিত মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, তাঁরা একথা বলেন হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব থেকে, নতুবা তাঁরা কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলতে চান এবং বাঁচিয়ে রাখতে চান কুসংস্কারের গোড়াটিকেই।

আমরা মনে করি, ধর্ম মানে শনি, শীতলার পুজো বা দরগার সিন্নি নয়। আগুনের ধর্ম যেমন 'দহন', তলোয়ারের ধর্ম যেমন 'তীক্ষ্নতা', মানুষের ধর্ম তেমনই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ।

তাই মন্দিরে পুজো না করে, মসজিদে নামাজ না পড়ে, গির্জায় প্রার্থনা না করেও মানুষের প্রগতিকামী যুক্তিবাদীরাই প্রকৃত ধার্মিক। এই স্বচ্ছতা নিয়ে নিজ স্বার্থেই শ্রমজীবী শোষিত মানুষদের আজ তথাকথিত ধর্ম ও সেই ধর্ম থেকে সৃষ্ট ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময় হয়েছে।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বুকে জড়াও আবেগভরে, পৃষ্ঠে বসাও ছুরি

এখানে ধর্ম বলতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে। 'ধর্ম' বলতে আরও অনেক কিছুকেই বোঝায় : যেমন, বস্তু-ধর্ম, জাত-ধর্ম, জীব-ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব ধর্ম নিয়ে আলোচনার অবতারণা করতে এই প্রবন্ধ নয়। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা সাংগঠনিক রূপ। 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' হল এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ভিত্তিমূল। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা religion-এর মূলেই রয়েছে ঈশ্বর বা পরমপিতা অথবা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস; এবং এরই পাশাপাশি আত্মার অস্তিত্ব, পরলোক, পাপপুণ্য, অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে আস্থা।

'Fudamentalism' এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় যে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ও অতি-প্রচলিত, সেটি হল 'মৌলবাদ।' Fundamentalism -শব্দের অভিধানগত অর্থ কী? SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY অনুসারে 'বাইবেল বা অন্য ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাস।' যাঁরা সংসদের মতো নির্ভরশীল প্রকাশকদের ভারতীয় প্রকাশক হওয়ার দরুন তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ, তাঁদের জন্য Oxford Dictonary থেকে অর্থ তুলে দিচ্ছি, "Strict maintenance of traditional scriptural beliefs"; Chambers Dictionary তে বলা হয়েছে, "Belief in the literal truth of the Bible, against evolution, etc" । অর্থাৎ দেখা

যাচ্ছে সংসদ অভিধানে দেওয়া অর্থটি অন্য দুটি অভিধানগত অর্থের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে।

এবার 'মৌলবাদ' শব্দটিকে একটু ভেঙে দেখা যাক। 'মৌল' শব্দের অর্থ 'মূল থেকে আগত' বা 'মূল সম্বন্ধীয়'। 'বাদ' শব্দের অর্থ 'মত' বা 'তত্ত্ব' অর্থাৎ 'theory'। অর্থাৎ মৌলবাদ শব্দের অর্থ দাঁড়াল 'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাস, বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বাসের মূল থেকে আগত তত্ত্ব। জ্ঞানের আলোকে জীবনকে উদ্ভাসিত করা যদি মনুষ্য-ধর্মের মূল লক্ষ্য বলে ধরে নিই, তবে স্বীকার করতেই হবে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আগত তত্ত্ব মনুষ্য-ধর্মের বিপরীতধর্মী।

ধর্মশাস্ত্রকে চরম সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপনই যে 'মৌলবাদ', এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রমরমার সঙ্গেই নির্ভর করে মৌলবাদের ভয়াবহ উত্থান।

আজ মৌলবাদ রোখার ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভারতে মৌলবাদী চিন্তার একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকেই দায়ী করে গাল পাড়ছে। ব্যাপারটা যেন এমনই যে, আর সব রাজনৈতিক দলগুলো মৌলবাদী চিন্তার ঊর্ধ্বে, ধোয়া তুলসীপাতা। এমন শোরগোল তোলার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অসাধু মতলব, যেন তেন প্রকারে বিজেপি-র বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি করে উত্থিত জনসমর্থনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া। এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর অনকেরেই শাখাপ্রশাখা হিসেবে আছে ছাত্র-সংগঠন, বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পী সংগঠন, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের সংগঠন, এমনি আরও সাত-সতেরো সংগঠন। মূলের আহ্বানে এইসব শাখা-প্রশাখা নিজস্ব চিন্তা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে পথে-মাঠে-ময়দানে নেমে পড়েছে জনগণের মগজ ধোলাই করতে, জনগণের আবেগে উত্তাপ সৃষ্টি করতে। 'হুম্-হুম্' রবে এরা সব হাঁক ছেড়েছে—"শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা মৌলবাদ রুখছি, রুখব।"

যারা এমন তারস্বরে মৌলবাদ রোখার লড়াইতে ময়দানে নেমেছে, তারা আন্তরিক, কি ভণ্ড? বাস্তবিকই মৌলবাদ রুখতে চায়, কি এই সুযোগে প্রগতিবাদী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বন্ধু সেজে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে

আমাদের শুধু দেখতে হবে, আন্দোলনকারীরা মৌলবাদী চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন কি না? মৌলবাদ বিরোধী, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী কি না? কেউ আন্তরিকভাবে মৌলবাদ বিরোধী হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিরোধী হতেই হবে।

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে, ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে, মৌলবাদীদের সঙ্গে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলো বোঝাপড়া করছে, হাত মেলাচ্ছে, তাতে তাদের মৌলবাদ বিরোধী স্লোগান নেহাতই চূড়ান্ত ভণ্ডামি, শঠতা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বই আর কিছুই মনে হওয়ার অবকাশ আছে কি? অবশ্যই নেই। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায়, পুজো কমিটিতে পার্টি ক্যাডারদের ভিড়ে যেতে যারা বলে, তারাই তো স্পষ্টত মৌলবাদী চিন্তাধারার উত্থানের সহায়কশক্তি, মৌলবাদের পালক। মৌলবাদী শক্তি রুখতে যাঁরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণায়, স্লোগানে আকাশ-বাতাস মথিত করেন, তাঁরা কি প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে, স্লোগানকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে পারবেন ওইসব মৌলবাদীদের ধারক-বাহক-পালক শঠ রাজনৈতিক নেতাদের বদমতলব রুখতে? তাদের ওইসব মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে? না কি কিছু গুছিয়ে নেওয়ার ধান্দায় ওইসব রাজনীতিকদের কলটেপা পুতুলের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবেন?

আজ যে মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনেকেই শঙ্কাপ্রকাশ করছেন, কিন্তু এই শক্তি তো একদিনে বেড়ে ওঠেনি। ধর্ম নিয়ে এমন উন্মত্ততা তো একদিনে গাছের পাকা ফলটির মতো টুপ করে এসে পড়েনি। 'সাম্প্রদায়িক', মৌলবাদী বলে আজ যাদের গাল পাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দলগুলো তো হঠাৎ করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার চাষ, ধর্মের চাষ ও ধর্ম-ব্যবসা দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে কে নামেনি? মানুষ তো জন্মেই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ হয়নি। ওদের একটু একটু করে এভাবে তৈরি করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম, পরিচিত আপনজনের জীবন চর্যা থেকেই রস আহরণ করে শিশু মানুষ সাম্প্রদায়িক মানুষ ও ধর্মান্ধ মানুষে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারাই সংসদীয় নির্বাচনে আখের গোছাবার ধান্দায় ধর্মীয় নেতাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে প্রকাশ্যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভক্তি গদগদ ভাব প্রদর্শন করে; কালীপুজো, দুর্গাপুজো, রামপুজো, গণেশপুজো, কৃষ্ণপুজো, শিবপুজো, ইত্যাদি পুজো উদ্বোধন করে, জগন্নাথের রথের রশিতে টান দেয়, ভেঙ্কটেশ্বরে

মানত করে, দরগায় সিন্নি চড়ায়, গুরুদ্বারে ভক্তি নিবেদন করে, গির্জায় মোম জ্বালে। রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্রগুলো এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচার করে চলেছে অবিরল ধারায়। রাষ্ট্রনেতাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানও দেখানো হচ্ছে দূরদর্শনের পর্দায়, ঘোষিত হচ্ছে বেতারে, ছবিসহ প্রকাশিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। দিনের পর দিন এমন প্রচারে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসই আরও বেশি শেকড় মেলে দিচ্ছে।

মৌলবাদ একটা বিশ্বাসের ব্যাপার; ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডই এমন ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসকে আরও বেশি জোরদারই করছে, আরও ব্যাপকতর অংশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বামফ্রন্ট দীর্ঘ বছর পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থেকে একটি লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, 'এখানে মৌলবাদীদের কোনও স্থান নেই'। কিন্তু বাস্তব যে বলে, এ-সবই আদ্যন্ত মিথ্যা প্রচার, প্রতারণা! এই বঙ্গে বারোয়ারি দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোর রমরমা বেড়েছে রাজনৈতিক ক্যাডারদের ও মাঝারি মাপের লিডারদের ব্যাপক অংশগ্রহণে। রাজনৈতিক নেতারা এইসব পুজো উদ্বোধনে হাজির থেকেছেন, বোম্বাই থেকে সুপার-স্টার অভিনেতা অভিনেত্রীদের উড়িয়ে নিয়ে এসে হাজির করেছেন তাঁদের স্নেহধন্যদের পুজোয়। যাঁরা মৌলবাদীদের চামড়া গুটিয়ে দেবেন বলে আস্তিন গুটিয়ে মাইক ফোঁকেন, মৌলবাদের বিরুদ্ধে পাঁচ কিলোমিটার পদযাত্রা করেন, তাঁরা কি পারবেন ওইসব ধান্দাবাজ স্ববিরোধী রাজনীতিকদের চামড়া গুটিয়ে দিতে? যদি না পারেন, প্রতিটি যুক্তিমনস্ক মানুষ অবশ্যই ধরে নেবেন, ওই সব উচ্চকণ্ঠ সংগ্রামী-সাজা বিভিন্ন সংগঠনগুলো আসলে কথায় ও কাজে ভিন্ন মেরুতে বিচরণ করা রাজনৈতিক দলগুলোরই লেজুড়, উচ্ছিষ্টভোগী ছাড়া কিছুই নয়।

'মৌলবাদী রুখতে হবে' স্লোগানের আড়ালে ভণ্ডামির যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো, তাতে কে যে শেষ পর্যন্ত 'ভণ্ড চূড়ামণি'র শিরোপা জিতে নেবে, আগাম অনুমান করা বেজায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসবাদী অনেক দলকেই এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ 'আন্ডার ডগ' ভাবলে বেজায় ভুল করবেন। ওরাই আসলে প্রতিযোগিতার 'কালো ঘোড়া'। বিশাল এক মার্কসবাদী দলের সাম্প্রতিক ভূমিকার দিকে একটু

মনোযোগী হলে প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনার রূপালি রেখা সমঝদার মাত্রেরই নজরে পড়বে। ওই দলটির দৈনিক মুখপত্রে আমরা একই সঙ্গে 'মৌলবাদ রুখছি রুখব' বিজ্ঞাপন ও অধ্যাত্ম জগতের মেগাস্টার 'মা নির্মলাদেবীর' বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখেছি। ঈশ্বর দর্শনের ঠিকা-নেওয়া 'মা নির্মলাদেবীর' ঢাউস বিজ্ঞাপনটি একদিন হঠাৎ, আচমকা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে দিনের পর দিন।

মার্কসবাদী বেশ কিছু দলই তাদের ক্যাডার বাহিনীতে ঢুকিয়েছে এক নতুন পুজো কালচার; যে কালচার বিভিন্ন পুজো কমিটিকে বাজেট প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। বহু সর্বজনীন পুজো বাজেটই আজ লক্ষ ছেড়ে কোটির দিকে ধাবিত। পুজোর এই রমরমা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতাদের স্নেহচ্ছায়াতেই বর্ধিত হয়েছে। রাজনীতিকরাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষবৃক্ষ জলসিঞ্চন করে চলেছেন, সার দিয়ে চলেছেন। এমন করার পিছনে অসাধু কুটিল উদ্দেশ্যের একটি, জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের আপনজন সেজে ভোট বাক্স পুষ্ট করা। আর তাতেই এঁরা স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে একই সঙ্গে রামপুজোর বিরোধিতা এবং দুর্গাপুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোকে তোল্লা দেওয়া চালিয়ে যান। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজস্থানী ভোটারদের স্বল্পতার কথা চিন্তা করে নিরাপদ বিবেচনায় সতী মন্দিরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, সতী মন্দির ও সতী পুজোর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বিবৃতি দেন, সতী মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। একটি মার্কসবাদী দলের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত ঘোষণা রাখেন—মৃতকে নিয়ে স্মৃতি সৌধ হতে পারে, কিন্তু মৃতকে পুজো? মৃতের স্মৃতিমন্দির? এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার বিষ আমরা পশ্চিমবাংলায় ছড়াতে দেব না। এঁরাই আবার লোকনাথ, রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, অনুকূল ঠাকুর, অন্নদাঠাকুর, রামঠাকুরের পুজো নিয়ে, তাদের স্মৃতিতে গড়ে ওঠা মন্দির নিয়ে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন করেন—নীতির চেয়ে ভোট-বাক্সে বেশি রকম গুরুত্ব দেওয়ার সুবাদে। ক্ষমতার মধুপানই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ছলের অভাব হওয়ার কথা নয়। এই সব রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা যে সব সময়ই নীরবতা পালন করে ধর্মশিকারিদের পরোক্ষ মদতই দিয়েছেন, এমন মিথ্যা কথা অবশ্য আমি বলছি না। অনেক সময়ই ওই সব কুশলী নেতারা ধর্মগুরু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে নাচন-কোঁদন করে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ মদতও দিয়েছেন। আর এ-সবই করেছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শিষ্য শিষ্যাদের ভোটাধিকার আছে, এই কথাটি মাথায় রেখে।

একটি বড় মার্কসবাদী দলের বিজ্ঞান সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ' তাদের ১৯৮৯-এর বিশেষ সংখ্যায় তাদের সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উপস্থিত করতে গিয়ে লিখছে, *"মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জিগির তোলার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু 'বিজ্ঞান প্রচারকে'র বীরদর্পে আস্ফালন"?*

কিছু কিছু কথা বারবার বলার প্রয়োজন হয়। তাই বলি, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পচনধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কার মুক্ত করা; যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম; যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মানুষের কাম্য, সভ্যতার কাম্য।

বিজ্ঞান মঞ্চের আলোচ্য ওই প্রবন্ধটিতেই লেখা হয়েছে অদ্ভুত স্ববিরোধী দুটি লাইন, "সংগঠিত জনবিজ্ঞান আন্দোলন পারে ধৈর্য নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাছে কুসংস্কার এবং মৌলবাদের মুখোশ খুলে দিতে। এখানেই প্রয়োজন জনবিজ্ঞান আন্দোলনের শত শত একনিষ্ঠ কর্মীর, যে কর্মীরা মানুষের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির ওপর আচমকা আঘাত করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার ভুল রাস্তায় যাবেন না"।

মৌলবাদের অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং কুসংস্কারের মুখোশ খোলার কর্মসূচি ঘোষণা করব, আবার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অন্ধ-বিশ্বাসকে আঘাত হানা থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনকারীদের বিরত থাকতে বলব। এ-সব কি অস্বচ্ছ চিন্তার ফসল? না কি আন্দোলনকর্মীদের মগজ ধোলাই করে তাদের মধ্যে অস্বচ্ছ চিন্তা ঢোকাতেই এমন অস্বচ্ছ চিন্তার ভণ্ডামি, কথার মারপ্যাঁচ?

সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানায় তো অনীহা থাকার কথা নয়, যদি সেই সংস্কৃতি হয় অবক্ষয়ের সংস্কৃতি! কোন সংস্কৃতিকে আঘাত হানব না? সতীদাহের সংস্কৃতিকে? বাবু কালচারের সংস্কৃতিকে? ধর্মান্ধতার সংস্কৃতিকে? অদৃষ্টবাদী চিন্তার সংস্কৃতিকে? জাত-পাতের সংস্কৃতিকে? পণ-প্রথার সংস্কৃতিকে?

আজ গোটা দেশ জুড়ে ধর্মের রমরমা। আর এই রমরমার পিছনে রয়েছে ধনকুবের শ্রেণি ও তাদের অর্থে নির্বাচনে জেতা তল্পিবাহক সরকারের কূট পরিকল্পনা। ওরা চায় ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে পূর্বজন্ম, কর্মফল, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠুক, দৃঢ়বদ্ধ হোক। এমনটি হলে বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের

বঞ্চনার কারণ হিসেবে আসল খল নায়কদের দায়ী না করে দায়ী করবে কল্পনার ভগবানের অভিশাপকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে, অদৃষ্টকে। দুঃখে, যন্ত্রণায়, অপমানে খান্‌খান্‌ হতে হতেও ওরা বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে, প্রতিরোধ না গড়ে তুলে, পরিত্রাণ পেতে চাইবে পরমপিতাজাতীয় কারও কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে।

ধর্ম আজ গরিবদের শত্রু শিবিরের শক্তিশালী অস্ত্র। ধর্মের নেশায় মাতিয়ে দিতে পারলে বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা যায়—অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের ইচ্ছেকে বঞ্চনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। আর তাই পরিকল্পিতভাবেই সরকার নানা স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়েই তার লক্ষ্যে স্থির রয়েছে। তারই পরিণতিতে মন্দির, মসজিদ ও নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের বদান্যতার পরও সরকারি এবং বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো (যেগুলোর মালিক অবশ্যই ধনী, হুজুর শ্রেণি) 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামক 'সোনার-পাথর-বাটি'টি ভাঙল ভাঙল বলে আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলে কুমিরের মতোই চোখের জল ফেলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর এমন চিৎকারের পিছনে যে কারণটি ক্রিয়াশীল তা হল, মুখোশহীন ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তার সমর্থক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচণ্ড উত্থানকে রোখার চেষ্টা। এতদিন যে বিষবৃক্ষে সকলে মিলিতভাবে জল সিঞ্চন করেছেন, সার ঢেলেছেন, তাতে এমনটা ঘটাই তো স্বাভাবিক। সকলে মিলে সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষ যদি মুখোশধারী মৌলবাদীদের ছেড়ে মুখোশহীন মৌলবাদীদের পক্ষে যান, তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা তো কিছুই দেখি না। এমন মৌলবাদী চিন্তার উত্থানের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না কোনও দল বা ব্যক্তি, যাঁরা ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে নীরব থেকেছেন, নীরব থাকার উপদেশ বর্ষণ করেছেন।

বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সঙ্গে। জেনেছে—ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ 'সব ধর্মের সমান অধিকার।'

বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা সর্বত্র হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদ্বারে নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে, গির্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়া, ঈদ, বড় দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়করা বেতার দূরদর্শন মারফত শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

সাধারণের ভালো লাগছে— 'সব ধর্মের সমান অধিকার' মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভালো লাগছে জনসাধারণের—হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলার। মন্ত্রীরা এরই মাঝে বুঝিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা মশাল জ্বালিয়ে রাখতে রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে, ভাবা যায় না! 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ—কোনও পক্ষে নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। Secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ—একটি মতবাদ, যা মনে করে—রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

একী! এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখছি? সেকুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনও প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস হয় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে, নারকেল ফাটিয়ে।

সেকুলার রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে এই ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস যেন প্রকাশ্যে না এসে পড়ে এ বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা 'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের কর্তব্য।

কিন্তু ভারতে মন্ত্রী, রাজনীতিক ও আমলারা প্রকাশ্যেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মাচার পালন করেন। প্রয়োজনে এইসব রাজনীতিকরা সব ধর্মকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ফলে এইসব রাজনীতিকরাই যখন ধর্ম নিরপেক্ষতার বড় বড় বুলি কপচায় ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলে তখন এদের দ্বিচারী, ধান্দাবাজ চরিত্রই প্রকাশ পায়।

শ্রমজীবী মানুষের আজ তাই সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিষবৃক্ষটিকে তুলে ফেললেই কিন্তু আমরা বিপদমুক্ত হতে পারব না। আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে—কাউকেই বিষবৃক্ষের বীজ বপনের, জলসিঞ্চনের ও সার প্রয়োগের সুযোগ কোনও ভাবেই দেব না। সময় এসেছে স্ববিরোধী, কথায় ও কাজে সম্পর্কহীন আখের গুছোন চরিত্রগুলোকে সুস্থ, প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধী শিবিরের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার; নিরন্ন, অত্যাচারিত, হতদরিদ্র মানুষগুলোর বন্ধুবেশী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার; যারা একই কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত নয়", এবং "মৌলবাদ রুখতে হবে।"

যে শক্তি ৬ ডিসেম্বর '৯২ হিন্দু মন্দির গড়ার নামে অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভেঙেছে সেটা যেমন অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট, তেমনই যে শক্তি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুশিরাম হাসানকে প্রহার করেছে "স্যাটানিক ভার্সেসের মতো বই নিষিদ্ধ করে কোনও লক্ষ সাধিত হয় না" বলার অপরাধে সেটাও তেমনই অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট। যে শক্তি বাবরি মসজিদ ভাঙার বদলা নিতে মন্দিরের পর মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে সেটা যেমন অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট, তেমনই যে শক্তি বাংলাদেশের যুক্তিবাদী লেখক আহমদ শরীফের যুক্তিনিষ্ঠ কথা বলার অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার দাবিতে উন্মত্ততা প্রকাশ করে, সেটাও তেমনই অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট। এই ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে একটা কঠিন ও জটিল সার্বিক লড়াই দিতে না পারলে এই ক্রান্তিকালকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাবে না। এই লড়াই হবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে, অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানবিকতার লড়াই, যুক্তিনিষ্ঠার লড়াই, ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই।

রাজনীতির ব্যবসায়ীরা নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাঁধা গৎ এতদিন বাজিয়েই এসেছেন। দূরদর্শনের পর্দায় নানা মনীষীর ধর্ম-সার, ধর্ম-সমন্বয় ও সংহতির কথা প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এতে যে কোনও কাজই হয়নি তা বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ, ও মন্দিরে পাল্টা একগাদা মন্দির ও তার পাল্টা একগাদা মসজিদের ধূলিসাৎ-এর ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কার সঙ্গে সংহতি? এটা স্পষ্ট করে বুঝে না নিলে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমকে শব্দ-গণ্ডির বাইরে নিয়ে এসে কখনওই বাস্তবরূপ দেওয়া যাবে না, বাঁধা গৎ-ই শুধু ঘুরে মরবে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও

তাৎপর্য এবং সুসংস্কৃতির ক্ষেত্রের তার অসামান্য অবদার কথা নিজে বুঝতে হবে, অপরকে বোঝাতে হবে, সাধারণকে বোঝাতে হবে। এই বোধ থেকেই তৈরি হবে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের সংহত করতে পারলেই 'ধর্মে আছি, মৌলবাদে নেই' বলা ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশী শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে।

বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা 'পূর্ব-পরিকল্পিত' নয় ঠিকই, তবে করসেবকদের এই কাজ দীর্ঘ-দিনের অবরুদ্ধ হিন্দু আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। পাল্টা মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাগুলোও মুসলিম আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। এই ধর্মীয় আবেগের বাস আমাদের মনের গভীরে। এই আবেগ আমাদের সামাজিক পরিবেশের, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশেরই ফলশ্রুতি। একবার পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর দিকে ফিরে তাকালেই স্পষ্টতর হবে কীভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দল একটু একটু করে আমাদের চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক করে তুলেছে, আর তারই পরিণতিতে এই জাতিদাঙ্গা। দূরদর্শনে শত কিস্তি 'রামায়ণ' 'মহাভারত' হাজির করে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু আবেগকে উসকে দিয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। এই উসকে দেওয়া আবেগকে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি রামায়ণ টি ভি সিরিয়ালের রাম চরিত্রের অভিনেতাটিকে রাম সাজিয়ে নিজের দলের পক্ষে ভোটের প্রচারে নামিয়েছেন। ১৯৪৯ সাল থেকে অযোধ্যার যে বিতর্কিত কাঠামো ছিল তালাবন্ধ এবং মানুষের স্মৃতিতেও ছিল তালাবন্দি, সেই তালা রাজীব গান্ধির আমলে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারই খুলে দিয়েছিল হিন্দু মনে রামভক্তির জোয়ার আনতে। তার কিছুদিন পরেই নির্বাচনী ফায়দা তুলতে কংগ্রেস সরকার আর এক দফা হিন্দুত্ববোধের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তোলার পরিকল্পনায় রাজকীয় প্রচারের মধ্য দিয়ে রামমন্দিরের শিলান্যাস করল অযোধ্যায়। অযোধ্যায় অদূরে ফৈজাবাদে রাজীব গান্ধি নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করলেন আবেগকম্পিত গলায় সোচ্চার ঘোষণার মধ্য দিয়ে-'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ভারতে রামরাজ্য স্থাপন করব।' হিন্দু ভোটারদের আবেগকে উত্তাল করার রাজীব পরিকল্পনা সার্থক হল। শ্রোতারা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে সে-দিন ফৈজাবাদের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

কংগ্রেসকে এমন ধর্ম দিয়ে রাজনীতি করতে দেখে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমাদ গুনল। কংগ্রেসের পাল থেকে হাওয়া কাড়তে, আবেগ-তাড়িত হিন্দু ভোটারদের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টি আরও দু চার ধাপ বেশি এগিয়ে

গেল। প্রতিশ্রুতি দিল— আমরা বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করবই। আমরা কংগ্রেসের মত সামনে 'রাম' ও পিছনে 'রহিম' বলি না। রামরাজত্ব ও হিন্দুরাজত্ব সমার্থক এবং একমাত্র আমাদের দলই হিন্দুরাজত্ব অর্থাৎ রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কারণ একমাত্র আমাদের দলই হিন্দুত্বের প্রতীক। কথাগুলো আবেগে হাবুডুবু খাওয়া পাবলিক দারুণ খেল।

শঙ্কিত কংগ্রেস ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতি রোধে ব্যর্থ হল। এই সময় ভারতীয় জনতা পার্টির আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা দল হিন্দি বলয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতি রোধে বিশাল এক পরিকল্পনা নিয়ে লড়াই দিতে ময়দানে নামল। জনতা দল তখন দিল্লির তখত-এ আসীন। সংরক্ষণের নামে মণ্ডল কমিশনকে শিখণ্ডী খাড়া করে হিন্দু সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে দলিত, নিপীড়িতদের ভোট কাটিয়ে আনতে চাইল ভি. পি. সিং সরকার। ভি. পি. সিং-এর অবশ্য একথা মোটেই অজানা ছিল না -এই সমাজ ব্যবস্থায় 'সংরক্ষণ' কখনওই নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের মুক্তি আনবে, না আনতে পারে না। শোষিত মানুষদের শোষণ-মুক্ত করার জন্য শোষকরা তার দলকে নির্বাচনে জেতাতে কোটি-কোটি টাকা ঢালেনি, ঢেলেছে শোষণের কাজে সহায়ক হবে জেনে নেওয়ার পরই। ভি. পি. সিং-এর জনতা দল ভারতীয় জনতা পার্টির পাল থেকে হাওয়া কাড়তে পারল না পাল্টা চালে। ভারতীয় জনতা পার্টি আডবানীর নেতৃত্বে বের করল 'রামরথ'। হিন্দি বলয়ে রামরথ প্রচণ্ড রাম উন্মাদনার সৃষ্টি করল। অযোধ্যায় রামমন্দির বানাবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর ভারতের চারটি রাজ্যে নির্বাচন জিতে প্রমাণ করল, হিন্দু ধর্মীয় উন্নাদনার যে বাতাবরণ কংগ্রেসের রাজীব গান্ধি গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন, তাকেই তাদের দল আরও সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে মাত্র। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতির রথ থামাতে যতই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে বিরোধিতা করেছে ততই ধর্মান্ধ হিন্দুরা এই বিরোধিতাকে রাম-বিরোধিতারই সমার্থক বলে ধরে নিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো যে ভাবে নিজেদের মতো করে আমাদের চেতনায়, আমাদের সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পুঁতেছে, সার দিয়েছে, জল সিঞ্চন করেছে, তারই ফলশ্রুতিতে হিন্দু আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল অযোধ্যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি তাই বাবরি মসজিদ অক্ষুণ্ণ রাখার কথা দিয়েও কথা রাখতে পারেনি। আবেগ যখন গণহিস্টিরিয়ার রূপ নেয়, তখন সেই আবেগ

সৃষ্টিকারীর ক্ষমতা থাকে না, তাকে সামাল দেওয়ার। মনোবিজ্ঞানের এই পরম সত্য ভুলে ব্যক্তি স্বার্থে ও দলীয় স্বার্থে আমাদের দেশে বার-বার এ-ভাবেই বহু আবেগকে বাড়তে দেওয়া হয়েছে। বাড়তে দেওয়ার পরিণতিতে যখনই আবেগতাড়িতরা গণহিস্টিরিয়ার শিকার হয়েছে ও বিস্ফোরিত হয়েছে, তখনই আবেগের স্রষ্টারা তাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অতি আবেগ অনেক সময়ই হিস্টিরিয়ার কারণ। বহু মানুষের অতি আবেগ থেকে বহুর মধ্যে যে হিস্টিরিয়া দেখা দেয় তাই গণ-হিস্টিরিয়া, যা আরও বহুতে সংক্রামিত হয়। এমনটাই ঘটেছিল অযোধ্যা কাণ্ডের ক্ষেত্রে। হিন্দু-ধর্মান্ধতার অতি আবেগ চালিত হয়ে করসেবকরা হয়ে পড়েছিল গণ-হিস্টিরিয়ার শিকার। সেই গণহিস্টিরিয়াই সংক্রামিত হয়েছিল বাবরি মসজিদ রক্ষার দায়িত্বে থাকা সরকারি বাহিনীর মধ্যে।

বাবরি মসজিদ রক্ষার দায়িত্বে ছিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনী (পি.এ.সি)। এই বিশাল বাহিনীর হাতে ছিল করসেবকদের ছত্র-ভঙ্গ করার মতো নানা ধরনের সাজ-সরঞ্জাম। হিমাংকের কাছাকাছি নেমে আসা শীতে করসেবকদের জব্দ করার জন্য ছিল পাইপের সাহায্যে জল ছোড়ার ব্যাপক ব্যবস্থা। ছিল কাঁদুনে গ্যাস, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, ঢাল ছিল, লাঠি ছিল। কিন্তু করসেবকদের 'শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে প্রতিরোধের বেড়া টপকে মসজিদের দিকে এগোতে দেখেও মসজিদ রক্ষাকারীদের হাতের কোনও অস্ত্রই সেদিন করসেবকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি। এমনকী, উপরওয়ালার 'ফায়ার' আদেশকে পর্যন্ত তারা তুচ্ছ করেছে করসেবকদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

এই ধর্মান্ধতা থেকে সৃষ্ট গণহিস্টিরিয়া ও ধর্মীয়-ফ্যাসিবাদ স্পষ্টতই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ দূষণেরই ফল, অপসংস্কৃতিরই ফল, যুক্তিহীনতার ফল। যুক্তি, তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করলেই দেখতে পাবেন, এমন আত্মঘাতী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধানতম ঘাতকের ভূমিকায় আবেগচালিত হওয়ার ফলে অনেক হিন্দুদের সামনেই হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সুখ-স্বপ্নের হাতছানি, সমস্যাহীন, দারিদ্রহীন, শোষণহীন 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার হাতছানি। অতি-আবেগ তাদের সরিয়ে রেখেছে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার থেকে দূরে। তারা 'শ্রীরাম' নামের গণহিস্টিরিয়ার শিকার হয়ে ভুলে গেছে সাধারণ যুক্তিটুকু—গরিবদের ক্ষুধার আগুনের কাছে একান্তই অর্থহীন, —রাজত্ব হিন্দু চালাচ্ছে, কি অহিন্দু। গরিবদের তীব্র প্রয়োজন বেঁচে থাকার

ভাত-রুটির, মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ও পরনের কাপড়ের। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই যে গরিবদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হতে পারে না, তারই প্রমাণ হিসেবে লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের সঙ্গে সোনার চামচ মুখে তোলা শোষক মানুষদের একই অঙ্গে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল। এক ধর্ম শাসিত কোনও রাষ্ট্রশক্তিই গরিব শোষণ বন্ধ করেনি, গরিবদের হাল পাল্টে দেয়নি, ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোই তার প্রমাণ। শুধু তাই বা বলি কী করে? দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা খ্রিস্টীয়দের হাতে কালো খ্রিস্টীয়দের নিপীড়নের টাটকা কাহিনি তো কম কানে আসছে না মানুষের।

হিন্দুস্থানে মুসলিমদের অবস্থানই জাতিদাঙ্গার কারণ, এমন কুযুক্তি ধোপে টেকে না। আমাদের এই দেশেই বহু জাতিদাঙ্গা হয়েছে ভাষার ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে।

এ-দেশে ফি বছর বর্ণ হিন্দুদের নিষ্ঠুর আক্রমণে বহু অচ্ছুত হিন্দু উজাড় হয়ে গেছে, উজাড় হয়েছে ওদের ঝুপড়ি-ইজ্জত প্রাণ। একই ধর্মতে অবস্থান কি কুয়েত, ইরাক, ইরান ইত্যাদি দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছে? পেরেছে পৃথিবীর বহু দেশে একই ধর্মীয়দের মধ্যে জাতিদাঙ্গা বন্ধ করতে?

নির্বাচন-নির্ভর সব রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে চলেছে, ভারতীয় জনতা পার্টিও খেলছে। ধারাবাহিকভাবে রয়েছে দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্ধ, 'মানুষ' নামের অনুপযুক্ত রাজনীতির ব্যবসায়ীরা।

'অযোধ্যা-কাণ্ড' ঘটে যাওয়ার পর প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই এমন ভান করছে, যেন ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার পরিবারভুক্ত এবং দোসর দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেই 'ভারত' নামক দেশটি থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যাবে। না যাবে না, যেতে পারে না। কারণ 'সাম্প্রদায়িকতার তাস', 'জাত-পাতের তাস' এ-সব হাতে না থাকলে রাজনীতির ব্যবসায়ীরা খেলবে কী নিয়ে? দেশে অর্থনৈতিক সংকট থাকলে এ-সব তাস নিয়ে ওদের খেলতেই হবে। একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবেন অযোধ্যা কাণ্ডের দৌলতে ভারতের চরমতম আর্থিক সমস্যা, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক দুর্নীতি-শেয়ার কেলেংকারি এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া গোটা দেশের তা-বড় মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যানদের নিয়ে দুর্নীতির কেচ্ছা, পশ্চিমবাংলায় পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ—

এমনকী, বহু কিছুই আড়ালে চলে গেল। তীব্র আর্থিক সমস্যা ও গণবিক্ষোভের গন্ধ পেলে সব দেশের শাসকশ্রেণি যা করে ভারতের শাসকরাও তাই করে—দুটি তুরুপের তাস ব্যবহার করে। এক-সাম্প্রদায়িকতার, দুই-ধর্মান্ধতার সমস্যা মিটে যাবে না। দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে, দেশে জনবিক্ষোভ থাকলে ধর্মান্ধতার জিগির তুলতে নতুন-নতুন মন্দির-মসজিদ বেছে নিতে শাসকদের অসুবিধে হবে না, জাত-পাতের জিগির তুলতেও অজুহাতের অভাব হবে না।

দেশের ক্রান্তিকালেও রাজনীতির ব্যবসায়ীরা যে ভোটের ফায়দা লোটার লোভ ভুলতে পারে না, তাও আর একবার দেখতে হল দেশবাসীকে। অযোধ্যায় ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ জানাল কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিচ্ছে, সমর্থন তুলে নিচ্ছে কেরল জোট সরকারের উপর থেকেও। কংগ্রেস সাংসদদের একটা বড় অংশকে মুসলিম ভোটের কথা খেয়াল রাখতেই হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কংগ্রেস এখনও মুসলিম ভোটের বেশিটাই টানে। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে কংগ্রেসের 'ভোট-ব্যাঙ্ক' উল্লেখযোগ্য। এমন অবস্থায় মুসলিম লিগ-সহ বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে নিলে তার প্রভাব পড়বেই, এই কথা চিন্তা করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে ভেঙে ফেলা মসজিদ পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন ৬ ডিসেম্বরই। বইয়ের এই অংশটি যখন লিখছি তখন অযোধ্যা-কাণ্ডের দশ দিন অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে বহু মন্দির ধুলোয় মিশেছে, কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও তীব্র নিন্দা বা মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে।

এই দৃষ্টান্তটি হাজির করার উদ্দেশ্য ভেঙে ফেলা মসজিদ বা মন্দির নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা নয়। এই দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখাতে চাইছি, এমন দুঃসময়েও এরা কী ভাবে দেশের মানুষের চেয়েও দলের স্বার্থ, ভোটের ফায়দার কথা বিচার করে নিজেদের ঘোষিত মানদণ্ডের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও প্রয়োজনে লাথি কথায়।

বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ নভেম্বর '৯২ রাষ্ট্রপতি ভবনে বাম ও জনতা দলের নেতাদের সঙ্গে মুসলিম নেতাদের কথা হয়েছিল। তখন মুসলিম নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তো বটেই, অন্য রাজনৈতিক নেতাদের উপরেও তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা 'আজই' ভারত বন্ধ

ডাকবেন বলে জানিয়ে দেন। সে সময় বাম ও জনতা নেতারা মুসলিম নেতাদের বোঝান, বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা শুধু মুসলমানদের উপর আক্রমণ নয়, দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ। মুসলিম নেতাদের ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করে তাঁরা বলেন, আমরাও বিষয়টা দেখছি। আপনাদের সঙ্গে আমরাও ভারত বন্‌ধ ডাকতে চাই। সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটির নেতারা একদিন বন্‌ধ পিছোতে রাজি হন। ফলে ৮ নভেম্বর ভারত বন্‌ধের ডাক দিল সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটি আর বাম দল ও রাষ্ট্রীয় মোর্চা। ৭ নভেম্বর প্রায় মধ্যরাতে কংগ্রেসের মুখপাত্র ভি. এন. গ্যাডগিল জানালেন, বাবরি মসজিদ ভাঙাকে আমরা দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ বলে মনে করি, তাই কংগ্রেস এই বন্‌ধকে সমর্থন করছে।

ওই বন্‌ধের দিনেই কত মন্দির ধূলিসাৎ হল ধর্মান্ধ মুসলিমদের আক্রমণে, কিন্তু ভারত বন্‌ধ ডাকা একটি রাজনৈতিক দলও একবারের জন্যও সোচ্চারে বলার প্রয়োজন অনুভব করল না— মন্দির ভেঙে ফেলা শুধু হিন্দুদের উপর আক্রমণ নয়, দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রতিবাদে তারা ভারত বন্ধ ডাকতেও এগিয়ে এল না। এই তো তাদের ভোটের কথা মাথায় রাখা ধর্মনিরপেক্ষতা! তাদের হিসেব মতো, ধর্মান্ধ হিন্দুরা যখন উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বাক্সকেই স্ফীত করবে, তখন ভোট-যুদ্ধে টক্কর দিতে হলে ধর্মান্ধ মুসলিমদের ভোট সপক্ষে আনতেই হবে। আর তারই জন্য এই মুসলিম তোষণ।

আমার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি মসজিদ বা মন্দির ভাঙা বা পাল্টা ভাঙার প্রতি কোনও রকমের সমর্থন বা অসমর্থন জ্ঞাপন করতে চাইছি না, শুধু ভোটনির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

ধর্মান্ধতার তমসায় আজ কে আচ্ছন্ন নয়? রাজনীতিক, পুলিশ, প্রশাসন, সরকারি অফিসার, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কে নয়? এই ধর্মান্ধতার অপসংস্কৃতিকে দূর করতে হলে এই ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত ধরে ফ্যাসিবাদের যে আগমন, তাকে রুখতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেই আঘাত হানতে হবে। নতুবা সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ হল সেই ব্যাধি, অত সহজে নিষেধাজ্ঞা জারির মধ্য দিয়ে যার হাত থেকে

পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। বাঁচতে গেলে গোটা ব্যাধিটাকেই নির্মূল করতে হবে, গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আর তারই জন্য প্রয়োজন ব্যাধি ও ভাইরাস'কে ভালোমতো চিনে নেওয়া। ব্যাধিটা হল 'ধর্মান্ধতা', ব্যাধিটা হল 'ধর্মীয় মৌলবাদ'। ভাইরাস বা ধ্বংসকারী জীবাণু হল 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম'।

বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিদাঙ্গা শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ ডিসেম্বর '৯২ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ১৯৬৭ সালের 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন' অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, জামাত ই-ইসলামি-হিন্দ ও ইসলামিক সেবক সংঘকে। ওই একই আইনে ইসলামিক মুজাহির সংঘ, আগম সেনা, সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটি, আলি সেনা, জিহাদ লস্করের মতো মুখোশহীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেত, করা উচিতও ছিল। এমনকী, শিবসেনা, ভারতীয় জনতা পার্টি ও মুসলিম লিগের মতো মুখোশহীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভারতীয় সংবিধান মেনেই অর্ডিন্যান্স জারি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেত। ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হলেও সম্ভব ছিল। কিন্তু কোন্ আইনে মনের গভীরে প্রোথিত ধর্মান্ধতাকে, ধর্মীয় মৌলবাদকে নিষিদ্ধ করা যাবে? আইনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েও বলছি—শুধুমাত্র আইন দিয়ে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ করা যায় না, যাবে না।

তবে কি এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের কোনও পথ নেই? আছে, এই পথ ধর্মনিরপেক্ষ মনকে গড়ে তোলার পথ। ব্যক্তিজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজেও সততার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা চালাতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

আমরা অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে প্রচুর কথা বলি, প্রচুর কথা লিখি, ভারত নামক রাষ্ট্রটির ধর্মনিরপেক্ষতার মুকুট কাদার ছিটেতে মলিন হল বিদেশিদের চোখে—এই ভেবে আর্তনাদে বুক চাপড়াই কিন্তু আমরা দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝি না, এ-দেশের কি বিপুল সংখ্যক মানুষ বাবরি মসজিদ ভাঙার খবরে খুশিতে ঝলমল হয়ে ওঠে, কি বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্রিকেট বা হকি খেলায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে উল্লসিত হয়, মন্দিরের পতনের খবরে মনে খুশির জোয়ার ডাকে।

এই পুরো অবস্থাটার জন্য, এমনই একটা অপসংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির

জন্য অবশ্যই সবচেয়ে বড় দায়ী আমাদের শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা। এরা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা ও অন্ধ-বিশ্বাসকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েই চলেছে, আর চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতার সঙ্গে দল, সরকার ও রাষ্ট্রের গায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ মারতে সমস্ত রকমের মগজ-ধোলাই চালিয়েই যাচ্ছে। আমরা প্রচারে বাজিমাত করে যতই প্রতিষ্ঠা করতে চাই না কেন— 'ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ' অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ, বাস্তব চিত্র যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে আগেই তা দেখিয়েছি। সুতরাং তাত্ত্বিক স্তরে, যাকে বলে অ্যাকাডেমিক নিরিখে বিচার করলেও আমাদের দেশকে নৈতিকতা ও ঔচিত্যের দিক থেকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারি না।

এ-বার আমরা বিশুদ্ধ যুক্তির স্তরে একটু আলোচনা করে দেখাতে চাইছি, আমাদের রাষ্ট্রশক্তি, আমাদের সরকার দলের স্বার্থেই, ভোটের মুখ চেয়েই ঠিক করে, কখন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানবে, কখন মানবে না। উদাহরণ বহু। বাস্তবিকই এই দ্বিচারিতার উদাহরণ টানতে টানতে একটা পুষ্ট-বই লিখে ফেলা যায়। বহু থেকে একটি উদাহরণ এখানে টানছি, যা থেকে প্রতিটি সৎ যুক্তিনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই বুঝতে পারবেন, আমাদের সরকার শুধু দ্বিচারিতা দোষেই দুষ্ট নয়,

যখনই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন বিশাল হয়ে হাজির হয়েছে, তখনই আমাদের সরকার রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটিকেও বিচার করেছে দলীয় স্বার্থের কথা ভেবে, ভোটের কথা ভেবে।

উদাহরণ হল— শাহ বানুর মামলা। শাহ বানুর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে সুচিন্তিত রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়কে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি পার্লামেন্টের ভোটে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, মৌলবাদী মুসলিম ভোটারদের পায়ে তেল মাখিয়ে ভোট-বাক্স স্ফীত করার ধান্দায়। বাবরি মসজিদ সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান করতে গিয়ে ধর্মান্ধ হিন্দু বা ধর্মান্ধ মুসলিম ভোটাররা দলের উপর পাছে চটে, এই ভেবে কংগ্রেস সরকারই এই মসজিদ সমস্যাকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এ কি দ্বিচারিতারই

দৃষ্টান্ত নয়? ভোটের ফায়দা লোটার অপচেষ্টায় দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারেরই জ্বলন্ত উদাহরণ নয়?

একই সঙ্গে নিন্দনীয় বামদলগুলো সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর শাহ বানু মামলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত ভূমিকা। রাজীব গান্ধির এমন দৃষ্টিকটু মৌলবাদীদের তুষ্ট করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এরা প্রবলতম আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন না মৌলবাদী সংখ্যালঘুরা অসন্তুষ্ট হবে ভেবেই।

আসুন, এ-বার আমরা তত্ত্বের নিরিখে বিচার করে দেখি কোনও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে তার শক্তিকে নিঃশেষ করা যায় কি না? আমরা তাত্ত্বিক স্তরে বিষয়টিকে বিচার করলে দেখতে পাব যে-সব দলের সাংগঠনিক শক্তি জোরাল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই, অর্থাৎ যে-সব দল মানুষের আবেগের উপর নির্ভর করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে, অথবা যে-সব দল ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল, কাগুজে, তাদের ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মৃত্যুই বয়ে আনে। কিন্তু যে-সব দল জোরাল সাংগঠনিক শক্তির উপর দাঁড়িয়ে, তাদের ক্ষেত্রে এমন নিষেধাজ্ঞা বড় জোর প্রকাশ্য কাজ-কর্মকে অন্তরালে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে এমন সরকারি নিষিদ্ধ ঘোষণা দলকে সাধারণ মানুষের চোখে মহত্তর ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এই তত্ত্ব কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, এটুকু জানতে আমাদের ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে ইতিহাসের দিকে তাকালেই চলবে। ব্রিটিশ শাসকদের দমননীতি ও নিষেধাজ্ঞা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে ভাঙতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে এর আগেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ দু'বার ও জামাত ই-ইসলামি একবার নিষিদ্ধ হয়েছে। নিষেধ উঠে যাওয়ার পর ওরা আরও বেশি শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমাদের এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয়—রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করে কোনও দল বা সংগঠনকে শক্তিহীন করা যাবে, বা তাদের চিন্তার হাত থেকে সমাজজীবনকে আগলে রাখা যাবে, এ-কথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত দলটির সাংগঠনিক শক্তি ও তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা, তাদের বিরুদ্ধে সরকারি প্রচারে মানুষের প্রভাবিত হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে দলটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর শক্তি বজায় রাখতে পারবে কি না, শক্তি ক্ষয়িত হবে কি না অথবা শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে কি

না, চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে প্রসারিত হবে, কি বন্ধ হবে। নিষিদ্ধ দল নাম পাল্টে সিদ্ধ হলে যেখানে আইনের কিছুই করার নেই, সেখানে সংগঠিত সংগঠনকে শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার উত্থান ঠেকাবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

কয়েকটি মুখোশহীন সাম্প্রদায়িক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে কোনওভাবেই সর্বগ্রাসী এই সাম্প্রদায়িক চিন্তার হাত থেকে আমাদের সমাজ-জীবনকে, আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, কারণ প্রায় প্রতিটি নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলই স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক। ভোট আদায়ের স্বার্থে এরা ধর্ম-ভাষা-জাত-পাত সব কিছু নিয়েই বিভেদ সৃষ্টি করে, রাজনীতি করে। একটা স্পষ্ট কথা বলি, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই আজ ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে সোচ্চার, কিন্তু কই-এরা তো একবারের জন্যেও মুসলিম লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে না? এমনতর অদ্ভুত ব্যবহারের, দ্বিচারিতার কারণ অন্তর্নিহিত রয়েছে সাম্প্রদায়িক মুসলিম ভোটারদের খুশি করার চেষ্টার মধ্যেই।

অযোধ্যার বিতর্কিত বাবরি মসজিদকে রক্ষা করা কেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির অগ্নি-পরীক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুশিরুম হাসানকে ধর্মান্ধদের বর্বরোচিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করাকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির অগ্নিপরীক্ষার প্রতীক করা হল না? কেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো এই ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল না? কথায় ও কাজে রাজনৈতিক দলগুলোর কেন এমন 'আশমান-জমিন' ফারাক? ভোটের কথা মাথায় রেখে মুসলিম মৌলবাদীদের তুষ্ট করতেই কি এই নীরবতা? শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা, চোখ-কান খোলা রাখলে এর উত্তর অবশ্যই আপনাদের অজানা, অধরা থাকবে না। আপনাদের সচেতনতাই পারে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের এমন দ্বিচারিতা, অসততা ও শয়তানি বন্ধ করতে।

ভ্রাতৃদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশের এমন এক ক্রান্তিকালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও সংগঠনগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সভা-সমিতি-মিছিল-প্রচার-পুলিশ-প্রশাসন-সেনাটহল ইত্যাদির সম্মিলিত প্রয়াস দ্বারা হয়তো একটা আত্মহননকারী জাতিদাঙ্গার লেলিহান শিখা স্তিমিত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাতে পারে না, যাতে থাকে আবারও

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন গোপন-আগুন সর্বদলীয় মিটিং-মিছিল বা সেনা-পুলিশের গুলির মুখে নেভার নয়। এ-আগুন নেভানোর কোনও শর্টকাট রাস্তা নেই। এ-পথ অত্যন্ত দীর্ঘ, এর প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। এক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানুষের মনের ধর্মান্ধতার তুষের আগুন নেভাতে হবে। মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা-ভাবনা প্রোথিত করতে পারলে আপনা থেকেই উপড়ে আসবে ধর্মীয় উন্মত্ততার শিকড়। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ গড়াতে এই পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই।

"পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নেই"—মুখ্যমন্ত্রীর এমনতর ঘোষণাটি যখন বিভিন্ন ঋতুতে ঘুরে-ফিরে বসন্তের হাওয়ার মতোই প্রশান্তি ও তৃপ্তি বয়ে আনছিল নাগরিক মনে, ঠিক তখনই তাঁরই মন্ত্রিসভার রাজচক্রবর্তী মন্ত্রীরা তাঁদের স্নেহভাজন মাস্‌ল্‌ম্যানদের মহা ধুম-ধামে পুজো-আর্চা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছিলেন ধর্মান্ধতার ঘুণ-পোকা, যারা নিঃশব্দে আপন কাজ চালিয়েই গিয়েছিল। তারই ফলে অযোধ্যাকাণ্ডের পরে-পরেই তামাম বঙ্গবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন ধর্মান্ধতার এক ফুৎকারে বঙ্গবাসীদের সযত্নে লালিত ধারণা ও মুখ্যমন্ত্রীর গর্বের দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যে ক্যাডার বাহিনীকে কথায় কথায় আন্দোলন রোধে ডান্ডা হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যেত, সাম্প্রদায়িকতা রোধে তাদের টিকির দেখা মিলল না। বরং বহু অঞ্চলে রাজনৈতিক মাস্‌ল্‌ম্যান ও ক্যাডাররাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাল। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা দাঙ্গাকারীদের পরিচয় জানালেন পুলিশকে, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের। সব-জেনে শুনেও পুলিশ রাজনীতির ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট রাখতে আশ্চর্য রকম নিস্পৃহতা দেখাল দাঙ্গার যত পালের গোদাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে।

যখন কলকাতায় রাজনীতির ব্যবসায়ীদের আশ্রিত গুন্ডারা লুট-তরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার বিভীষিকা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পশ্চিমবাংলার গ্রাম-শহরের চিত্র ছিল কিছুটা ভিন্নতর। জাতীয় জীবনের এমন এক চরম মুহূর্তে গ্রামে-শহরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে জীবনকে বাজি রেখে কাজে নেমেছিলেন সমাজ সচেতন মানুষরা, যুক্তিবাদীরা। কলকাতার মতো গ্রামে-গঞ্জে দাঙ্গা না ছড়াবার একটা বিরাট কারণই হল, নাওয়া-খাওয়া-ঘুম শিকেয় তুলে রাখা কিছু সমাজসচেতন ও যুক্তিবাদীদের ভূমিকা।

কলকাতা থেকে কার্ফু বিদায় নেওয়ার আগেই ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা-সহ পশ্চিমবাংলায় ৩০০ সহযোগী সংস্থা

ও শাখা সংগঠনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ গড়ার কাজে সর্বত্র মিটিং-মিছিল শুরু করল। সে-সব মিটিং-মিছিলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দাবি রাখা হতে লাগল :

(১) ভারতীয় সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ (Secular)' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা নীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। সংবিধানকে মর্যাদা দিতে সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ :

(ক) রাষ্ট্রীয় সমস্ত রকম কার্যকলাপে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

(খ) শিক্ষায়তনগুলোতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রার্থনা, ও পঠন-পাঠনে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা বৃদ্ধিকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(২) ধর্মীয় কার্যকলাপে রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৩) যে রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, সেই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে, নতুবা গোটা দলকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(৪) সরকারি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয়-প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৫) কোনও আবেদন পত্রে আবেদনকারীর ধর্ম জানতে চাওয়া চলবে না।

কোনও রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকলে বা সাম্প্রদায়িকতাকে পালন করার কাজে বা উস্কে দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকলে সংবিধানের ১৯৮৯ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টের ২৯(এ) ধারা বলে ওই রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান আছে।

উপরোক্ত ধারা মতে, দেশের সংবিধানে যে মৌলিক নীতিগুলি আছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সেই মৌলিক নীতিগুলির প্রতি লিখিতভাবে আস্থাজ্ঞাপন করতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। কোনও ক্ষেত্রে কোনও দল এই নীতিগুলি অমান্য করলে নির্বাচন কমিশন ২৯(এ) ধারা বলে সেই রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিতে পারে।

এই মৌলিক নীতিগুলি কী? সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে, 'WE THE PEOPLE OF INDIA, having

solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC and to secure to all its citizens:' অর্থাৎ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল দেশের সংবিধানের মৌলিক নীতি।

আমাদের সমিতি স্পষ্টতই চায়—সরকার সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সংবিধানকে মান্য করে চলুক। একটি সংগঠনের দাবির ধাক্কাতেই সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক মানুষ গড়ার কাজে নিবেদিত প্রাণ হবে, এমনটা কখনওই প্রত্যাশা করি না। আর তাই আমরা চাই উপরের দাবির পক্ষে জনমত গড়তে। এই চিন্তাকে সার্থক রূপ দিতে এই দাবির পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে তুলতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি একদিকে যেমন সভা-সমিতিকে কাজে লাগাতে লাগল, তেমনই এই পাঁচটি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করল ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে।

স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হল, 'কথায় ও কাজে, এতাবৎকাল যে বিপরীত মেরুতে আপনারা অবস্থান করেছেন, তারই পরিণতিতে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে সাম্প্রদায়িক হয়েছে। দেশকে বাস্তবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রূপ দিতে চাইলে এই দাবিগুলির প্রত্যেকটিকে কার্যকর করতে সমস্ত রকম পদক্ষেপ নিন।"

এই দাবিকে আরও ব্যাপকতর আকার দিতে, আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে আবেদন রাখল—"দেশে প্রকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষ গড়ার স্বার্থে এই দাবিগুলোর পক্ষে বৃহত্তর জনমত গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। আপনারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংগঠনের তরফ থেকে উপরের পাঁচটি দাবিকে পেশ করুন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। আপনারা সভা-সমিতিতে, নিজেদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায়, লিফলেটে ও আলাপ-আলোচনায় এই দাবির পক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন। তারই সঙ্গে সচেষ্ট হোন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আরও বেশি বেশি করে দাবিপত্র পেশ করার কাজে জনগণকে

শামিল করতে। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যই পারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ধান্দাবাজি ছেড়ে বাস্তবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ গড়ার কাজে শামিল করতে, আইন মানতে বাধ্য করতে। কারণ শেষ কথা বলে জনগণই।

একটা গভীর দুঃখ ও শঙ্কার কথা জানাই—অযোধ্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী সম্প্রীতির পক্ষে কলম ধরেছিলেন কোনও রকম দিশা দেখাতে, স্বচ্ছ সমাধান বার করে আনতে পারেননি তাঁরাও। বরঞ্চ ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সরকারি মগজ-ধোলাই নীতিকেই সার্থক করতে যেন উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সর্বস্তরে সরাসরি আক্রমণের বদলে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সাত-বাসী কীর্তন জনগণের কানের পাশে গেয়ে গেছেন তাঁরা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটির ডাল-পাতা ছেঁড়া-ছেঁড়ির হুটোপুটিতে মত্ত হলেও শিকড় ধরে টান দেবার চেষ্টা করেননি বুকের পাটার অভাবে। একটু ভুল বললাম? বরং বলি, অনেক বুদ্ধিজীবী শিকড়ে হাত দিতে চাননি রাজনীতির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিজেদের দেওয়া-নেওয়ার' সুমধুর সম্পর্ককে অটুট রাখতে, অনেকে বোধবুদ্ধির অভাবে।

'ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়ার কাজে বুদ্ধিজীবীরা যে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হলেন, সেই দিশাই দেখাল যুক্তিবাদী সমিতি। 'ধর্মীয় মৌলবাদ' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিষয়ে যে ব্যাখ্যা আজ থেকে বছর তিনেক আগে হাজির করেছিলাম আমার লেখায়, তা আমাদের সমিতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে আন্দোলিত করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। সমিতির শ্বেতপত্রে এই ব্যাখ্যাগুলোই হাজির করা হয়েছিল। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাঁচ দফা দাবি। অযোধ্যাকাণ্ডের পর আমাদের হাজির করা ব্যাখ্যা ও দাবি সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল গ্রহণ-যোগ্যতা পেল। পূর্ব-ধারণা থেকে সরে এসে আমাদের সুরে সুরে সুর মেলালেন দুই-বাংলার অনেক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীই। ধর্মীয়-মৌলবাদ রুখতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান ও গণশক্তিতে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কথা বলে তাঁদের দলের এতদিনকার চালানো বিজ্ঞান আন্দোলনের ব্যর্থতা ও জন-বিচ্ছিন্নতার কথা স্বীকার করলেন জ্যোতি বসু এবং পৃথকভাবে সি.পি.এম-এর রাজ্য নেতৃত্ব। ২ জানুয়ারি '৯৩ পশ্চিমবঙ্গ

সরকার আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় আমাদের সমিতি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে যে অনুষ্ঠান করল তাতে গ্রন্থমেলার ইতিহাসে অনুষ্ঠান শ্রোতাদের ভিড়ের সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপিত হল। আর তা হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে আমরা কী বলি— তাই শুনতে। জনদাবিতে গোটা মেলা প্রাঙ্গণের মাইকেই আমাদের বক্তব্য প্রচারিত হল। মেলার শেষ শনিবারে দোকানে প্রত্যাশিত বিপুল বিক্রি মার খেল। মেলা জুড়ে মানুষের ঢল— সকলে আমাদের কথা শুনতে চান। সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অনেক মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী। অনুষ্ঠান চলাকালীন সি.পি.এম-এর কিছু নেতা যেমন গ্রিনরুমে এসে আমাদের বক্তব্য লাগাম পরাতে সচেষ্ট হলেন, তেমনই সি.পি.এম-এর প্রথম সারির কিছু নেতা গ্রিনরুমে এসে আমাদের বক্তব্যের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়ে গেলেন। এই ঘটনা থেকে বুঝলাম—আমরা যদিও কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা নই, তবু আমাদের বক্তব্যের সূত্র ধরে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে কতকগুলো প্রশ্ন, মূল্যবোধ-সম্পর্কিত-প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে।

রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে আমাদের সমিতির হাজির করা পাঁচ দফা দাবি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দাবিগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এবং তারপর পত্রিকাগুলোর পাঠকদের মতামত জ্ঞাপনকারী কলমে বহু চিঠি প্রকাশিত হয়েই আসছে, দাবির সমর্থনে। সুদূর গ্রাম বাংলার খবরের কাগজ 'গাঁয়ের কথা' ও 'গ্রামীণ সংবাদ'-এ প্রকাশিত হল আমাদের শ্বেতপত্রের প্রথম-লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত। ১৯ জানুয়ারি '৯৩ দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে 'পরখ' অনুষ্ঠানে বিনোদ দুয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় 'হেভি-ওয়েট' মন্ত্রী বসন্ত শাঠে আমাদের সমিতির হাজির করা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ টেনে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করলেন, আমাদের সমিতির হাজির করা ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। একটি বিশিষ্ট বাম-রাজনৈতিক দল আমাদের হাজির করা পাঁচ-দফা দাবিকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ওই দাবির সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখছেন। আরও একটি সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক দল আমাদের এই দাবির সমর্থনে জনমত গড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এই জনমত গড়ার কাজে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কী ভাবে চলা যায়, সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালাবার দায়িত্ব

দিয়েছেন তাঁদের দলের প্রথম সারির একাধিক নেতাকে। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা নই ঠিকই, কিন্তু আমরা, আমরাই মিছরি তৈরির আগের সেই মিছরির দানা, যাকে ঘিরে মিছরি জমাট বাঁধে, মিছরির 'ক্রিস্টাল' তৈরি হয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এগিয়ে এলেন পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে জনমত গড়ার কাজে, অবক্ষয়ী—সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল—সংস্কৃতি গড়ার কাজে। সেই সঙ্গে সচেতন প্রতিটি মানুষের কাছে যুক্তিবাদী সমিতি আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল তাদের যুক্তির সারবত্তা—সব দেশে, সব ঋতুতেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।

একটি সত্যিকারের আন্দোলন : দিন বদলের খিদে ভরা চেতনার

যুক্তিবাদী আন্দোলনকে যাঁরা জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে নিয়েছেন, যাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেঁচে থাকার ভাত রুটি, যাঁরা আদর্শের বারুদ ঠেসে শরীরের খোল ভরিয়ে রেখেছে, যাঁরা বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রেমে লায়লা কী মজনু—প্রেমের মূল্য তো তাঁদের দিতে হবেই। প্রেম করব কিন্তু মূল্য দেব না; এ হয় না, হতে পারে না। সে মানব-মানবীর প্রেমই হোক আর দেশপ্রেমই হোক। আদর্শের প্রতি এই প্রেম, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি এই প্রেমই আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে,

আদর্শের বারুদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় নিজের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু শরীরও। এমন আদর্শে নিবেদিত প্রাণ সারা শরীরে বারুদ ঠাসা মানুষ ইতিহাসের পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসে না। এরা তৈরি হয়। আদর্শ এদের তৈরি করে।

এরা আবেগতাড়িত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় টপ করে প্রাণ দিয়ে ফেলে না। এরা উত্তেজনাহীন, আবেগহীন অবস্থাতেও নিজ আদর্শে অবিচল। আবারও বলি এমন মানুষ তৈরি হয়েছে আদর্শকে সামনে রেখেই। আত্মোৎসর্গ ব্যাপারটা এইসব আদর্শবাদীদের কাছে দৈনন্দিন আর দশটা কাজকর্মের মতো এতই স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে তারা কোনও বিশেষ বীরত্ব বা বিশেষ মাত্রা আছে বলে মনে করে না। নিছক কল্পনা থেকে এসব কথা লিখছি না। এসব কথা কলম থেকে উঠে এসেছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে। আন্দোলন করব, শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে আক্রমণ করব, অথচ আক্রান্ত হব না এমন বোকার মতো প্রত্যাশা রাখি না। আক্রান্ত হয়েছি, হচ্ছি, হব।

আজ এক চরম যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলন আন্দোলন খেলায় শামিল না হয়ে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকলে আঘাত আসবেই। এই আন্দোলন যাদের স্বার্থকে আঘাত করবে, যাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে, তারা যে আঘাত হানবেই এবং সে আঘাত হবে অবশ্যই নিষ্ঠুর ভয়ংকর। এই আন্দোলনে প্রয়োজন ব্যাপক জনসমর্থন। শোষিত জনগণ যে-দিন তাঁদের নিজেদের যুক্তিতে বুঝতে পারবেন কুসংস্কারের সঙ্গে শোষণের সম্পর্কটা, সে-দিন যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে, তাতে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্যন্ত আন্দোলিত হবে। সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে হুজুরের তল্পিবাহক সরকার ময়দানে নামবেই নানাভাবে। নামবে অত্যাচার, কুৎসা, চরিত্রহনন, ব্ল্যাকমেইলিং ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে। আজকাল সরকার আর শত্রুদের বিরুদ্ধে শুধু মাইনে করা সেনা, পুলিশ নামায় না। হাজির করে গোয়েবেলস- এর মিথ্যেকে লজ্জা পাইয়ে দেওয়া নানা ফন্দিফিকির, ষড়যন্ত্র। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্বে আপনি এগিয়ে এলে হঠাৎই এক রাতে দেখতেই পাবেন পুলিশ আপনার আস্তানায়। তারপর ভ্যানে তোলা। গুলির শব্দ, আর্তনাদ, সব শেষ। তার ওপর রাত দুপুরে পুলিশের কোনও বড়কর্তা পত্রিকার অফিস ও সংবাদ মাধ্যমগুলোকে ফোনে দারুণ একটা খবর শোনাবেন; কোনও পতিতার ঘরে এক সমাজবিরোধীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আপনার মারা যাওয়ার খবর। অথবা ছড়ানো হতে পারে অন্য কোনও গপ্পো যা সাধারণ মানুষ চেটে পুটে খবেন, সেই সঙ্গে খাওয়া হবে আন্দোলনেরও কিছুটা। ষড়যন্ত্রের শিকারে কত রকমভাবেই না খেলে বিশাল-প্রভাবশালী রাষ্ট্রক্ষমতা। সরকারের একান্ত ইচ্ছেয় সাধুকে চোর বানানো কঠিন কী?

আপনার আমার দাবি জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনার আমার বেঁচে

থাকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পুলিশ ও প্রশাসন এগিয়ে আসবে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের ওপর নির্ভর করে আমাদের আন্দোলন এগোবে এমন অদ্ভুত চিন্তা করলে এখনই সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বাস্তব সত্যকে বুঝতেই হবে। বুঝতে হবে হুজুরের দলের সঙ্গে হুজুরদের অর্থে জেতা সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক এবং সরকারের সঙ্গে পুলিশ ও সেনার সম্পর্ক। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যাঁদের জন্য আন্দোলন, যাঁদের নিয়ে আন্দোলন, তাঁরাই আমাদের আন্দোলনের শক্তি। আমরা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখনই আক্রান্ত হয়েছি জনরোষ আক্রমণকারীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আজ যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন বহু মানুষ তৈরি হয়েই গেছেন, যাঁরা প্রয়োজনে অবলীলায় নিজের হৃৎপিণ্ড পেতে দিতে পারেন শত্রুর গরম সীসায় বিদীর্ণ হতে। দেশপ্রেমই তাঁদের এমন করে গড়েছে।

তবু এরপরও একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলার থেকেই যায়, সেটা হল—আন্দোলন এগোয় উত্থান পতনের পথ ধরে, আন্দোলন অনেক উত্থান পতনের সমষ্টি। আন্দোলনের সংকট মুহূর্তে, প্রয়োজনে পিছু হঠার মুহূর্তে এই সত্যটা স্মরণে রাখলে লড়াই করার প্রেরণা পাওয়া যায়, উজ্জীবিত হওয়া যায়, হারতে হারতেও হারাকে জেতায় রূপান্তরিত করা যায়।

আন্দোলনে যতই বেশি বেশি করে বঞ্চিত মানুষরা অংশ নেবে ততই আন্দোলন ধ্বংসে আক্রমণ তীব্রতর করবে রাষ্ট্রশক্তি। খেটে খাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষদের কাজে লাগাতে 'উগ্রপন্থী' ছাপও মারা হবে লড়াকু আপসহীন আন্দোলনকর্মীদের বুকে-পিঠে। উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার প্রশ্নে ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের পকেটের বুদ্ধিজীবীরাই প্রচণ্ড সোচ্চার। বিপজ্জনক মতৈক্যের জোয়ারে বলিষ্ঠ সত্যটুকু প্রকাশ করতে ভয় পায় অনেকেই। জেনে-বুঝেও এইসব শঙ্কিত কণ্ঠগুলো যা বলতে পারে না, তা হল—উগ্রপন্থীরা তো উল্কার মতন আকাশ থেকে এসে খসে পড়েনি। অবহেলিত বঞ্চিত মানুষগুলোর অধিকার দাবির ক্ষেত্র থেকে উঠেছে এই সমস্যা। উগ্রপন্থী মারতে হবে শুনলে জনসাধারণের অর্থে পোষ্য সরকারি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা জিঘাংসা, কিলার ইনস্টিংক্ট। তারপর তারা আন্দোলনকারী জনগোষ্ঠীর ওপর যে অত্যাচার চালায় তা নাৎসি অত্যাচারকেও হার মানায়। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত নন, তাঁদের একথা শুধু কলমে লিখে বোঝানো যাবে না।

এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ টানছি, ৯১-এর অক্টোবরে হারারে-তে মিলিত হয়েছিলেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র-প্রধানেরা। বহু দেশেই প্রধানরাই ছিলেন ঋণভিক্ষু। ব্রিটেন ও কানাডা প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল- ঋণপ্রার্থী দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষার রেকর্ড দেখে ঋণ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশই। কারণ একটাই—রেকর্ড ঘাঁটলে দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে না বলে চোখের জলে বুক ভাসানো এইসব দেশের ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়—মানবাধিকারকে অতি বর্বরতার সঙ্গে নিষ্পেষিত করার অপরাধে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও দেবেন তাঁদের তাই সচেতন থাকতে হবে, বুঝতে হবে আন্দোলনের শত্রু-মিত্রকে। আন্দোলনকর্মী ও নেতাদের আন্তরিকতা, তাঁদের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি সমুদ্র-গভীর প্রেমই দিতে পারে আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য। এই আন্তরিকতার ও প্রেমের মাঝখানে কখনও আসতে পারে না আপসমুখী কোনও চিন্তা। এই আপসমুখী মানসিকতা দ্বিধাই আপনাকে হিসেবি পা ফেলতে শেখাবে, ক্যারিয়ার গোছাতে শেখাবে। প্রেম কখনও হিসেবি পা ফেলতে শেখায় না।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের সচেতন থাকতেই হবে তাঁদের নেতাদের কাজকর্মের বিষয়ে, যাতে চ্যুতি ঘটলে নজর না এড়ায়।

আন্দোলনকে বিপথে চালিত করতে শোষক ও শাসকরা নানাভাবে প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব এবং কুসংস্কার-মুক্তির কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্থাতে থাবা বসাতে চাইবেই। চাইবেই তাদের মতো করে কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলন খেলায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাতিয়ে রাখতে। সাধারণ মানুষের চেতনা রোধ করতে ওরা এমনটা করবেই। আর সেইজন্য অতি সরলীকৃত পদ্ধতিটি হল— সংস্থার নেতাদের চিহ্নিত করো, তাদের কিনে পকেটে পুরে ফেলো।

যে নেতা নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, তাকে আপনারা—আন্দোলনকর্মীরাই চিহ্নিত করুন, বিচ্ছিন্ন করুন আন্দোলন থেকে। আপনার আমার যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা থাকে, তবেই বুঝতে পারব নেতৃত্ব আমাদের অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে কি না।

কোনও অপছন্দের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে রাষ্ট্রশক্তি সেই আন্দোলনে

ঢুকিয়ে দেয় ট্রয়ের ঘোড়া। যাদের অন্তর্ঘাতে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়। সব দেশের ইতিহাসেই ছড়িয়ে রয়েছে এমন বহু উদাহরণ। বহু থেকে একটিকে তুলে দিচ্ছি। নকশালপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে কোনও কৌশলেই হোক মিশে গিয়েছিল সমাজবিরোধী গোষ্ঠী। আর সমাজবিরোধীদের প্রয়োগ করা হয়েছিল ওই আন্দোলন ধ্বংস করার কাজে। এ বিবরণ রঞ্জিত গুপ্তেরই দেওয়া, যিনি নকশাল দমনকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে পরিচিত।

নকশালপন্থার সমর্থন বা অসমর্থন আমার এই উদাহরণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত এনে বোঝার ব্যাপারটা আরও 'জল-ভাত' করে দেওয়া।

কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে-সব বিষয়গুলো মাথায় রাখা প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সেগুলো হল :

১. সাংস্কৃতিক জগতে শাসক ও শোষকদের একচেটিয়াপনা বন্ধ করতে হবে। নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদেরও সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগাতে। যে-সব গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যম মানুষকে আকর্ষণ করে, তার প্রতিটিকে কাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে পৌঁছে দেব, প্রতিটি মানুষের মধ্যে। মানুষ যেখানে, সেখানেই আমাদের পৌঁছতে হবে আমাদের চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেবার স্বার্থেই। পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখতে হবে, আমরা গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমগুলোকে আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাব, কিন্তু গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমগুলো যেন হুজুর শ্রেণির স্বার্থে আমাদের কাজে না লাগাতে পারে।

যাঁরা মনে করেন বৃহৎ পত্র-পত্রিকায় না লেখাটাই বুঝি লড়াকু মানসিকতার পরিচয়, তাঁরা ভুল করেন, সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেবার লক্ষ্য থেকেই সরে যান। সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মাত্র হয়ে পড়েন। সব সময় এমন চিন্তা যে ভুল ধারণা থেকে উঠে আসে, তাও নয়। অনেক তথাকথিত লড়াকু মানুষকে চিনি, যাঁরা বড় পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করাটা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ বলে সোচ্চারে ঘোষণার পাশাপাশি গোপনে বড় পত্রিকায় 'লাইন' করার চেষ্টা করেন স্রেফ নিজের লেখা ছাপাতে। এঁদের অনেকেই নিজের বিবেক বিক্রি করছেন লেখা ছাপানোর প্রতিশ্রুতি কিনতে। যাঁদের লেখায় ধার নেই, পাঠক-পাঠিকাদের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার আকর্ষণী ক্ষমতা

নেই, তাঁরা বিবেক জামিন রাখতে চাইলেও কেনার খদ্দের জোটে না। এই অক্ষমতা থেকেও অনেক সময় আসে বড় প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি বৈরাগ্য। এ যেন ভিখারির বৈরাগ্য, নপুংসকের ব্রহ্মচর্য।

বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলে আমরা নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু তা বিবেক জামিন রেখে অবশ্যই নয়। সুযোগ নেব আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শকে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই। বড় পত্রিকার মধ্য দিয়ে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে, এটুকু মাথায় রেখেই বলছি সাধারণ মানুষের ধোলাই করা মগজকে পাল্টা ধোলাই করার সামান্যতম সুযোগ ছাড়াও উচিত হবে না।

এরই পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব লেখক তৈরি করতে, সম্পাদক তৈরি করতে স্থানীয়' মানুষদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বাড়াতে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে, তাঁদের ভাববাদ-বিরোধী লেখা-পত্তরের সঙ্গে পরিচিত করাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে নিশ্চয়ই তারা পারবে ভাববাদ-বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি প্রকাশ করতে; তা সে যতই অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, যত কৃশ কলেবরেই হোক না কেন। এখান থেকেই আমরা জ্বালাব মনুষ্য চেতনায় জ্ঞানের আলো। এখান থেকেই আমরা তৈরি করব আমাদের নিজস্ব 'রবীন্দ্রনাথ', আমাদের নিজস্ব 'সত্যজিৎ'।

সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের লেখাপত্তর, বক্তব্য, নাটক ইত্যাদিকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বাড়াতে হলে আমাদের লেখাপত্তরকে এতটাই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে পাঠক-পাঠিকারা আপন তাগিদে ওইসব লেখাপত্তর পড়তে উৎসাহিত হন। যে মানুষদের সামনে পৌঁছতে চাইছি, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছি, তাদের ভালোলাগা না লাগার খবরও আমাদের রাখতে হবে; বুঝতে হবে তাদের মনস্তত্ত্ব।

রাজনৈতিক স্লোগানধর্মী নাটক, গল্প, উপন্যাস মানুষকে সাধারণভাবে টানতে পারছে না। পুজো প্যান্ডেলে মার্কসবাদী সাহিত্যের স্টলে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভিড় যতটা থাকে ক্রেতাদের ভিড় ততটা থাকে না। এর একটাই কারণ, সাধারণ মানুষকে এসব আকর্ষণ করতে পারছে না। এই জাতীয় অনেক বইই ভারী ভারী শব্দে এতই ভারাক্রান্ত যে সাধারণ মানুষ সভয়ে ও-সব লেখাপত্তর এড়িয়ে চলেন।

আমরা 'ছোটি-বড়ি বাতেঁ'-এর মতন অতি সফল টি.ভি. সিরিয়াল দেখেছি, যেখানে হাঁচি কাশি টিকটিকির ডাকের মতন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য এসেছে জমাটি কাহিনির সঙ্গে। আমরা 'রজনী' হিন্দি টি. ভি. সিরিয়ালের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জনের ইতিহাসও জানি। রজনীর বিপুল জনপ্রিয়তায় নায়িকা প্রিয়া তেণ্ডুলকরকে তাঁর পরিচিত মানুষরাও ডাকতে শুরু করেছিলেন 'রজনী' নামে। সেখানেও এসেছে বুজরুকের ভান্ডাফোড় করার কাহিনি। 'জ্ঞান দিচ্ছে' বলে মানুষ, মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। গ্রহণ করেছে। বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাই এগুলোকে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে।

ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের গল্প আমরা জানি, আমাদের ভাববাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের অবস্থাও অনেকটা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। আমাদের না আছে একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, না একজন বিভূতি বাঁড়ুয্যে। ফলে আমাদের অনেকের হাতেই নিপীড়িত মানুষের কথা বেরিয়ে আসছে স্লোগান হয়ে। পরমান্ন রাঁধতে গিয়ে আমরা যদি লঙ্গরখানার খিচুড়ি রেঁধে বসি, তাহলে মানুষ মুখে তুলবে কেন?

শহরে গ্রামে যেদিকেই তাকান দেখতে পাবেন সিনেমা ও ভিডিওর রমরমা ব্যবসা। শহরের বস্তিবাসী থেকে গ্রামের গরিব চাষার প্রধান বিনোদন এই সিনেমা, ভিডিও। ওরা হলে এসে ভুলে যেতে চায় ওদের সমস্ত বঞ্চনার কথা, দৈনন্দিন দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। ওরা আসে সব কিছু ভুলে কিছুক্ষণের আনন্দে ডুবে থাকতে। হতদরিদ্র মানুষগুলোকে নিয়ে তোলা সিনেমা তাই গরিব মানুষদের তেমন টানে না।

'রজনী'তে গরিবদের নিয়ে আকর্ষণীয় কোনও প্যানপ্যানানি ছিল না, ছিল সমাজের নানা সমস্যা এবং সেইসব সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে মোকাবিলা করার শিক্ষা।

'ছোটি বড়ি বাতেঁ' তে পাঁজি-পুঁথি-মঘা-ত্র্যহস্পর্শ-বারবেলা মান্য করা, বৃহস্পতিবার ও শনিবার ক্ষৌরকর্ম না করা, পিছু-ডাক, হাঁচি, টিকটিকির ডাক ইত্যাদি মেনে চলাকে হাসির খোরাক করা হয়েছে এবং দর্শকরা তা দারুণভাবে উপভোগ করেছে। এই সিরিয়ালের চরিত্রগুলো কিন্তু শোষিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেনি। কিন্তু সিরিয়াল থেকে উঠে এসেছিল আমাদেরই কথা। এই ধরনের কুসংস্কার মেনে চলাটা নেহাতই হাসির খোরাক হওয়া—এই প্রচার লাগাতারভাবে চালাতে পারলে এই সব কুসংস্কার না মানাটাই বহু মানুষের 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হয়ে দাঁড়াত।

আমার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে উপন্যাসে নাটকে গরিব অত্যাচারিত মানুষদের চরিত্রগুলোকে নিয়ে আসা নিয়ে সামান্যতম বিরোধিতা করছি না। এই সব চরিত্র-চিত্রণ করতে গিয়ে বিষয়বস্তু আকর্ষণ হারালে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—এই সত্যটুকুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি শুধু। বলতে চাইছি— লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে নানা আকর্ষণীয় ভাবেই হাজির করা যেতে পারে আমাদের বক্তব্য।

২। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশের জনসমষ্টির সিংহভাগই বই পড়ার মতো লেখা-পড়ার সুযোগলাভে অক্ষম। এদের কাছে আমরা আমাদের লেখাপত্তর নিয়ে হাজির হতে পারব না। আমরা সাধারণ মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র আমাদের লেখাপত্তরের ওপর নির্ভর করলে দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি পিছিয়েই থেকে যাবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি নাটক, যাত্রা, গান, এবং 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য ফাঁস করে।

আমরা সকলের কাছেই হাজির হব। যেখানেই মানুষ সেখানেই হাজির হব। যে সংস্থাই আমন্ত্রণ জানাক, আমরা যাব—তা সে দক্ষিণ, অতিদক্ষিণ, বাম, অতিবাম—যেই ডাকুক না কেন। যুক্তিবাদ প্রসারে ব্রতী সংস্থাগুলোর একটি জরুরি কাজ হবে তাদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহায়তায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জন-চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং একই সঙ্গে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও নতুন নতুন মানুষকে এই আন্দোলনের শরিক করা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। ভাববাদী বইপত্তরের তুলনায় ভাববাদ-বিরোধী বা যুক্তিবাদী বইপত্তরের সংখ্যা অতি নগণ্য। ভাববাদী মানসিকতা ঠেকাতে ও যুক্তিবাদী চেতনা বাড়াতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাজির করতে হবে যত বেশি করে সম্ভব যুক্তিবাদী বইপত্তর। এই দায়িত্ব পালন করতে হবে আপনাকে আমাকে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে। আসুন আমরা আজই কেন প্রতিজ্ঞা করি না— শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে যে সংস্কার-মুক্তির প্রয়োজন তারই স্বার্থে আমরা বেঁচে থাকার জন্যেই প্রয়োজন ভেবে সংস্কার-মুক্তির বই কিনব, বই পড়াব, বই পড়ব, এবং বই উপহার দেব।

৪। যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল সংস্থা ও গণসংগঠনগুলোর একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত কর্মীদের তৈরি করে তোলার জন্য নিরন্তর 'স্টাডি ক্লাস' করা। কীভাবে স্টাডি ক্লাসগুলো চালাতে হবে, এই নিয়ে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি বলে আবার বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না।

৫। কোনও সাংস্কৃতিক বা যুক্তিবাদী সংস্থা কোনও ধরনের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলে বা কোনওভাবে আক্রান্ত হলে তাঁরা সমমনোভাবাপন্ন মানুষ ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করুন। একইভাবে কোনও আক্রান্ত সংস্থা যোগাযোগ করলে সমস্ত রকমভাবে আপনারা প্রত্যেকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই-এ জয় ছিনিয়ে নিয়ে আসুন। যদি সংস্কারের শেকল ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত হন— অঙ্গীকারবদ্ধ রইলাম আমাদের সমিতি তার সমস্ত শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে।

৬। গণ-সংগঠনগুলোর কর্মীদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, এবং এমন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগুতে হবে যাতে নেতৃত্বের চ্যুতি, ভ্রান্তি বা বিপথগামিতার ক্ষেত্রে সদস্যরা নেতাদের সমালোচনা করতে পিছু-পা না হয়।

৭। সমালোচনা যিনিই করবেন তাঁকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে সমালোচনার লক্ষ্য যেন হয় সংগঠনের উন্নতি এবং আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি।

সমালোচনা হবে খোলাখুলি এবং অবশ্যই সংগঠনের মধ্যে। কোনও বিষয়ে আলোচনায় মতপার্থক্য অবশ্যই থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতই প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে সংগঠনের স্বার্থে। সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই শুধু নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সংগঠনের বাইরে কেউ এই বিষয়ে সমালোচনা করলে সেটা সংগঠন-বিরোধী কাজ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সংগঠনের বাইরে সমালোচনাকারীকে প্রয়োজনে সংগঠনের স্বার্থেই সংগঠন থেকে বের করে দিতে হবে, তা সেই সমালোচক সংগঠনের যত উচ্চ-পদাধিকারীই হোন না কেন।

মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার দরুন অনেক সময়ই সমালোচনা হয়ে পড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন, কখনও সমালোচনা উঠে আসে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে, কখনও ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে। সমালোচনা হওয়া উচিত সংগঠনের স্বার্থে ইতিবাচক। শুধুমাত্র নেতিবাচক বা নাকচ করে দেবার সমালোচনা অর্থহীন

হয়ে পড়ে, যদি না পরিবর্ত পথনির্দেশ দেওয়া হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা সংস্থায় বিশৃঙ্খলাই শুধু টেনে আনতে পারে।

৮। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে কোনও শক্তির সাধ্য নেই মগজ ধোলাই করে বিপথে চালিত করে। সংগঠনের প্রয়োজনেই নেতৃত্বের অবশ্য কর্তব্য আন্দোলনকর্মীদের ধাপে ধাপে শিক্ষিত, নিবেদিত প্রাণ করে তুলে প্রত্যেককে এক একজন সংগঠক, সংগ্রামী করে তুলে তাঁদের দৃঢ় মতাদর্শগত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া। মতাদর্শগত ভিতই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে আন্দোলনকর্মীদের চালিত করবে।

৯। সংগঠন যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠবে তাঁরাই সংগঠনকর্মী বা আন্দোলনকর্মী। আর নেতা তিনি, যিনি নিজে যে কোনও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং আন্দোলনকর্মীদের বিশ্লেষণ-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম। এরই পাশাপাশি নেতাকে হতে হবে সৎ, আবেগহীন, আত্মবিশ্বাসী, বিনয়ী, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে সক্ষম, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন ও কৌশলগত দিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

ভারী ভারী নাম বা বড় বড় ডিগ্রি দেখে নেতা বাছবেন না। নেতা বাছুন কাজের মানুষ বিচার করে। যে যত বেশি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে, যত বেশি আন্তরিক হবে, ততই সে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্বের গুণগুলোকে অতি স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করে নেবে।

১০। আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে অনেক সময়ই এই জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে— আমাদের আন্দোলনকে আঘাত করতে যদি রাষ্ট্রশক্তিই হাজির হয়, তবে কি আমরা আন্দোলনকে শেষ জয় এনে দিতে পারব? অথবা কখনও যদি এমন প্রশ্ন হাজির হয়, গোটা ভারত বা গোটা পৃথিবীর মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হয়ে তাদের শোষণের পদ্ধতিগুলো ধরে ফেলে বর্তমান সমাজ-কাঠামোই পাল্টে দিতে লড়াইয়ে শামিল হবে, অধিকার ছিনিয়ে নিতে সোচ্চার হবে— এ এক অবাস্তব কল্পনা নয় তো? তখন প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টির কুয়াশা কাটিয়ে আলো দেখাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরুন আমাদেরই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী ইতিহাস। বুঝিয়ে দিন আন্দোলনের শরিক যেখানে কোনও জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ, সেখানে আন্দোলন শেষ করার সাধ্য পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রশক্তিরই নেই। একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে যুক্তিবাদী চেতনার আলোকে আলোকিত করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কোনও কাজ নয়। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ

করুন, আন্দোলনকর্মীরা উদ্দীপ্ত হলে জনগণকে সচেতন করা, সংগঠিত করার কাজটা অতি সহজ হয়ে যায়।

১১। সাধারণভাবে 'ধর্ম', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'দেশপ্রেম', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি বিষয়ে যেসব ধ্যান ধারণা শোষকশ্রেণি তাদের তাঁবেদার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে প্রচার করে চলেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি হাজির করুন। ওদের যুক্তিকে সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক চিন্তাগুলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করুন। এতদিনকার কুযুক্তির বিরুদ্ধে কোনও সুযুক্তি হাজির হয়নি বলেই সাধারণ মানুষ মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়েছেন। সুযুক্তি পেলে সাধারণ মানুষ তা অবশ্যই গ্রহণ করেন, আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা তাই বলে।

১২। শুধু নাকচ বা বর্জনের ওপর কোনও কিছুর স্থায়ী ভিত গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমান সমাজের নেতিবাচক দিকগুলোর নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, জনমত গড়তে হবে। আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা তাই বলে।

আমাদের অশ্রদ্ধা পুরনো সবকিছুর প্রতি নয়, অশ্রদ্ধা যুক্তিহীনতার প্রতি। আমাদের শ্রদ্ধা যা নতুন তার প্রতি নয়, আমাদের শ্রদ্ধা যুক্তির প্রতি।

১৩। যুক্তিবাদী আন্দোলন সঠিক পথে চললে যাদের স্বার্থে এই আন্দোলন আঘাত করবে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তারা প্রত্যাঘাত হানবেই। এই প্রত্যাঘাত রোখার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ। তারই পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে সংগঠন যদি বাস্তবিকই সংগ্রামী মানুষদের নেতৃত্ব দিতে যায়, তবে সেই সংগঠনের অনেক কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

গোপন সংগঠন সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন সংগঠনের কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করলেই বুঝি 'গোপন সংগঠন' হয়। গোপন সংগঠন চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়েও করতে হয় না। সংগঠনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এ'সব কোনও কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বরং সাধারণভাবে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা আত্মগোপন করলে সাধারণ কর্মীদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সাহিত্যিক ইত্যাদি বহু পেশার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য একদল কর্মী তৈরি করতে হবে। এঁরা বিভিন্ন পেশার মানুষ হতে পারেন, এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে প্রতিটি লড়াইয়ে জনসমর্থন পাওয়া সহজতর হবে।

১৪। গণ-সংগঠনসর্বস্ব আন্দোলনের ক্ষেত্রের যে-সব অসুবিধে দেখা দিতে পারে, সেগুলো নিয়েও অবশ্যই সচেতন থাকা প্রয়োজন :

ক) আন্দোলন তীব্রতর হলে শোষক ও শাসকশ্রেণি সমস্ত গণ-সংগঠনগুলোকেই চরবৃত্তির কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। গণ-সংগঠন নেতাদের লোভ, ভয়, ইত্যাদির দ্বারা কিনে ফেলার চেষ্টা চলে।

খ) গণ-সংগঠনের অনেক নেতৃত্বই কম ত্যাগ ও কম ঝুঁকি নিয়ে বেশি রকম আত্মপ্রচারে উৎসাহী হয়ে পড়ে।

গ) সরকারি-বেসরকারি সাহায্য ও প্রচারের মোহে বাঁধা পড়ে অনেক নেতৃত্বই কথায় ও কাজে দুই মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করেন। নেতা বিক্রি হয়ে যাওয়ায় সংগঠন ভুল পথে চালিত হতে থাকে, প্রকৃত আন্দোলনের শত্রুতা করতে থাকে।

ঘ) গণ-সংগঠনের নেতারা অনেক সময় যুক্তিবাদী আন্দোলনের আদর্শগত দিকটা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ না করে কিছুটা হুজুগে আন্দোলনে ঢুকে যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে।

১৫। আন্দোলনে শামিল সমমনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব, যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল সংস্থাগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা। সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে প্রতিটি আক্রমণের, প্রতিটি সমস্যার, মোকাবিলায় সমস্ত সংগঠন একত্রিত হতে পারবে অতি দ্রুত। সকলে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়লে লড়াই জেতা, সমস্যা ডিঙিয়ে যাওয়া সহজতর হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি বহু সংগঠনের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। আরও বেশি বেশি করে সংগঠন এগিয়ে এলে প্রত্যেকের কাছেই উদ্দেশ্য পৌঁছনো সহজতর হবে।

কোনও সংগঠনের স্বাধীনতায় হাত না দিয়েই যুক্তিবাদ প্রসার, কুসংস্কারমুক্তি, মানবাধিকার, মরণোত্তর দেহদান, স্বাক্ষরদান, প্রগতিশীল নাটক,

গান এবং আরও কিছু 'কমন' কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের সম্মিলিত ও পরিকল্পিত প্রয়াসই এমন একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, যাতে বর্তমান সমাজের মূল কাঠামোই আন্দোলিত হতে পারে, নাড়া খেতে পারে। আর তারপর—আন্দোলনে শামিল জনগণই সৃষ্টি করবে এক নতুন ইতিহাস, জাগরণের ইতিহাস।

১৬। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে জোরদার করতে আসুন না কেন, প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারকামী মানুষ ও সংস্থা বছরের একটি দিনকে, ১ মার্চ দিনটিকে 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালন করে যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করি। এই দিনটিতে আমরা প্রত্যেকে অন্তত সংস্কার মুক্তির সহায়ক, যুক্তিনির্ভর কিছু লিখি, কিছু পড়ি, অথবা কিছু আলোচনা করি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী সংস্থাগুলো ১ মার্চ দিনটি 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি আমিই পারি ১ মার্চকে আক্ষরিক অর্থে 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস' করে তুলতে।

আন্দোলনে জোয়ার আনতে আন্দোলনকর্মীদের এইসব বিষয়ে সচেতনতা ও আন্তরিকতার কোনও বিকল্প নেই।

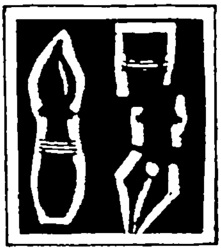

ভাঙা ও গড়া : এই খেলা ভাঙার খেলা শুধু নয়

মানুষ সামাজিক জীব। বহু মানুষকে নিয়েই একসঙ্গে চলতে হয় প্রতিটি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে। এই একসঙ্গে চলার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে নানা নিয়ম-নীতি-আইন। এই গড়া কখনওই শুধু 'নির্মাণ' নয়। অনেক-ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছনো।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে সতর্ক নজর দিলে দেখতে পাব অতীতে

সমাজের নিয়ম-নীতি-আইন তৈরি করেছে গোষ্ঠীপতি, রাজা, শাসককুল। গোষ্ঠীপতি, রাজা ও শাসককুল শুধু শাসনই চালাত না, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ হয়ে উঠে শোষণও চালিয়েছে। এই শোষণ প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগীর অভাব হয়নি। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে এরা শাসকদের চাটুকারে পরিণত হয়েছে, শাসকদের সঙ্গে মিলে-জুলে শোষণ চালিয়েছে। এ-ভাবে এক সময় সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে-শোষক ও শোষিত। এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক ও শাসক মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কখনও শোষকরা তাদের পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে এমন মানুষদের, যারা শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে। কখনও বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে উভয়ে উভয়ের স্বার্থ রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি ও শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য বহু নিয়ম-নীতি-আইন সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেক নিয়ম-নীতি-আইনই শৃঙ্খলভার হয়ে চেপে বসেছে শোষিত শ্রেণির উপর। এই শৃঙ্খলভার মুক্ত হতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ নিয়ম-নীতি-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই পারে, প্রতিবাদ করার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। এই প্রতিবাদই সার্থক রূপ পেতে পারে, সমাজ অগ্রবর্তীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে, যদি প্রতিবাদী পরিবর্ত কোনও সুন্দর নিয়ম-নীতি-আইনের হদিশ দিতে পারে এবং তার প্রতি জনসমর্থন ব্যাপকতা পেতে থাকে। এ-ভাবে পুরোনো আইন ভেঙে নতুন আইন হয়েছে— এমন দৃষ্টান্ত কম নেই।

আমরা যখন নিয়ম ভাঙার নেশায় মাতি তখন সমাজের নিয়মের উপর মানুষের প্রতিভার দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ থেকেই ঘটে অগ্রগতি। আবার প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিভার দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ থেকেই ঘটে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। আর একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারি মানুষ এক সময় প্রকৃতির নিয়মকে ভেঙে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে। প্রকৃতির অস্ত্র দিয়েই প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙতে চেয়েছে। নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙতে চেয়েছে। এই ভাঙার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান এগিয়েছে, প্রজ্ঞা এগিয়েছে, মানুষ এগিয়েছে। এই ভাঙা-গড়ার সংগ্রামে সুফলের সঙ্গে কুফলও এসেছে কখনও কখনও। মানুষ এ নিয়ে চিন্তা করেছে প্রকৃতির পরিবর্তন এতদূর ঘটানো ঠিক হয়েছে কি না, এখানেই নতুন করে ভাবনা-চিন্তার জন্য বিশ্রাম নেবে কি না, অথবা ছেদ টানবে কি না। এ জিজ্ঞাসা থেকে, এ দ্বন্দ্ব থেকে গতিশীল

মানুষের মুক্তি নেই। একই ভাবে সমাজের নানা নিয়ম নানা ছক পাল্টে দিয়ে নতুন নিয়ম নতুন ছক গড়ার চেষ্টাতেও সমান সচেষ্ট মানুষ। সমাজ তাই নিয়ত গতিশীল। সে গতিশীলতা কোন্ গোষ্ঠীর পক্ষে সুফল ও কোন্ গোষ্ঠীর কুফল কখন বয়ে আনবে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজবিন্যাস পাল্টায়, ইতিহাস এগোয়—এ চূড়ান্ত সত্য। শোষক ও শোষিত উভয়েই নিয়ম-নীতি-আইন ভাঙা-গড়ার খেলায় মাতে। কেউ জেতে কেউ হারে। কেউ এগোয়, কেউ পিছোয়। মানুষ অনেক সময়ই নিয়ম ভাঙে সুন্দর নিয়ম গড়ার স্বপ্ন নিয়ে।

মানুষেরই তৈরি সমাজের নিয়মকে মানুষের অগ্রগমনের স্বার্থে ভাঙার, পাল্টে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা মানুষেরই আছে। কিন্তু ভাঙার পর যা গড়ে উঠবে বা পড়ে থাকবে, তা সুন্দর কি অসুন্দর হবে সেটা নির্ভর করবে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী মানুষদের দক্ষতা-শৃঙ্খলাবোধ বা অদক্ষতা-উচ্ছৃঙ্খলার উপর, দর্শনের উপর।

আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় এমন অনেক রীতি-নীতি-নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে যার সুযোগ নিয়ে দেশের পুলিশরা আজ সবচেয়ে সংগঠিত মস্তান বাহিনী, রাজনীতিকরা 'অসৎ'-এর সমার্থক শব্দ, দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী, ন্যায়হীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে একগাদা কাদা-নরম-মেরুদণ্ডী-প্রাণী সৃষ্টিতে তৎপর। এমন এক সুষমাহীন সমাজে কিছু মানুষ গ্লানির শিকার। কিছু মানুষ বিদ্রোহের আগুন জ্বালে, কিছু মানুষ রক্তপাত, আত্মত্যাগ ও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালাতে চালাতে অপেক্ষায় থাকে ক্রান্তির মুহূর্তের। এই ক্রান্তি আসতে পারে কিছু শর্ত পূরণের পথ ধরেই। এই শর্ত পূরণের জন্যেও প্রয়োজন কিছু নিয়ম-নীতির—হোক না সে নতুন নিয়ম-নীতি। এই নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ক্রান্তির প্রস্তুতি হবে ব্যর্থ। আবার আর এক দিক থেকে এও সত্য—নতুন নিয়ম-নীতি গড়তে গেলে পুরোনো নিয়ম-নীতি ভাঙতেই হয়।

গড়ার নিয়ম জানা না থাকলে শুধু ভাঙার খেলা খেলে কখনওই কোনও আন্দোলন, কোনও সমাজ অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এই বক্তব্যের সমর্থনে বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। বহু থেকে একটিকে বেছে নিতে আমরা আমাদের দেশের সত্তর দশকের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে পারি। ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করে চরম স্বৈরাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন। ইন্দিরা গান্ধির অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে জনতা পার্টি। জনতা পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোতে ইন্দিরা গান্ধির অন্ধকারময় দিকগুলোর কথা জনতার কাছে উদ্ভাসিত হতে লাগল। পরিণতিতে যা ঘটল তাকে অবশ্যই বলতে হয়-ইন্দিরা গান্ধিকে ক্ষমতায় ফিরতে না দেবার জন্য তীব্র গণ-প্রতিরোধ। পুলিশ, মিলিটারি ও গুন্ডাবাহিনী দিয়ে বুথ দখল করে 'নির্বাচন' নামক প্রহসন চালাতে গিয়ে বিপুল জন-প্রতিরোধে সে প্রহসন ফুৎকারে ছত্রখান্ হয়ে গেল। অসম্ভব জেদি এক জন-প্রতিরোধের মুখে ইন্দিরার দিল্লির তখ্তে বসার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। লোক সভায় এমন বিপুল সংখ্যাধিক্যতার কথা দিবাস্বপ্নেও ভাবেনি জনতা পার্টি। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির অন্ধকারময় রাজনীতিতে ভাঙন ধরিয়ে কী গড়তে পেরেছিল সে দিনের জনতা সরকার? কিছু নয়। ওরা ভাঙার নিয়মটাই শুধু জানত। গড়ার নিয়ম ছিল অজানা। ফলে জনতা পার্টির ইন্দিরা বিরোধী জঙ্গি কথা-বার্তায় মুগ্ধ জনগণ যে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল জনতা পার্টি ঘিরে সে স্বপ্নের রং দ্রুত ফিকে হয়ে গিয়েছিল জনতা সরকারের গঠনমূলক কাজকর্মের অভাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অবিরল-ধারায় স্থাপিত হয়েই চলেছে যেখানে বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সমালোচনার ঝড় তুলে ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু তারা ইতিবাচক কিছু করার অক্ষমতায় জনতার ভালোবাসা থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

জনগণের মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার ছাপ ফেলতে হলে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রগামিতা বজায় রাখতে হলে ভাঙার বিশৃঙ্খলার পর গড়ার শৃঙ্খলার প্রয়োজন, শিক্ষাক্ষেত্রে-কর্মক্ষেত্রে-লেখায়-রেখায়-বিপ্লবে সর্বত্র প্রয়োজন। অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত ছবি আঁকিয়ে হতে গেলে 'রিয়ালিস্টিক' ছবি আঁকায় সিদ্ধহস্ত হতে হয়।

এই প্রসঙ্গে এক পত্র-লেখকের কথা মনে পড়ছে, যিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তি করে অবিরল ধারায় সুতীক্ষ্ণ আক্রমণ চালিয়েই চলেছেন। ওঁর শাণিত আক্রমণগুলো নেমে এসেছে রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক, অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক,

লেখক ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ ও সংস্থার উপর। এইসব প্রকাশিত পত্রের অসাধারণ শ্লেষাত্মক ভাষা ও যুক্তির অবতারণায় তিনি বহু পাঠক-পাঠিকার কাছেই আজ প্রজ্ঞার প্রতীক। ঝড় তোলা এইসব চিঠি-পত্র পড়ে একাধিক পত্র-পত্রিকা তাঁকে দিয়ে প্রবন্ধ লেখাতে উৎসাহিত হয়েছে। সম্পাদকের অনুরোধকে সম্মান জানাতে লিখতে বসে কখনও অনেক পৃষ্ঠা ও সময় নষ্টের পর ওই পত্র-লেখক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন— বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে যে ইতিবাচক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, লেখায় সেই ঘাটতি অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কখনও বা লেখা সম্পাদকের হাতে তুলে দেবার পর সম্পাদকই বাতিল করেছেন ইতিবাচক সারবস্তুর অভাবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলে বহু মানুষকেই হয়তো আবেগতাড়িত করা সম্ভব, কিন্তু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকলে সেই আবেগকে সমাজের অগ্রগতির পক্ষে গতিশীল করা অসম্ভব।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ সচেতনতা গড়ার প্রয়োজনে সমাজের পচন-ধরা বহুতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন সচেষ্ট হন তখন সচেতনতার আলোয় সদ্য উদ্ভাসিত মানুষগুলো তাঁদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ভাঙা-গড়ার খেলা চালিয়ে নিজেরাই গড়ে তুলতে থাকে শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যূহ—আক্রমণ হানার কৌশল—এ কথা আমরা শিখেছি ইতিহাস থেকে।

কিন্তু এ কথাও আমরা ইতিহাস থেকেই শিখেছি—জনগণ তীব্র শোষণের শিকার হলেও নেতৃত্বের ইতিবাচক ভূমিকার অভাবে বহু আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের প্রাণদান সত্ত্বেও একটা সংগ্রাম কী ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ সবকটি বামপন্থী দল রাজ্যস্তরে শাসন ক্ষমতা দখল করার পর স্লোগান তুলেছিল-সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতা কাজে লাগানো হবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত চিন্তার রাজ্যের ভিত্তিভূমিতে আঘাত করে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে ষাটের দশকে শুরু হল নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম। রাজনৈতিক দিক থেকে শুধু নয়, ভারতীয় সমাজ জীবনকেও এই সংগ্রাম প্রভাবিত করেছিল। উজ্জীবিত

করেছিল অনেক আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীকে ও নিপীড়িত বহু মানুষকে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতৃত্ব স্পষ্ট ঘোষণায় জানাল, ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট দলগুলোর প্রগতিশীল মুখোশের আড়ালে রয়েছে বিপ্লব বিমুখ, মধ্যবিত্ততার গ্লানিতে আচ্ছন্ন মুখের সারি। ঘোষিত হল মেকি বামপন্থীর বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রক্তাক্ত সংগ্রাম। আছড়ে পড়ল এক অভাবনীয় ভাঙার প্রক্রিয়ার ঢেউ। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার ডাক দেওয়া হল। না ভেঙে তৈরি করা যাবে না নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থে, শ্রেণিহীন সমাজের স্বার্থে বৈপ্লবিক নতুন শিক্ষাধারা—এই ঘোষণাকে সামনে রেখে আঘাত হানা শুরু হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেই তো চলবে না, পরিবর্তে কেমন ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা কী ভাবে গড়ে তোলা হবে— এই সরল প্রশ্নটির কোনও উত্তর পেল না সাধারণ মানুষ।

আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রভাবিত করতে শাসকশ্রেণি ও শোষকশ্রেণি যাদের কর্মকাণ্ডকে মহান বলে প্রচার চালিয়েই চলেছে নিজেদের স্বার্থে, সেই হুজুরের চাপানো সংস্কৃতির পরিবর্তে মজুরদের সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হুজুরদের চাপানো সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরাতেই হবে। এ যেন জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি হওয়া। হয় বাঘ আমাকে খাবে, নতুবা আমি বাঘকে। একজনের মৃত্যুর মধ্যেই রয়েছে অন্যজনের জীবন। শাসকশ্রেণি যাঁদের মহান মনীষী বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সেই সব মনীষীদের সীমাবদ্ধতা, যুক্তিহীনতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা কোথায়, এই বিষয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা না করে, বিকল্প হিসেবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কারা সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় হবেন এই বিষয়ে কোনও মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা না করে আন্দোলনকারীরা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তিভাঙার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। হাটে-মাঠে-কারখানায় সর্বত্রই যে নিয়ম ভাঙার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তাতে পরিবর্ত গড়ার দিশার অভাব ছিল। স্বভাবতই আর প্রতিটি নেতিবাচক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে পরিণাম, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অনেক রক্ত ঝরানো অনেক আত্মোৎসর্গের পরও এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছিল নেতৃত্বের নিয়ম গড়ার ব্যাকরণ জানা না থাকায়।

এরপর যে প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে বহু মুখ থেকে বেরিয়ে আসার

সম্ভাবনা, তা হল—নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার পরও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘকাল গদি দখলে রাখা কি এই লেখকের বক্তব্যকে মিথ্যে প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

আর প্রতিটি সৎ, সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন, মুক্ত-মনের মানুষের মতো এই লেখকও সত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে নারাজ। সত্যের খাতিরে প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেই হয়—কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সহ বামপন্থী দলগুলো রাজ্যস্তরে শাসন ক্ষমতা দখল করার পর সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার, শোষণমুক্তি ঘটানোর সার্বিক কোনও প্রচেষ্টা অতীতেও করেনি, বর্তমানেও করছে না। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনচেতনাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনমুখী করার চেষ্টা করলে কতটা কার্যকর হত, তা বিচারে বসার সুযোগই আমাদের নেই—যেহেতু জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামান্যতম চেষ্টাই বামপন্থীদের তরফ থেকে হয়নি।

এমন কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে পারেন—এই দেশের সাংবিধানিক কাঠমোর মধ্যে থেকে জনচেতনাকে শোষণমুক্তির আন্দোলনমুখী করার চেষ্টা একান্তই অবাস্তব।

কথাগুলোকে নিপাট মেনে নেওয়া বেজায় মুশকিল, যেহেতু এই লেখকের ঘাসে পা দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা অন্য কথাই বলে। আমার মতোই বহু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীর কাছে একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যুক্তিবাদী সমিতি উদ্ভাসিত করেছে, এই দেশের সংবিধানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বহু মানুষের মধ্যে চেতনার আগুন জ্বালাবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে। যুক্তিবাদী সমিতির নেতৃত্ব জানে দেশের সংবিধান রচিত হয়েছে শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষার চিন্তাকে প্রধানত মাথায় রেখে। এও জানে— শেষ কথা বলে জনগণ। জনচিন্তাকে সঠিকভাবে চালিত করতে পারলে যে অসাধারণ শক্তির সৃষ্টি হয় তা শুধু সংবিধান কেন, রাষ্ট্রশক্তির শিকড় ধরেই টান মারার ক্ষমতা রাখে।

সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে কাজ যুক্তিবাদী সমিতি করতে পারছে, সে কাজ করতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ বামপন্থী দলগুলোর অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়। বরং তারা যুক্তিবাদী সমিতির চেয়ে শত-সহস্রগুণ বেশি গতি সঞ্চারিত করতেই পারত, পারত জনচেতনাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনমুখী করতে, যদি বাস্তবিকই করার ইচ্ছাটা আন্তরিক হত। রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর বামপন্থী দলগুলো যখনই কোনও ডাক দিয়েছে, গ্রাম-শহর

থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই মানুষ এসেছে সভায়-মিছিলে-আন্দোলনে। এ-ভাবে যতই বছর গড়িয়েছে বঞ্চিত মানুষদের সুখস্বপ্নকে সরিয়ে দিয়ে দখল নিয়েছে নিরাশা—আর কত সহযোগিতা করতে হবে যাতে দেখা যাবে সমাজতন্ত্রের আলোক মিনার? এই প্রশ্ন জেগেছে বামপন্থী সরকারের সঙ্গে এককালে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে।

রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ বামপন্থী দলগুলো কথা দিয়েও কথা রাখেনি, ক্ষমতার গদিতে বসে ক্ষমতার মধু খেতে আগ্রহী নেতার সংখ্যাধিক্য হেতু। ওই নেতারা কখনওই চাননি বঞ্চিত মানুষদের জনচেতনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবমুখী করে গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের কবর নিজে খুঁড়তে। দুর্নীতির শাঁসে-জলে পরিপুষ্ট নেতারা এক সময় হয়ে পড়েছে শোষক দলের সঙ্গী রাষ্ট্র-শক্তি।

এরপর আবার সেই প্রশ্নটাই ঘুরে আসবে—শাঁসে-জলে পরিপুষ্টদের ভিড়ে ঠাসা এই দল নেতিবাচক রাজনীতির খেলা চালিয়েও কী করে ক্ষমতায় টিকে আছে? জনগণ তো এই প্রাবন্ধিকের সূত্র মতো ওদের ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে না?

কারণ দুটি। এক : বামপন্থীদের সব চেয়ে কাছের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসিরা নেতিবাচকতায় বামপন্থীদেরই তুল্যমূল্য; অর্থাৎ সাধারণের চোখে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থান যেন টাকার এপিঠ-ওপিঠ। ফলে নিরাশার গভীরে ডুবে থাকা বঞ্চিত মানুষরা আজ এক পক্ষকে হঠিয়ে অন্য পক্ষকে ক্ষমতায় আনার উৎসাহ হারিয়েছে, ভোটে উৎসাহ হারিয়েছে। দুই : সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বাইরে আমাদের নির্বাচন-প্রক্রিয়াও নয়। ফলে জনগণের সঠিক মতামত নির্বাচনে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভবের চেয়েও কিছু বেশি। ভালো হিসেব জানা থাকলে এবং হুজুরের দলের সহযোগিতায় নির্বাচন তহবিল পুষ্ট থাকলে প্রকাশ্যে 'বুথ জ্যাম' না করেও জনগণের প্রকৃত ইচ্ছেকে ওলট-পালট করে দেওয়া যায় শতকরা মাত্র দশ থেকে কুড়ি ভাগ জাল ভোট বাক্সে ঢেলে। আর তেমনটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঘটছেও। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেহেতু প্রকৃত জনমত আদৌ বেরিয়ে আসছে না, তাই আদৌ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না-এই লেখকের সূত্র অসার। বরং এ-কথা মিলিয়ে নেবেন—যেদিন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ভাঙার পর গড়ার আদর্শ সামনে রেখে কোনও রাজনীতির অভ্যুত্থান ঘটবে এ-দেশে, সেদিন নেতিবাচক রাজনীতি করা,

হুজুরের দালাল প্রতিটি রাজনৈতিক দলের খেলা হবে শেষ। ওদের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকবে জনগণই।

ভাঙা-গড়ার এই খেলায় যে কোনও আন্দোলনকে সাময়িক জয়ের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী বা স্থায়ী জয়ে পরিবর্তিত করতে চাইলে নেতাদের জানতেই হবে গড়ার নিয়ম, যে নিয়মের কোনও বিকল্প নেই।

দ্বিচারিতা : অপ্রিয় কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন

এই লেখা কোনও রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিছক বিরোধিতা করার জন্য নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রপাগান্ডার জন্যও নয়। সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ—আপনার রাজনৈতিক আনুগত্য ও ব্যক্তিশ্রদ্ধাকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে সৎ-মূল্যবোধ ও শাণিত-যুক্তির নিরিখে লেখাটিকে বিচার করুন। আপনার এই ক্ষণিক নিরপেক্ষতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সুন্দর পৃথিবী গড়ার অমোঘ শক্তি।

রাজনীতি = দুর্নীতি—এই ধরনের একটা সরল সমীকরণের শিকার সাধারণ মানুষ। কারণ, এটা তো ঠিক, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কম-বেশি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এই অবস্থায় এমন একটা লেখা লিখে ফেলা এবং প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা যেমন বেশি ঝুঁকিও তেমনই বেশি। কারণ লক্ষ করেছি, অনেক দ্বিচারিতা, অনেক দুর্নীতি, অনেক অপসংস্কৃতির প্রশ্ন ভেসে যায় জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের উন্মাদনার স্রোতে—একই সঙ্গে বানভাসি হয় যুক্তির, আদর্শের এবং শোষণ মুক্তির ভিত্তিমূলের।

কেন সমাজকে সুস্থ রাজনীতি দেওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যায়। আমরাই তা পারি, আমাদের সচেতনতাই পারে সমাজকে দ্বিচারিতামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত করতে। আর সেই চিন্তাই এই লেখার উৎস।

"ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী দল নয়" বলে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ মন্তব্য করেন ৯ মে '৯৩ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'কিউবা সংহতি কমিটি'র বৈঠকে। এক কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর নেত্রীর উপস্থিতিতে এমন বেমক্কা বাক্যবাণে মর্মাহত ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বসু বলেন, "কোনও দলের নাম কমিউনিস্ট পার্টি হলেই সেই দল কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী হয়ে যায় না। সবকিছুই নির্ভর করে একটি দলের কাজকর্মের উপর।"

এই খবর ১০ মে'র বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার পাতায় পড়ে বুঝলাম, চিত্তবাবু খুবই কোমল-চিত্তের মানুষ। অপ্রিয় সত্য বলে কাউকে ব্যথা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। তাই সে-দিনের অমন মহতী সভায় সোচ্চারে বলতে পারেননি—একটি মানুষের মার্কসবাদী হয়ে ওঠার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাকে যুক্তিবাদী হতেই হবে। নাস্তিক হতেই হবে। অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে নতজানু হওয়া চলবে না। (এই প্রসঙ্গে অবশ্য এইটুকুও বলে রাখা ভালো— একটি মানুষকে যুক্তিবাদী হতে হলে মার্কসবাদী হতে হবে—এমন কোনও পূর্বশর্ত নেই)।

এইসব আলটপকা অপ্রিয় সত্য কথাগুলো ছুড়ে দিলে শিখধর্মাচরণে নতজানু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পাগড়ি ও বালাধারী সফেদ-দাড়ির হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এবং তাঁকে দলের সর্বোচ্চ পদে বসান সি পি এম পার্টি নিশ্চয়ই যথেষ্টর চেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়তেন। অবশ্য যেটুকু মুখ চিত্তবাবু খুলেছেন, একটু সচেতনদের কাছে সেই ইশারাই 'কাফি হ্যায়'।

সি.পি.এম-এর কাছে অবশ্য আশার কথা এই যে—চিত্ত বসুর এ হেন বাক্যবাণেও কিউবান কমিউনিস্ট নেত্রীর কাছে সি.পি.এম-এর সম্মান একটুও টস্‌কায়নি। কারণ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির এক নম্বর জাঁদরেল নেতা ফিদেল কাস্ত্রোও আর এক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ। আর তাইতেই তো খ্রিস্টধর্মের জয়গানে মুখরিত কাস্ত্রো রচিত পুস্তকের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল সি.পি.এম-এর শ্রমিক সংগঠন সিটুর সদর দপ্তরে।

ধর্মের বিরুদ্ধে যে মার্কস ছিলেন চির-সংগ্রামী, দৃঢ়তার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করলেন শ্রেণিশোষণের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত দৃঢ়বদ্ধ-সেই মার্কসের তথাকথিত অনুগামী ভণ্ড মার্কসবাদীরা সমস্ত বঞ্চনার কারণ হিসেবে অদৃষ্ট বা ঈশ্বরীয় অলীক কোনও

**কিছুকে দায়ী করে নিজেদের দুর্নীতিকে,
শ্রেণিশোষণকে আড়াল করে আখের
গোছাতে চায় বলেই ধর্মের সঙ্গে
মার্কসকে জড়িয়ে এক সংশোধিত
মার্কসবাদকে হাজির
করতে চাইছে।**

'মার্কসবাদেও আছি, ধর্মেও আছি' নীতি নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁরা একে 'কৌশল' বা 'যুগোপযোগী' বলে যতই সোচ্চার হোন না কেন, মোদ্দা কথায় এই নীতি দুর্নীতি, স্ববিরোধিতা, দ্বিচারিতা। ধর্মকে আঘাত না করার ফিকির হিসেবে প্রচার করতে চাইছে—'ধর্মকে আঘাত করলে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।' এ-দেশে মার্কসবাদীরা ধর্মে আঘাত হানল কবে? এমন পরীক্ষাহীন সিদ্ধান্ত কি তথাকথিত মার্কসবাদীদের অন্তঃসারশূন্যতা, ও দেউলেপনাকেই প্রকট করে না? রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বধর্মসম্মেলন উপলক্ষে সরাসরি রাজনীতিকে নাক গলানোর বিরোধিতায় আমরা যুক্তিবাদী সমিতি, নেমেছিলাম। আমরা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমরা জানতাম পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে কিছু করা বা বলতে যাওয়া ভোট-নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিজেপি বিরোধিতার চেয়ে হাজারোগুণ কঠিন। এই অবস্থানগত জায়গাতে দাঁড়িয়েও আমরা পেরেছিলাম দেশব্যাপী রাজনীতিকদের মানসকে আমাদের দাবির অনুকূলে সংগঠিত ও সমাবেশিত করতে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ভারতের সংবিধানে যে অর্থহীন আবর্জনার মতোই পড়ে ছিল, সেই শব্দটির সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রয়োগের দাবি তুলে আমরা পেরেছিলাম সে-দিকে আন্তর্জাতিক জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আমরা এই প্রত্যয় বহুতে প্রোথিত করতে পেরেছি—ধর্ম কখনওই প্রগতি ও সুচেতনার ধারক নয়, বরং মনুষ্যত্বের বিকাশকামিতার পক্ষে বাধা-স্বরূপ।

**দ্বিচারিতা অবশ্যই দুর্নীতি। কিন্তু সকল দুর্নীতিই দ্বিচারিতা নয়।
একজন ঘুষখোর, চোর, ডাকাত বা গুন্ডা-মস্তানদের মতো
দুর্নীতি-পরায়ণদের চিহ্নিত করা যতটা সোজা,
ততটাই কঠিন দ্বিচারীদের মুখোশের
আড়ালের মুখগুলোকে
চিহ্নিত করা।**

দ্বিচারিতা ও সীমাবদ্ধতা একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার মতো বিষয় নয়। সীমাবদ্ধতা দুর্নীতি নয়। ফুটবলের প্রসূন ব্যানার্জির সীমাবদ্ধতা ছিল—ডান পা তেমন চলত না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল—রাগাশ্রয়ী গানে গলা তেমন খুলত না। কল্প-বিজ্ঞানের গল্প লেখার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল— গল্পগুলো বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রের উপর মোটামুটি ভাবে নির্ভর করার পরিবর্তে প্রায়শই সে-সব গল্প হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান-বিরোধী। এমনকী এও বলা যায়— সত্যজিৎ যতটা শিল্পমনস্ক ছিলেন ততটা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না। কিন্তু এঁদের এই সীমাবদ্ধতার বাইরে এঁরা এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করে গেছেন, যে সৃষ্টির জন্য আমাদের অন্তর থেকে প্রবাহিত হয়েছে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্নীতির কালিমার দ্বারা ওইসব চরিত্রকে আমরা তাই কলঙ্কিত করতে পারি না।

'দ্বিচারিতা' অবশ্যই দুর্নীতির চেয়ে বাড়তি কিছু, সংস্কৃতির পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ব্লাড-ক্যানসারের মতোই নিঃশব্দ বিধ্বংসী শক্তি। হর্ষদ মেহেতা, দাউদ ইব্রাহিম, রশিদ বা বীরাপ্পানের মতো মুখোশহীন দুর্নীতির রথীমহারথীরাও একবার ফেঁসে গেলে ভুস-ভুস করে ডুবতে থাকে। কিন্তু ডোবেন না আম্বানি, বিড়লা, চন্দন; ডোবেন না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, পুলিশ-প্রশাসন ও সেনাবিভাগের ক্রিম মানুষগুলো; ডোবেন না সমাজের ক্রীম বুদ্ধিজীবী বা সুপারস্টার অভিনেতা, ডোবেন না দু-তিন হাজারি মাস-মাইনের ধনকুবের বিধায়ক, কি গায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীমশাইয়েরা। এঁদের ভাসিয়ে রাখে ভালোমানুষের মুখোশ, জনদরদী মুখোশ, প্রতিবাদী মুখোশ, উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর মুখোশ।

দুর্নীতি আজ এতই সর্বত্রগামী এবং এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে যে এ-দেশের মানুষ আজ গভীর নিরাশায় মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় ভরসা যাঁরা জাগাচ্ছেন তাঁরা কতটা নির্ভরযোগ্য এটা আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি মুখোশধারী দ্বিচারীদের মুখোশ দেখে ভরসা রাখি, তাহলে সে হবে যুদ্ধহীন আত্মসমর্পণ, আত্মহনন।

মস্কোয় লেনিনের মূর্তি 'হেঁইয়ো—মারো—হেঁইয়ো' করে টেনে ভূলুণ্ঠিত করা হল। কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ দেখা গেল না। কারণ এই ধরনের মানসিকতার সপক্ষে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছিল বিউটি কনটেস্ট, ক্যাবারে নাচের মতো নানা ভোগবাদী চিন্তার অফুরন্ত জোগান দিয়ে, ভাগ্যফল ও যিশু-বিবেকানন্দের মতো নানা ভাববাদী চিন্তার আমদানি ঘটিয়ে।

আজ আমাদের এই পোড়া দেশে মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত, 'গণতন্ত্র' একটা 'তামাশা', দুর্নীতির সহাবস্থান বেঁচে থাকার আবশ্যিক শর্ত। এ-সব থেকে যারা ফয়দা লুটছে, সেই বণিক-রাজনীতিক-আমলা-পুলিশ-প্রশাসন ফয়দা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ব্যক্তি-লোভ ও দুর্নীতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে এবং তাকে প্রতিনিয়ত- পুষ্ট করতে সচেষ্ট রয়েছে। শাসক ও শোষকদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক বিরোধীদের জানে বা পেটে মারার প্রয়াসের বিরুদ্ধে জনরোষ যেন দাউ-দাউ আগুনে পরিণত হয়ে বণিক-রাজনীতিক-আমলাদের অশুভ চক্রকে পুড়িয়ে না মারে, সে কথা চিন্তা করেই শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এঁদের কেউ স্বার্থান্ধ, ভোগসর্বস্ব উত্তেজক সংস্কৃতির গন্ধ তৈরি করে মানুষের চেতনায় পৌঁছে দিচ্ছেন। কেউবা 'ঈশ্বর' জাতীয় সেরা গুজবের ঘাস-বিচুলিকে কুশলী হাতে পরিবেশন করে মানুষকেও 'হাম্বা' রবের চতুষ্পদীতে পরিণত করছেন। ফলে বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে এইসব তৃণভোজীরা পরমপিতা-জাতীয়ের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে মুক্তি ও শান্তি পেতে চাইছে। এইসব ভোগবাদী বা ভাববাদী চিন্তার প্রসারকামী লেখক হিসেবে অমুক গাঙ্গুলি বা তমুক চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না। এই চিনে ফেলার দরুন যাঁরা এঁদের সৃষ্ট ভাইরাস-আক্রমণ থেকে নিজেদের চিন্তাকে রক্ষা করতে পারেন, তাঁদের চিন্তাকে বিনাশ করতেই মুখোশধারী প্রতিবাদী বাজারে ছাড়া হয়েছে। এঁরা বাস্তবে চিন্তার প্রোটিনের ছদ্মবেশে চিন্তার বিনাশকারী ভাইরাস। একটু লক্ষ করলেই দেখবেন এই তথাকথিত শিল্পী, সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরের ভূমিকায় রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের বণিকশ্রেণি বা প্রচারমাধ্যম—যার মালিকও অবশ্যই বণিক-শ্রেণিই।

আমাদের সমাজের চিত্রটাই এই রকম— 'নামী' হওয়ার একটা পর্যায় অতিক্রম করে আরও নাম কিনতে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্পনসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপস করা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর এইসব স্পনসর দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে পিষে মেরে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে চায়।

এ দেশের অপসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সুসংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই নিতে পারতেন সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত তো কম নয় যেখানে একটি গ্রন্থ অনেক বিপ্লব, অনেক ওলট-পালট ঘটিয়ে দিয়েছে। ভলতেয়ারের লেখা 'ক্যানডিড' ঘটিয়ে ছিল ফরাসি বিপ্লব। পত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতার পক্ষে (Pressfreedom) বিশাল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল মিলটনের 'আরিয়ো প্যাজিটিকা' গ্রন্থটি। রুশ বিপ্লবে ম্যাকসিম গর্কির 'মাদার' প্রেরণা জুগিয়েছিল বিপ্লবীদের। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বহু বাঙালি যুবককেই প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু আজ? এমন একটা প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও সিংহভাগ সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন না। এঁরা হয় নিশ্চুপ হয়ে রয়েছেন, নতুবা স্পনসরদের চাটুকারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এইসব স্পনসররা অনুগতদের জনপ্রিয় করতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট এবং একইভাবে সচেষ্ট অনুগত স্রষ্টাদের সাহায্যে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে, যেখানে প্রতিবাদ থাকবে না, প্রতিরোধ থাকবে না, থাকবে শুধু আপস।

যে কোনও পেশায় নিযুক্ত লোকের মতো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরও ব্যক্তিগত জীবনে মতাদর্শগত বিশ্বাস বা রাজনৈতিক আনুগত্য থাকতেই পারে। কিন্তু সরকার, বৃহৎ-পত্রিকাগোষ্ঠী জাতীয় স্পনসরদের পরাক্রমে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীই তার আদর্শগত বিশ্বাস বা সততাপূর্ণ আনুগত্য দ্বারা পরিচালিত হন না। এমন দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল যেখানে কেউ স্পনসর বা প্রচার মাধ্যমের কাছে নীতিকে বন্ধক রাখা আপসে না গিয়েও বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

ব্যাপকতর মানুষদের মধ্যে একটা বিপদ্‌জনক ধারণা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে—অমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল, অমুক পত্রিকা প্রগতিবাদী। ধারণাটা একেবারে আগাপাছতলা ভুল। বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছে পত্রিকা প্রকাশ স্রেফ একটি ব্যবসা মাত্র, যেমন ব্যবসা করেন শেয়ার দালাল, বিল্ডিং প্রমোটার অথবা ফিল্ম প্রডিউসার কিংবা ক্লথ মিলের মালিক। পত্রিকাগুলোর কেউ সি. পি. এম-এর প্রতি জনগণের ক্ষুব্ধতাকে পুঁজি করে খদ্দের ধরতে পত্রিকার একটা চরিত্র'কে খাড়া করে। কেউ বা সি. পি. এম-এর জনসমর্থনকে পুঁজি করে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। কেউ বা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে এবং তারই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন রাজনীতির ইমেজ বা সরকার বিরোধী. ইমেজ তৈরি করে কাগজের বিক্রি বাড়িয়ে চলেন। এইসব পত্রিকাগুলোর সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতোই— যখন যে দলে খেলেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে

যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুঁদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝানু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একই ভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী, প্রতিবাদী, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রিকার মালিকরাই আসলে এক একটি ধনকুবের। এইসব পত্রিকা মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধনসম্পদে আর একজনের টপ্‌কে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ওরা দারুণ রকম এককাট্টা।

কখনও কখনও বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্যের অধিকারীরা রাজনীতিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা রক্ষা ও বর্ধিত করতে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়। এখানেও কিন্তু বাণিজ্য-সম্রাটের পক্ষে পত্রিকার বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। যে পত্রিকা বিক্রি হয় না, তাকে কোনও রাজনীতিক পাত্তা দেবে?

যে-সব সাংবাদিক বা সংবাদপত্রকর্মী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন, দুর্নীতির শিকল ভেঙে সুসংস্কৃতির সমাজ গড়তে চান, তাঁদের পক্ষেও কলমকে হাতিয়ার করে পত্রিকাকে রণভূমি করা সম্ভব হয় না। কারণ পত্রিকায় ব্যক্তি ইচ্ছে বা ব্যক্তি আবেগের স্থান সীমাবদ্ধ। পত্রিকার পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই একজন সাংবাদিককে কলম চালাতে হয়। কোনও সাংবাদিকের পক্ষে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততক্ষণই সহযোগিতা করা সম্ভব যতক্ষণ না পেপার পলিসি ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায়।

পেপার পলিসি কাউকে ব্ল্যাক আউট করতে চাইলে বা কারও বিপক্ষে গেলে তাকে পত্রিকার প্রচারে আনা বা তার পক্ষে লেখা কোনও সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু পত্রিকা মালিক যদি দেখেন কাউকে ব্ল্যাক আউট করার ফলে অথবা কারও বিপক্ষে লেখার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখে, তখন ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা পলিসি পাল্টে ফেলেন, ডিগবাজি খান। এই ডিগবাজি খাওয়াটাও ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি বা সংস্থা পত্রিকা মালিকের অস্তিত্বের পক্ষে চূড়ান্ত সংকট হিসেবে হাজির হচ্ছে।

বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বাস্তব কাঠামো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে

বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ভুল বোঝার অবকাশ বেশি থাকে। আর এই ভুলই বহু সৎ ও গতিশীল আন্দোলনে ধস নামাতে পারে। সত্যিকারের আন্দোলনের পাল থেকে জনসমর্থনের হাওয়া কেড়ে নিতে মেকি আন্দোলনকারী খাড়া করে তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকা যখন ময়দানে নামে, তখন পত্রিকা-চরিত্র বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা বহু সমর্থককে, বহু আন্দোলন-কর্মীকে, বহু নেতাকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম বা পত্র-পত্রিকা যেমন বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্বকে 'পেপার পলিসি'র পক্ষে কাজে লাগায়, নিজস্ব ছাঁচের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ার পক্ষে কাজে লাগায়, তেমনই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্ব বা আন্দোলনের নেতৃত্ব কেন পারবে না পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলোকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে? কাজে লাগানো সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও লক্ষ্য সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব চেষ্টা করলে দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করে, প্রচার-মাধমে দ্বারা ব্যবহৃত না হয়ে প্রচার-মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে পারেন।

যে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা যত বেশি, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তার তত বেশি।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার দিকে একটু সচেনততার সঙ্গে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন ওই পত্রিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চায়, সমাজের সেরা লেখক, সেরা শিল্পী, সেরা বুদ্ধিজীবীরা তাদের পত্রিকায় লেখেন, আঁকেন। ফলে ওই পত্রিকায় স্থান পাওয়া, জনগণের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের ISI ছাপ পাওয়া হয়ে দাঁড়ায়। এর পর ওরা ইচ্ছে মতন একজনকে প্রচারের তুঙ্গে তুলে নিয়ে যায়, একজনকে ব্ল্যাক আউট করে জনগণ থেকে নির্বাসিত করে। জনপ্রিয় সব পত্রিকাই কম-বেশি একই মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

আর এক দল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী আছেন, যাঁরা নিজেদের 'বাজারি' বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেশাতে রাজি নন। সমাজের প্রতি যাঁদের দায়বদ্ধতার কথা সোচ্চারে প্রচারিত হয়, প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে এঁদের প্রজেক্ট করা হয়। প্রজেক্ট

করেন তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকা (আসলে যে প্রগতিশীলতা খদ্দের ধরার বাণিজ্যিক কৌশল মাত্র)। এঁরা যদি ভণ্ড, প্রগতিশীলতার মুখোশ পরা, লোভী বা দ্বিচারী হন তবে আমরা এঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হব। কারণ, এঁরা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে দূষিত করার পক্ষে প্রথম আলোচিত বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে অনেক বেশিগুণ ভয়ংকর শক্তির অধিকারী।

আমরা এই আলোচনায় সেই সব নরসিমাজাতীয় পচা রাজনীতিবিদদের কথা আনতে চাই না, যাঁরা কথায় ও কাজে সর্বদা বিপরীত মেরুতে অবস্থান করার সুবাদে 'রাজনীতি'কে 'দুর্নীতি'র সমার্থক শব্দ হিসেবে জনমানসে দৃঢ়বদ্ধ করেছেন। সেইসব সর্বহারার নেতাদের কথাও আলোচনায় আনব না, যাঁরা কোটিপতি এবং যাঁদের সন্তান ও আত্মীয়-পরিজনেরা কোটি-কোটিপতি। কারণ বেশির ভাগ মানুষই এইসব মানুষদের 'চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ' হিসেবেই চেনেন। কিন্তু সেইসব রাজনীতিকদের ভিতর থেকে দু একজন ব্যক্তিকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনাটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না, যাঁরা স্বার্থান্ধ ও অন্ধ স্তাবকের দল ছাড়াও অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও বাস্তবে তাঁরা স্ববিরোধী, দ্বিচারী, কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী।

আসুন রাজনীতিক দিয়ে শুরু করে সমাজশীর্ষের দু-চারজন বহুরূপীর রূপ চিনিয়ে দিই। তারপর আমরা সকলে মিলে দ্বিচারীদের চিহ্নিতকরণের খেলায় মেতে উঠলে নাম কিনতে বা আখের গোছাতে দ্বিচারী হওয়ার অসুস্থ প্রবণতা বন্ধ হবেই।

চোদ্দোশো বঙ্গাব্দে পা দিতেই বুঝলাম, আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনেক কৌতুক যাকে 'নির্মল কৌতুক' না বলে 'রোমহর্ষক কৌতুক' বললে যথার্থ হবে। কট্টর মার্কসবাদী, শ্রেণি সংগ্রামে দৃঢ় প্রত্যয়ী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দুই নাতির উপনয়ন উপলক্ষে প্রীতিভোজে অনেক মার্কসবাদী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানালেন। আর সেইসব মার্কসবাদীরা একটা রাতের জন্য শ্রেণি সংগ্রামকে শীতের শেষের লেপের মতোই গুটিয়ে তুলে রেখে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কসীয় ভোজ সমাধা করলেন। একটু গোদা বাংলায় বলা যায়—মার্কসবাদীরা সেই ভোজসভায় মার্কসবাদকেই উদরসাৎ করেন।

১৩ জুন '৯৩ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'র দু'য়ের পাতায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন এখানে তুলে দিচ্ছি—

'মার্কসবাদী পরিবারের মেয়ে পূঃবঃ (ঢাকা বিক্রমপুর) ব্রাহ্মণ, ৫'—১", বি এ মান, সুশ্রী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, রন্ধনে পারদর্শী, টাইপ জানা, গৃহশিক্ষয়িত্রী ও শাড়ি ব্যবসায়ী। মাসিক আয় দু'হাজার। সহৃদয় স্নাতক

কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারি পদস্থ কর্মচারী, অফিসার, প্রফেসর, ব্যাঙ্ক, রেল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ প্রগতিশীল পাত্র অগ্রগণ্য।'

পাত্রীর পিতা প্রয়াত দীনেশ মজুমদার ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা, যাঁর নামাঙ্কিত এক বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতার মৌলালি'তে। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতার মেয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক বিজ্ঞাপন দিয়ে মার্কসবাদী পাত্রীর জন্য 'ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ প্রগতিশীল' পাত্র চাওয়া হচ্ছে।

জাত-পাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, শ্রেণি সংগ্রামে বিশ্বাসী একটা রাজনৈতিক দলের নেতাদের অবস্থা এই বলেই 'রণে বনে জঙ্গলে' স্মরণ নিলেই রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ লোকনাথবাবার ঘটা করে পুজো হয় মাঝারি মার্কসবাদী নেতাদের ঘরে, লক্ষ্মীর ঘট ও নানা দেব-দেবীর মূর্তিতে আচ্ছন্ন থাকে মার্কসবাদীদের কুলুঙ্গি, আর পাত্র-বা পাত্রী খোঁজার সময় জাত-পাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদিকে ক্ষণিক বিশ্রাম দেয়। পরিণতিতে ১৬ বছর মার্কসীয় শাসনে মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো কোনও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে না উঠে গড়ে উঠেছে ভণ্ডের সংস্কৃতি, দুর্নীতির সংস্কৃতি, লুম্পেনের সংস্কৃতি। আমরা পেয়েছি ব্রাহ্মণ মার্কসবাদী, কায়স্থ মার্কসবাদী, ঈশ্বরজাতীয় বিশ্বাস নতজানু মার্কসবাদী, অদৃষ্টবাদী মার্কসবাদী, হুল্লোড়বাজ নাচ-গানের প্রমোটার মার্কসবাদী, বিল্ডিং-প্রমোটার মার্কসবাদী, শেয়ার দালাল মার্কসবাদী, লটারি ও সাট্টা ব্যবসায়ী মার্কসবাদী, মস্তান মার্কসবাদী, ধর্ষক মার্কসবাদী, ওয়াগন ব্রেকার মার্কসবাদী, রিগিং মাস্টার মার্কসবাদী, ব্যক্তি-স্বার্থে এবং দলীয় স্বার্থে মার্কসবাদের আন্দোলনকে পদদলিত কর মার্কসবাদী, দ্বিচারী মার্কসবাদী।

ব্যক্তিগত আখের গোছানোর স্বার্থে, দুর্নীতি ও শোষণকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ওইসব 'হাঁসজারু' মার্কা মার্কসবাদী তৈরির লাগাতার প্রক্রিয়া চালিয়েই চলেছে ভারতের বৃহত্তম তথাকথিত মার্কসবাদী দলের নেতৃত্ব। এরই ফলস্বরূপ আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'তে শেয়ার দর ছাপতে দেখলাম। আর কখন ছাপা হল? না, যখন আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী সম্মেলন হচ্ছে সি. পি. এম -এরই ব্যবস্থাপনায়। আমরা 'গণশক্তি'তে সাট্টার বিজ্ঞাপন ছাপতে দেখেছি, দেখেছি 'মা নির্মলাদেবী' নামের জনৈকা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারের ছবিসহ ঢাউস বিজ্ঞাপন ছাপতে। অথচ যখন এই 'গণশক্তি' সান্ধ্য দৈনিক ছিল বা '৬৭তে যখন প্রভাতী সংবাদপত্রের

রূপ নিল তখন প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দু'পাশে ছাপা হত মার্কস ও লেনিন-এর বাণী।

কমিউনিটি পার্টিতে এমন একটা দিন ছিল যখন দলের নেতা বিনয় চৌধুরী স্ত্রীর সঙ্গে ধর্মস্থানে যাওয়ার জন্য দলের নেতৃত্ব তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। তখন ছিল বিনয় চৌধুরীর যৌবনকাল। তারপর অনেক জল গড়িয়েছে। আজ বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য সুভাষ চক্রবর্তী, শান্তি ঘটক বীর-বিক্রমে দলের উচ্চপদে বিরাজ করেন। জ্যোতি বসু কোমরের ব্যথা সারাতে বালক ব্রহ্মচারীর ঝাড়-ফুঁকের সাহায্য নেন। সর্বহারাদের মুক্তির স্বপ্ন দেখানো বড় মেজ মার্কসবাদী দলগুলোর বর্তমান অবস্থান সর্বহারাদের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের নিরাশাই শুধু সৃষ্টি করে চলেছে, সৃষ্টি করে চলেছে ভণ্ড সুবিধাভোগী এক বিশেষ শ্রেণি।

ষাটের দশকের যে সব উজ্জ্বল নাম এক সময় এই সব ভণ্ড নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের প্রতি একদা বহু মানুষ প্রত্যাশা রেখেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁদের আহ্বানে পরম অবহেলায় শত-সহস্র যুবক-যুবতী সীসার গুলি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে মাটির গভীরে, তাঁদের অনেকেই আজ রাজার বাজনদরের বাজনার তালে তালে দিব্বি নাচন-কোঁদন করছেন, ডিগবাজিও খাচ্ছেন। 'মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও'। ডিগবাজিকরেরা বুঝে গেছেন সীসার গুলি বুকে নিয়ে শুয়ে থাকা হীরে-মানিকরা মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে কোনও দিনই এমন অবস্থা পাল্টানোর জন্য জবাবদিহি চাইতে আসবে না। তারই সুযোগ নিয়ে জেল খাটার বছরগুলোকে অপূর্ব করিশ্মার সঙ্গে ইউনিট ট্রাস্টের ডিভিডেন্ড করে অনেকেই দিব্বি ভাঙিয়ে খাচ্ছেন।

কমরেড কাকা ওরফে অসীম চ্যাটার্জি '৯০-তে এসে আবিষ্কার করলেন এবং সোচ্চার হলেন, "রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বামফ্রন্টের নেতৃত্ব ও শাসনের মধ্য দিয়ে যে অতীতের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে তা অস্বীকার করতে পারি না।" অসীমবাবু, আপনার 'ভোট বয়কটের রাজনীতি'তে একদা অবস্থান বা 'ভোটের রাজনীতি'তে ফিরে আসা, এই দুটি প্রসঙ্গের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ থেকেও অবশ্যই যুক্তিকে মর্যাদা দিতে প্রশ্ন তুলতে পারি, অসীম চ্যাটার্জি— সত্যিই কি আপনি মনে করেন বামফ্রন্ট শোষণ মুক্তির আন্দোলন করছে? সর্বহারাশ্রেণির মুক্তির পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির আন্দোলন করছে? আন্দোলন বলতে আপনি কী বোঝেন আসীমবাবু? আগের মতো করে বোঝেন? না, অবস্থান পাল্টে আন্দোলন বলতে লোক জড়ো করার ক্ষমতাকেই গুরুত্ব দিতে চান বা ভয় দেখিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর লোক জড়ো করার ক্ষমতাকেই আন্দোলনের ক্ষমতা বলে মনে করেন? এই বক্তব্যের মধ্য

দিয়ে কোনওভাবেই ভোট বয়কটের রাজনীতি বা ভোটের রাজনীতিকে সমর্থন অথবা অসমর্থন করতে চাইছি না। বলতে চাইছি, অসীমবাবুর এমনতর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর স্পষ্ট কোনও রাজনীতির দিশা আমরা লাভ করি না। বরং তাঁর বক্তব্য থেকে একটা আন্দোলনবিমুখ সুবিধাবাদী রূপই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। '৯০-এর জানুয়ারিতে বিভিন্ন প্রভাতী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, আপনি সি.পি.এম মঞ্চে যেতে রাজি হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, "ওদের মানুষ জড়ো করার ক্ষমতা আমাদের থেকে অনেক বেশি।" অসীমবাবু আপনার কাছে আরও একটি খোলা প্রশ্ন— আপনি কি সত্যি এ-জাতীয় কথা বলেছেন? সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বি.জে.পি'র মানুষ জড়ো করার ক্ষমতা তো সি.পি.এম-এর চেয়েও বহুগুণ বেশি; আপনারই যুক্তি মেনে আপনি কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা বি.জে.পি'র মঞ্চে হাজির হবেন?

আসলে আপনার মতো নেতারা সৎ থেকে অবস্থান পাল্টে চতুর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুণে নয়, পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছেন। ফলে আপনারা সংখ্যাগুরু জনগণকে সঙ্গে পেতে পিছিয়ে পড়া জনচেতনার স্তরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। আপনারা চাইছেন মানুষের চেতনার অগ্রগামিতা থামাতে। কারণ, আপনাদের মতন পোড়খাওয়া চতুর নেতাদের মোটেই অজানা নেই—বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিমনস্কতা গড়ে তোলার আন্দোলন, সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সমাজ ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনকারী আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি। আপনারা চাইছেন এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে, জিইয়ে রাখতে, যেখানে ধান্দাবাজদের আখের গোছানোর খেলাটা চলমান থাকে।

'৯৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে আজিজুল হকের প্রকাশিত লেখাগুলো পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তিনি গ্রাম-গঞ্জের এক সোনালি চিত্র এঁকে বামফ্রন্টের ভোট বাক্সকে স্ফীত করতে চেয়েছিলেন। যে কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন বা অসমর্থন করার পূর্ণ অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। এক সময় আপনার নিশ্চয়ই অধিকার ছিল সি.পি.এম'কে শোষকদের সহযোগী শাসক ভাবার। আজ আপনার নিশ্চয়ই অধিকার আছে এমন ভাবার— অনেক রক্ত ঝরানো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বাম সরকার সর্বহারা শ্রেণির জন্য অনেক দিয়েছে—যেমনটি এখন ভাবছেন। কিন্তু আপনি সত্যিই কি এমনটা ভাবছেন? না কি ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এমনটা লিখতে বাধ্য হয়েছেন ও হচ্ছেন—পেট চালাবার তাগিদে?

আজিজুল সাহেব, জানি আপনার শারীরিক অক্ষমতা আপনাকে গ্রাম-গঞ্জে

ঘুরতে দেয় না, শহুরে কিছু মধ্যবিত্তদের ঘিরে আপনার বর্তমান গণ্ডি। আপনার শারীরিক সীমাবদ্ধতার কথা জেনেও বলছি—সৎ সাংবাদিকতার স্বার্থে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে গ্রামবাংলাকে জেনে লিখুন। কুড়ি বছর আগের জানা ভাঙিয়ে খাবেন না। এই পরিক্রমার পর আপনার যদি মনে হয়, সর্বহারা শ্রেণির শোষণ মুক্তির কাজে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—লিখুন। যদি মনে হয়, বাণিজ্যিক সিনেমায় দেখানো শান্ত সুন্দর গ্রামগুলোর মতোই আমাদের গ্রামবাংলার বর্তমান সামগ্রিক চিত্র—তাই লিখুন। যদি দেখেন ক্ষুধা, দুর্নীতি, অবক্ষয়, রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বাঁধনে গ্রাম বাংলা আজ মুমূর্ষু—তাই লিখুন। গণ-আন্দোলনের স্বার্থে, নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হোন।

আপনি বি.জে.পি'র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার—আপনাকে অভিনন্দন। যে কোনও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেই যুক্তিবাদী মানুষরা সোচ্চার হবেন, সৎ মানুষরা সোচ্চার হবেন, সোচ্চার মানুষদের অভিনন্দন জানাবেন—এমনটাই প্রত্যাশিত। বি.জে.পি'র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সব্বাইকে এক হয়ে লড়াইতে নামতে হবে বলে যেমনটি ভাবছেন, আহ্বান রাখছেন, সি. পি. এম-এর রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তেমনই আহ্বানে সোচ্চার হতে পারবেন কি আজিজুল সাহেব? গণতন্ত্রে যে কোনও নাগরিকের যে কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন অথবা অসমর্থন করার পূর্ণ অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে বিরোধী রাজনৈতিকদলের সমর্থকদের প্রাণে বা ভাতে মারার অধিকার কোনও রাজনৈতিক দলেরই থাকতে পারে না। কিন্তু আজ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কম-বেশি এই ফ্যাসিবাদী মানসিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ বন্ধের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে যে রাজনৈতিক দল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারত, সে হল বৃহত্তম ও শাসক রাজনৈতিক দল সি. পি. এম। কিন্তু তাদের এ-বিষয়ে ভূমিকা কী? তারা কি স্কুলে-কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে প্রাইমারি স্কুলের কেরানি, কলেজের অধ্যাপক, সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি সর্বত্রই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক, ফ্যাসিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি? তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সঙ্গে আজও কি আপনি তেমনই মেশেন, যেমন মিশতেন কারাজীবনের আগের লালটুকটুকে দিনগুলোতে? সত্যকে জানতে মিশতে শুরু করুন আজিজুল সাহেব, মিশতে শুরু করুন। মাঠে ময়দানে এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে ওদের মতো করে মিশলে অবশ্যই দেখতে পাবেন, কী বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ বিশ্বাস করেন 'মার্কসবাদ' ও 'ফ্যাসিবাদ' সমার্থক শব্দ। এই বিশ্বাসীদের সংখ্যা যে প্রতিটি দিনই বেড়ে চলেছে! এই বিশ্বাস

থেকে জন্ম নেওয়া ঘৃণাই কি একদিন তথাকথিত মার্কসবাদীদের এই বাংলা থেকে উৎপাটিত করার ক্ষেত্রে প্রবলতর ভূমিকা নেবে না? মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে এমন একটা অ্যালার্জি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সৃষ্টির জন্য শাসক ও মার্কসবাদীদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র, ভণ্ডামি ও দুর্নীতির একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে বলে কি আপনাদের মনে হয় না?

আজিজুল সাহেব, '৯৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়-সময় আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল ফোনে। আপনি তখন ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্তের বাড়িতে, আমি আমার বাড়িতে। মার্কসবাদী দলে সমাজবিরোধী ও ভণ্ডদের বর্তমান অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে আপনি বলেছিলেন, "বি.জে.পির ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ রুখতে আমি সমাজবিরোধীদেরও সঙ্গে নেবার পক্ষে।"

সমাজবিরোধীরা তো প্রথাগতভাবে গত ষোলো বছর ধরেই শাসক দলের সঙ্গে রয়েছে, তাতে কি বিজেপি'র উত্থান রুখতে পারা যাচ্ছে? আপনি কি রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের সাহায্যে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ রুখতে চাইছেন? তারপর রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ রুখবেন কী দিয়ে? শেষ পর্যন্ত বোতল থেকে বের করা সমাজবিরোধীদের ভূতকে বোতলে পুরবেন কী করে? সমাজবিরোধীরা স্বভাব না পাল্টানো সত্ত্বেও অর্থাৎ অবস্থান না পাল্টানো সত্ত্বেও তাদের পালন ও পুষ্ট করলে কাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে আজিজুল সাহেব? সমাজের? না ভণ্ড রাজনৈতিক দলের ও তাদের পালক বণিক শ্রেণির? একজন সৎ মানুষ অবস্থান পাল্টে অসৎ হলে পূর্ব সম্পর্ক থাকলেও তা ছিন্ন করে তার অসততার বিরোধিতা করাটা যে কোনও মূল্যবোধ-সচেতন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ সমর্থন করলেও আপনি সমর্থন করবেন কি না আমি নিশ্চিত নই—আপনার বর্তমান অবস্থানের জন্যই নিশ্চিত নই। বালক ব্রহ্মচারীর 'নির্বিকল্প সমাধি' নিয়ে পথনির্দেশ দিয়ে আপনি কখনও বলেছেন, 'মৃতদেহ পুড়িয়ে দিতে হবে', আবার কখনও বা বলেছেন, 'মৃতদেহ পচতে দাও'। স্থান-কাল-পাত্র দেখে আপনি দু'রকম কথাই বলেছেন। এই দ্বিচারিতার জন্যই আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিত নই।

আমি যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের একটি তাসের আড্ডা আছে। সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁরা আসেন, তাস খেলেন, রাতে বাড়ি ফেরেন। বদলি, স্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যু ছাড়া আড্ডার কোনও সদস্য বিদায় নেননি আমার দেখা পনেরোটি বছরের মধ্যে। এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন অন্যান্য পাড়ার তাস বা দাবার আড্ডার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা আমরা গত আট বছরে আদৌ দেখিনি। যখনই কোনও সদস্য লোভ বা ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে সমিতির আদর্শ থেকে

চ্যুত হয়েছে অথবা যুক্তিবাদ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতার কথাগুলো নিতান্তই মেকি বলে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তখন আমাদের সমিতির সদস্যদের সঙ্গে চ্যুত বা মেকি মানুষটির তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। আজ আমার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমিতির সভ্য-সভ্যাদের আছে, আমি বিচ্যুত হলে সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভাঙন ধরতে বাধ্য। এরপর সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক অটুট থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই নীতিহীন। তাসের আড্ডায় সদস্য এবং আমাদের সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত চেতনার পার্থক্যের দরুনই দ্বন্দ্ব দেখা না দেওয়া এবং দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। তাস-দাবার আড্ডায় কোনও মতাদর্শগত সংগ্রাম নেই বলেই দ্বন্দের সম্ভাবনাও নেই। আর আমাদের সমিতির ক্ষেত্রে তীব্রভাবে মতদর্শগত সংগ্রাম আছে বলেই দ্বন্দ্বেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। মাত্র তিনটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইছি।

নারায়ণ সান্যাল বিভিন্ন বিষয়ে সাবলীল এক গ্রন্থকার এবং প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত। অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন 'পয়োমুখম'-এর মতো অলৌকিকতা বিরোধী গ্রন্থ। বিভিন্ন সভায় যুক্তিবাদের পক্ষে সোচ্চার বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর সরব সমর্থন হেতু আমরা তাঁকে আমাদের সমিতির উপদেষ্টার পদে বসিয়েছি।

কেটে গেছে কয়েকটা বছর। এল ১৯৯৩ সাল। ঘটল ঘটনাটা। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য মন্দির পত্রিকা'র ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের সংখ্যাটি জনপ্রিয় যুক্তিবাদী লেখক নারায়ণ সান্যালকে পাঠিয়েছিলেন শ্রদ্ধাবনত সম্পাদক অশোক আগরওয়াল। পত্রিকাটি পড়ে 'কুসংস্কার ও বিজ্ঞান' শিরোনামের একটি লেখার প্রসঙ্গ টেনে সম্পাদককে এক পত্রাঘাত করলেন নারায়ণ সান্যাল। নারায়ণবাবুর চিঠিটি সম্পাদক ছেপে দিলেন 'সাহিত্য মন্দির'-এ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। সাহিত্য মন্দিরের দু'টি সংখ্যাই আমাদের দপ্তরে এল, সঙ্গে একটি চিঠি। বক্তব্য—আপনাদের সুস্পষ্ট মতামত চাই, নারায়ণ সান্যালের এমন দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কী করছেন?

নারায়ণবাবুর প্রকাশিত পত্রের একটা অংশে আছে, লেখিকার বন্ধু বলেছিল, **"যুগ যুগ ধরে কত মানুষ সংসার ত্যাগ করেছেন, কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন—কীসের জন্য?... তাঁরা সবাই কি ভুল করেছিলেন?" লেখিকা জবাবে বলেছিলেন, "সবাইও তো ভুল করতে পারেন।" লেখিকা কি সচেতন ভাবে খেয়াল করেছেন এ 'সবাই" এর মধ্যে পড়েন গৌতম বুদ্ধ, আদি শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ?**

শেষোক্ত ব্যক্তি যিনি 'সাবিত্রীর' মতো গ্রন্থরচনায় সক্ষম তিনি কী কারণে জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিলেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্ত সাধনায়? এবং কোন্ বৈজ্ঞানিক হেতুতে তাঁর মৃত্যুর পর সতেরো দিন মৃতদেহে পচনকার্য শুরু হয়নি (সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ভারত বিখ্যাত ডাক্তার প্রভাত সান্যাল এবং পণ্ডিচেরির ফরাসি সিভিল সার্জেন) এ তো ইতিহাস নয়। আমার জীবদ্দশায় ঘটা ঘটনা!

নারায়ণবাবু, এ আপনি কী লিখলেন? এ কি আপনার স্মৃতিভ্রংশের ফলশ্রুতি? না, মফস্বলের অনামী এক পত্রিকার সম্পাদককে যা খুশি লেখার স্পর্ধা? শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আপনার জীবন দশায় যা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন, তা তো আদৌ ঘটেনি! এ তো ইতিহাস নয়! এ হল বিকৃতি। অরবিন্দের মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ রাত ১টা ২৬ মিনিটে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৫০ বিকেল ৫টায়। যদি বাস্তবিকই তেমনটা ঘটে থাকে, তবে বলতে হয় বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ দেখে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেঁসেছেন ডাঃ অমলেন্দু সাঁতরা, কিন্তু ডাঃ প্রভাত সান্যাল ও সিভিল সার্জেন ফাঁসেননি। কারণ হল সময়টা '৯৩-এর পরিবর্তে ছিল'৫০; স্থান—কলকাতার পরিবর্তে পণ্ডিচেরি এবং ওখানে ছিল না 'আজকাল', 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের হাওয়া; থাকলে একই ভাবে ফাঁসত ৫০-এর বুজরুকি।

কিন্তু ডাক্তার প্রভাত সান্যালের সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে নারায়ণ সান্যালের বক্তব্য কতটা সত্যি—সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহ দেখে ফিরে এসে ডাক্তার প্রভাত সান্যাল কলকাতায় একটি সভায় এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহে তিনি জ্যোতির কোনও নিদর্শন দেখতে পাননি। বরং স্পষ্টতই এ-কথা বলেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দর মৃতদেহে তিনি বিকৃতিই দেখেছিলেন এবং অবিলম্বে সৎকারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে সভার বহু শ্রোতা আজও বিদ্যমান। ১৯ জুলাই '৯৩-এর আজকাল পত্রিকায় এমনই এক শ্রোতা কলকাতার রাজ্যেশ্বর মিত্রের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা আমার বক্তব্যের সত্যতাকেই সমর্থন করে। তবুও এর পরেও আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় লেখক নারায়ণ সান্যালের কাছে একটি বিনীত ও যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ—ডাক্তার প্রভাত সান্যালের সার্টিফিকেটটা বাস্তবিকই কি আপনি চর্মচক্ষে দেখেছেন? আমাকে দেখাতে পারবেন নিদেন তারই একটা ফোটো কপি? সত্যকে প্রকাশের স্বার্থেই একবার দেখান না।

নারায়ণ সান্যাল ওই পত্রে আরও লিখেছেন, **লেখিকার যা বক্তব্য তা অনুজপ্রতিম প্রবীর ঘোষ 'অলৌকিক নয় লৌকিক' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বলেছেন, ... আমিও আমার সাধ্যমতো বলার চেষ্টা করেছি 'পয়োমুখম' গ্রন্থে। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানের বাইরে কোনও Superior reason Power নেই একথা মেনে নেওয়া তো ছার মনেও নিতে পারি না।**

অরবিন্দের মৃতদেহ ঘিরে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার সপক্ষে প্রমাণ যখন একটু চেষ্টা করলেই নারায়ণবাবুর সহযোগিতায় পাওয়া যেতে পারে এবং অলৌকিকত্বের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ পাওয়ার পর অস্তিত্বের বিরোধিতা যেহেতু যুক্তিহীনতারই নামান্তর, তাই সমিতির পক্ষ থেকে নারায়ণবাবুকে অনুরোধ করেছি—এ বিষয়ে প্রমাণ দিতে। এমনকী, অন্য কোনও অলৌকিক ঘটনা বা শক্তির প্রমাণ থাকলে তাও হাজির করতে অনুরোধ করেছি। আমার নিরীহ ও বিনীত অনুরোধের বিনিময়ে তথাকথিত যুক্তিবাদী লেখক সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন—আমার ব্যক্তিগত চিঠি ছেপে অশোক আগরওয়াল অত্যন্ত গর্হিত ও বে-আইনি কাজ করেছেন। 'চানঘরে গান' বইতে সত্যজিৎ রায়ের চিঠি প্রকাশ করা নিয়ে আইনি-লড়াইয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন—আমি অশোক ও সাহিত্য মন্দির পত্রিকার বিরুদ্ধে কেস করতে পারি। আর এমন বেআইনি প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কারও সঙ্গেই আলোচনা করতে রাজি নই। তোমার সঙ্গেও না।

এমনতর সুবিধাবাদী, মেকি যুক্তিবাদী চরিত্রটি খোলামেলাভাবে প্রকাশ পেতে এমন চরিত্রকে 'সুসংস্কৃতির ক্যানসার' বিবেচনায় আমরা ছেঁটে ফেলেছি আমাদের উপদেষ্টা পদ থেকে শুধু নয়, সমিতি থেকেও।

সুমন চট্টোপাধ্যায় একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। বাংলা গানে নতুন কথা, নতুন সুর এনে এবং গানের মাঝে ঝক্‌ঝকে কথা বলে নিজেকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ও প্রতিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুমনের গানে এসেছে 'যুক্তিবাদ'., এসেছি 'আমি'। আমাদের সমিতিকে উৎসর্গ করে গান বেঁধে মঞ্চ মাতিয়েছেন— সে খবর শুনে পুলকিত হয়েছি। এল তারপর '৯৩-এর ১ মার্চ। আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবসে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর গানকেও আমরা হাজির করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানেও সুমন আমাদের সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, অভিনন্দিত করেছেন এবং একটি গানও আমাদের সমিতির উদ্দেশে উৎসর্গ করে গেয়েছেন। তাঁর গানে আমাদের সমিতির বহু দর্শকের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করেছে, যে গানে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি,

বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছি। এরই মাঝে তাঁর একটা গান তিনি মানুষকে ভরসা রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন 'আজানে ও শাঁখের সুরে'। তাঁকে কাছাকাছি থেকে দেখতে পাওয়ার সুযোগ যাদের ঘটল তাঁদের অনেকেই ধাক্কা খেলেন বুক বাজিয়ে মার্কসবাদী বলে ঘোষিত এই মানুষটিকে অদৃষ্টবাদে পরম বিশ্বাস রেখে গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করতে দেখে।

এরই মাঝে আরও একটি ঘটনা আমাদের সমিতির স্বেচ্ছসেবকদের খুবই খারাপ লেগেছে। সুমনের গানের আগে যখন বক্তব্য রাখছিলেন শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র পরিচালক ও আমাদের সমিতির উপদেষ্টা মৃণাল সেন, যখন তাঁর অননুকরণীয় বৈঠকিচালের বক্তব্যে শ্রোতারা সম্মোহিত, ঠিক তখনই কিছু শ্রোতা ছন্দপতন ঘটিয়ে চিৎকার শুরু করেন, "বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। আমরা সুমনের গান শুনব।" গোলমালকারীরা সংখ্যায় জনা কুড়ি। এবং আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, এঁরা কেউই আমাদের সমিতির সদস্য নন। এঁরা বসেছিলেন সেই আসনগুলোতে যেগুলো সুমন 'গেস্ট কার্ড' হিসেবে পেয়েছিলেন অথবা যে সাধারণ কার্ডগুলো সুমন সংগ্রহ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অভিনেতা অশোককুমারের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ 'জীবন-নাইয়া'র কথা মনে পড়ে গেল। অশোককুমার জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। নেহেরু একবার সপার্ষদ অশোককুমারের সঙ্গে অশোককুমার অভিনীত 'অচ্ছুৎকন্যা' সিনেমা দেখছেন। ছবি দেখতে দেখতে নেহরু মাঝে মাঝেই একটা হাত তুলছেন। আর হাত তোলামাত্র পিছনে বসা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নেহরুর নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলছিল। বিস্মিত অশোককুমার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা কী হচ্ছে?" নেহরুর এক পার্শ্বচর নিচু গলায় জানালেন, "পাবলিসিটি"।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অশোককুমার তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন, খোলা বাসে নেতাজি দাঁড়িয়ে, নেতাজির ঠিক পিছনের সিটে বসে অশোককুমার। পিছনে বিশাল মিছিল। রাস্তার দু'ধার থেকে জনতা নেতাজির উদ্দেশে ছুড়ে দিচ্ছে ফুল। বার বার আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠছিল নেতাজির নামে। অশোককুমার অবশ্য চুপ। তারপর হঠাৎ শোনেন সুভাষচন্দ্র নিচু গলায় অশোককুমারকে বলছেন, 'জয় বলো, জয় বলো।' এই নির্লজ্জতায় বিরক্ত হয়ে সুভাষ-সঙ্গই পরিত্যাগ করেছিলেন অশোককুমার।

'পাবলিসিটি'র জন্য সুমনের ভাড়াটে নটুয়া ব্যবহারের নির্লজ্জতায় আমরাও বিরক্ত হয়েছিলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা গোলমালকারীদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, "কারও পাবলিসিটি দিতে গিয়ে অনুষ্ঠানে আবার বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টির চেষ্টা করলে হল থেকে বের করে দেব, এবং কান ধরে।" কথায় কাজ হয়েছিল।

ঈশ্বরে ভরসা রাখা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী এই সুমনই পরবর্তীকালে প্রতিবাদে মুখর হয়ে আর এক মঞ্চে 'ভগবান'কে রশিদের বাড়ির মতোই ধূলিসাৎ করলেন। তারপর আর এক মঞ্চে আবারও আহ্বান জানালেন ঈশ্বর ও আল্লায় ভরসা রাখতে।

'৯৩-এর ১৫ মার্চ। স্থান কলকাতার নজরুল মঞ্চ। এইচ. এম. ভি-র দেওয়া 'গোল্ডেন ডিস্ক' পেয়ে আপ্লুত সুমন বাড়তি উচ্ছ্বাসে ওই সম্মান উৎসর্গ করলেন তাঁর পিতাকে, কিংবদন্তি গায়ক-গায়িকাদের, তাঁর ও রেকর্ড কোম্পানির সহযোগী কর্মীদের, অগণিত অনুরাগীদের।

এর মাত্র ছ'দিন পর অর্থাৎ ২১ মার্চ ওই নজরুল মঞ্চেই সুমন তাঁর সমস্ত রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে চূড়ান্ত জলাঞ্জলি দিয়ে গর্বভরে ঘোষণা করলেন "গোল্ডেন ডিস্ক-এ পেচ্ছাপ করি"। উৎসর্গ করার পর উৎসর্গীকৃত ডিস্কে পেচ্ছাপ করে তিনি নিজেরই পিতা, পরম সম্মানীয় কিংবদন্তি গায়ক-গায়িকা, সহকর্মী ও অনুরাগীদের চূড়ান্তভাবে অপমান করলেন। এমনভাবে প্রত্যেকের সম্মানকে পেচ্ছাপে ডুবিয়ে দেবার স্পর্ধা কেউ দেখালে তাঁর ধিক্কার ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হতে পারে কি?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সেই সন্ধ্যাতেই নজরুল মঞ্চে ইতর মস্তানের মতোই বারবার মঞ্চ দাপিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিক ও সেই পত্রিকার এক সাংবাদিককে 'মাদার-ফাকার' অর্থাৎ 'মাকে সঙ্গমকারী' বলে খিস্তি দিলেন। ধিক্কার জানাই সুমনের এই ধরনের পূতিগন্ধময় সংস্কৃতিকে আমদানি করার বদমতলবকে। পর পরই সুমন যখন আর এক মঞ্চে গান ধরেন, "পাল্টে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না", তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পাল্টে কোন সংস্কৃতিকে আনতে চান সুমনবাবু? খিস্তি দিয়ে শ্রোতাদাদের মধ্যে এক ধরনের বিকৃত আবেগ ও সে থেকে সৃষ্ট উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে একটা 'র‍্যাপট' বা 'বিশেষ সম্পর্ক' গড়ে তুলে জনপ্রিয়তা অর্জনের এই ভয়াবহ প্রচেষ্টায় সুমন সার্থক হলে কী হত ভাবা যায়? বহু গায়ক-গায়িকাই জনপ্রিয়তা অর্জনের আশায় এমন অশ্লীল-কদর্য-খেউড় গানের সঙ্গে যুক্ত করে শ্রোতাদের সঙ্গে 'র‍্যাপট' বা 'বিশেষ সম্পর্ক' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতেনই। সুমনের এই অশ্লীলতা কি নেহাতই এক ধরনের বিকৃত রুচির পাগলামি? না, প্রগতিশীলতার মুখোশের আড়ালে দ্বিচারিতা ও অশ্লীলতার ভাইরাস বহু গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক দূষণ গড়তেই বিদেশ থেকে এদেশে

চালনো করা হয়েছে একটি প্রতিভাকে, যার সৃষ্টির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল, যার মধ্যে মিলেমিশে ছিল অনেক মধ্যবিত্তর স্বপ্ন। কিন্তু কী পেলাম? একটি ভালো গান গাওয়া খারাপ মানুষ অসৎ মানুষ। অতীতে সুমন আমাদের কতটা প্রশংসা করেছেন, কতটা তোল্লাই দিয়েছেন, সেই সমস্ত আবেগ ও কৃতজ্ঞতা বিদায় করে দিয়ে সুমনের বর্তমান সুচতুর অবস্থান বঙ্গ-সংস্কৃতির পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক বিবেচনায় তাঁর কদর্য অশ্লীল ধ্বংসাত্মক শক্তির গতি রুদ্ধ করতে আমরা জনচেতনাকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি—শেষ কথা বলেন জনগণ। আর সে কথা বলেন বলেই পুলিশ, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক এবং মস্তানদের বিপুল সমাবেশ ঘটিয়েও পৃথিবী কাঁপানো মরিস সেরুলো শেষ রক্ষা করতে পারেননি; সুমন তো কোন ছার! মার্কেট রাখতে খিস্তি নয়, খিস্তি ছাড়তে ঘাড় ধরে বাধ্য করাতে পারেন শ্রোতারাই।

সুমন কিন্তু শুধুমাত্র ভোগবাদসর্বস্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতাকে গানের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়ে, জীবনচর্যার মধ্যে প্রকাশ করে ও কথায়-বার্তায় প্রতিফলিত করে এবং একশ্রেণির সংগীত শিল্পী ও সংগীত প্রেমিকদের প্ররোচনা জুগিয়ে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক দূষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি ঘুষের ও দুর্নীতির পক্ষে জোরালো সওয়াল করে অনুগামী ও আপ্লুত শ্রোতাদের নিজের বক্তব্যের অনুকূলে সমাবেশিত করতে চেয়েছেন। 'দৈনিক বসুমতী'র ১৯৯৩-এর মহালয়ার বিশেষ ক্রোড়পত্র-তে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সুমন জানাচ্ছেন, "আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি ঘুষ নেবেন? আমি কী করে বলি 'না'। যদি দেখি আমার বউ, আমার বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না বা যাকে ভালবাসি সে খেতে পাচ্ছে না, আমার তখন কোনও উপায় নেই। ঘুষ নেব, বেশ করব।"

বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, আক্রমণের পরিবর্তে ঘুষের দুর্নীতির অনুশীলন বঞ্চিত মানুষকে চটজলদি স্বার্থফল দিতে পারে বটে, কিন্তু বঞ্চিত মানুষদের সমুন্নত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, পারে না, মুক্তি ঘটাতে। বরং বঞ্চিত মানুষদের ঘুষের দুর্নীতির আবর্তে পদভ্রষ্ট করে আখেরে লাভবান হন শোষকশ্রেণি, রাষ্ট্রশক্তি। এর পরও কি বুঝতে হয় সুমনের সাজানো গানের কথাগুলো শুধুমাত্র কথারই কথা এবং তারই আড়ালে লুকিয়ে আছে রক্তলোলুপ একটা বাঘ।

পি সি সরকার (জুনিয়র) ভারতের এক জনপ্রিয় জাদুকর। তাঁর জাদুতে অনাবিল আনন্দ পাওয়া ও মুগ্ধ হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রচুর। যতজন দেখেছেন, তারচেয়ে বেশি মানুষ দেখেননি, কিন্তু শুনেছেন তাঁর অসাধারণ জাদুশৈলীর

কথা। শ্রী সরকার কোটি কোটি মানুষের কাছে জীবন্ত কিংবদন্তি—আস্ত একটা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিস করে দিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছেন ট্রেন ভ্যানিস, পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তের বর্ণনা। ট্রেন ভ্যানিসের ঘটনাটা ঘটেছিল এই তো সে'দিন—১২ জুলাই '৯২ খানা স্টেশনের কাছে।

সমস্ত জাদুর পিছনেই কৌশল থাকে। যে'টা ঘটেছে বলে দেখেন, সেই ঘটার পিছনে থাকে কৌশল বা কার্য-কারণ-সম্পর্ক। কিন্তু এই ট্রেন ভ্যানিসের ক্ষেত্রে অমৃতসর এক্সপ্রেস সে'দিন সে'সময় খানা স্টেশনের কাছে ছিল না। কোনও কৌশলের সাহায্যেই ট্রেনটিকে ভ্যানিস করা হয়নি। এটা ছিল একটা মিথ্যে প্রচার। প্রচারমাধ্যমগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ব্যাপক আকারের মিথ্যে প্রচার। ব্যাপারটি ছিল জাদুকর ও প্রচারমাধ্যমগুলোর সাদা-সাপটা মিথ্যে—দ্বিচারিতা নয়।

কিন্তু '৯৩-এর ডিসেম্বরে পি সি সরকার (জুনিয়র) যখন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ও কলকাতায় মেয়র বাহবা দিয়ে সমস্ত রকম আশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন এবং সেই খবর বিশাল প্রচার পেল, তখন ব্যাপারটা হয়ে গেল দ্বিচারিতার এক দুর্দান্ত যুগলবন্দি। কারণ পি. সি. সরকার (জুনিয়র) নিজেই ভূতে, ভাগ্যে ও ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের কথা বার-বার সোচ্চারে উচ্চারণ করেছেন সাক্ষাৎকারে ও লেখায়। এমনকী আগামী দিনে এ-সব "পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে" এমন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন। আদ্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি মানুষ নিজেকে 'কুসংস্কার মুক্তিতে আন্তরিক' বলে প্রচারে সচেষ্ট হওয়াটা যেমন দ্বিচারিতা, ঠিক তেমনই দ্বিচারিতার স্পষ্ট প্রকাশ কলকাতার মেয়র তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একই সঙ্গে কুসংস্কারের বিরোধিতা এবং কুসংস্কারের পক্ষে ডুবে থাকা মানুষটিকে কুসংস্কার মুক্তির অগ্রণী মানুষ হিসেবে 'প্রজেক্ট' করা।

শুধুমাত্র ম্যাজিক দিয়ে তাবৎ অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, কুসংস্কার থেকে জনমানসকে মুক্ত করা যায় না। ভর, ভাগ্যে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এ'সব কুসংস্কারের ব্যাখ্যা কি ম্যাজিকের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব? এর জন্য প্রয়োজন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কুসংস্কার ও ভাববাদী চিন্তার মূলস্রোত আত্মার অস্তিত্ব, কর্মফল, ভাগ্য, ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস। রাষ্ট্রশক্তি তার শোষণ প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখতে কুসংস্কার ও ভাববাদী চিন্তার এই মূলস্রোতকে গতিশীল রাখতে সব সময়ই সক্রিয়। আর তাই ভূত, ভাগ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল করা রাষ্ট্রশক্তির কাছে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজনীয়।

জাদুকর সরকারের মতো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষটি জনসাধারণের কাছে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী চরিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেলে সাধারণ মানুষ তাঁর কথায় ভূত, আত্মার অবিনশ্বরতা, কর্মফল, ভাগ্য, ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্বেও বিশ্বাস করবে—এটাই স্বাভাবিক। তাই শোষক-শাসক-বুদ্ধিজীবীদের আঁতাঁত বুঝে-সমঝেই শ্রীসরকারকে কুসংস্কারবিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসেবে 'প্রজেক্ট' করতে চাইছে। চাওয়াটা স্বাভাবিক। এক হাতে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে রোখা অন্য হাতে কুসংস্কারের চাষের জন্যই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা না বুঝেই শ্রীসরকারকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রতি বিনীত অনুরোধ—একটু ভেবে দেখুন—ভিক্ষাপাত্র ধরা হাতে কি গাণ্ডীব মানায়? ও হাতে বরং মানায় ঘাতকের ছুরি।

'স্পনসর' নামধারী অভিভাবক, ভণ্ড ও দ্বিচারীদের ভিড়ে, অসুস্থ সাংস্কৃতিক গ্রাস-ক্ষমতা যখন সর্বগ্রাসীতার রূপ পেতে উন্মুখ, তখনই একঝলক টাটকা হাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছে হাজার—হাজার তরুণ-তরুণী, যাদের বয়স বারো থেকে বিরাশি—যাই হোক। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ইউরোপে যুক্তিবাদের যে প্রথম আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে সোনার বাংলা গড়ার অনেক সুখ-স্বপ্ন আজ লক্ষ কোটি মানুষের চোখে যদি ভেসে ওঠে, সেটা কি শুধুই স্বপ্ন থেকে যাবে?

না। এ দেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের অলোকে যে উদ্ভাসিত হবে, সংঘর্ষ ও নির্মাণের উৎসবে মেতে ওঠা সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা সেই প্রত্যয়ই জাগিয়ে তুলেছে। এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে দুর্নীতি ও ভণ্ডামির পাশাপাশি আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন মানুষও উঠে আসতে শুরু করেছে।

শুরুতেই গোড়ার কথা বলে নিতে চাই। এই গ্রন্থটিকে এক কথায় বলা যায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র manifesto, অর্থাৎ সংগঠনটির কর্মসূচি, মতামত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

ঢাকঢোল না পিটিয়েও একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে চলেছে ভারতে। এ-দেশের ৬৭৫টি জেলার মধ্যে প্রায় ৩০০টি জেলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম বা স্বরাজ বা সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে কৃষি অঞ্চল, বনভূমি, খনি অঞ্চল, জলাভূমি, চা-বাগিচা এ-সব।

এটা তো শাসক-শোষকদের সর্বনাশ। তারপরও এগুলো গড়ে উঠল কী করে?

9 788129 530950